সাজজাদ হোসাইন খান

কালের কলঙ্কিনী

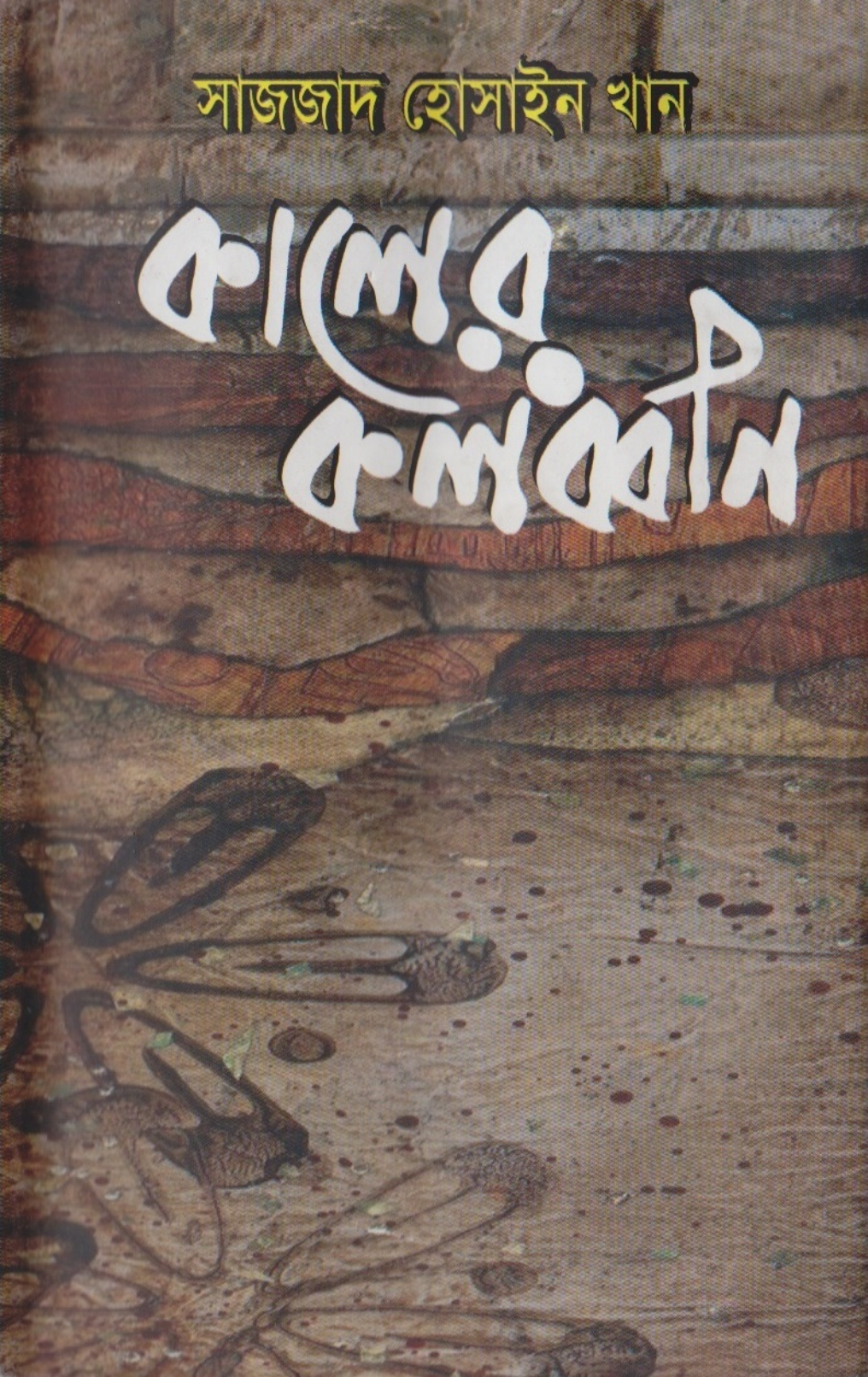

কালের কলধ্বনি

সাজজাদ হোসাইন খান

সিদ্দিকীয়া পাবলিকেশন্স

www.pathagar.com

কালের কলধ্বনি ঃ সাজজাদ হোসাইন খান

প্রকাশক : মালেক মাহমুদ
সিদ্দিকীয়া পাবলিকেশন্স
৩৮/৩, কম্পিউটার মার্কেট (২য় তলা)
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
৭১২২০৪৭, ০১৯১২২৩৮১৮৭
প্রকাশকাল : একুশে বইমেলা - ২০১২
স্বত্ব : মাহমুদা খান
প্রচ্ছদ : আফসার নিজাম
বর্ণবিন্যাস : নান্টু বিশ্বাস
সততা কম্পিউটার
মুদ্রণ : বরাত প্রিন্টার্স
সিংটোলা, সূত্রাপুর

মূল্য : ২০০ টাকা

ISBN : 984-891-381-5

www.pathagar.com

কাজী হাবিবুর রহমান

শ্রদ্ধা ও সালাম

সময় ভাবনা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সাহিত্য ছাড়াও ইতিহাসের প্রতি মুগ্ধতা বরাবর। শিক্ষা জীবনে পাঠ্যতালিকায় ইতিহাস ছিল ঐচ্ছিক। তাই কর্মজীবনে প্রবেশ করেও ইতিহাসের প্রতি আকর্ষণ আরো প্রবল হয়েছে। যে জন্যে আমার প্রায় প্রতিটি লেখাই ইতিহাসাশ্রিত। কবিতা প্রবন্ধ গল্প এসবের কোথাও না কোথাও ইতিহাসের চিহ্ন থেকেই যাচ্ছে। এ গ্রন্থের বিষয় বিবেচনাও এর বাইরে যায়নি। সাহিত্য এবং ইতিহাসের মেলবন্ধন অধিকাংশ লেখাকেই পুষ্ট করেছে। 'কালের কলধ্বনি' মূলত দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত উপসম্পাদকীয়ের যৎকিঞ্চিত। বাছাই করা নিবন্ধ। পত্রিকা উপসম্পাদকীয় সাধারণত কালিক সমস্যা নিয়ে বেড়ে উঠে। সমস্যাকে চিহ্নিত করে এবং সমাধানে ইংগিত দেয়। এই গ্রন্থের লেখাগুলো কালিক ভাবনাকে ধারণ করলেও কিছু কিছু বিবেচনা কালের গন্ডিক অতিক্রম করবে বলে বিশ্বাস। এমনিতে এই গ্রন্থের চিন্তা-চেতনা দুটি শতাব্দিকে স্পর্শ করেছে। কারণ উপসম্পাদিকীয় গুলো গত শতাব্দির আশির দশক থেকে এই শতাব্দির প্রথম দশক পর্যন্ত প্রলম্বিত। তাই প্রকাশ ভঙির ভিন্নতা থাকলেও এই দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে চিন্তার কোন মৌলিক পরিবর্তন ঘটেছে বলে মনে হয়না। দেশ-জাতি এবং সমাজ-সংসারের ব্যাপারে সু-চিন্তা এবং সুবিবেচনা প্রতিটি সুনাগরিকেরই আরাধ্য হওয়া উচিত। এই ঐচিত্য থেকেই জন্ম নেয় কল্যাণ কামনা। এই গ্রন্থের প্রতিটি ভাবনা সেই কল্যাণকে ধারণ করে, প্রসারিত করে।

ভিন্নমত থাকতেই পারে। এটিই জগত সংসারের দস্তুর। এজন্যে মতান্তরকে যারা মনান্তরের তালিকায় তুলতে আগ্রহি তারা কোন অবস্থায়ই সুবিবেচক নন। মঙ্গল এবং কল্যাণের শত্রু। কালের কলধ্বনির অনেক চিন্তার সাথেও কারো কারো দ্বিমত থাকতেই পারে। থাকাটা স্বাভাবিক।

www.pathagar.com

এই গ্রন্থের বেশ কিছু লেখার পরিমার্জন শব্দ সংযোজন-বিয়োজন করা হয়েছে। শিরোনামেও টুকটাক অদল বদল এবং সংকোচন করা হয়েছে। তবে সাম্প্রতিক লেখাগুলো রাখা হয়েছে অবিকল। বলা বাহুল্য গ্রন্থভুক্ত অধিকাংশ লেখাই প্রকাশিত হয়েছিল 'নব্যদর্শী' ছদ্মনামে।

অবশেষে ধন্যবাদ, এই দুঃসময়েও সিদ্দিকীয়া পাবলিকেশনের সত্ত্বাধিকারী কবি মালেক মাহমুদকে, তিনি কালের ধ্বনি গ্রন্থটি প্রকাশ করেছেন। তারই আগ্রহে আমার বিক্ষিপ্ত চিন্তাগুলো বিলম্বে হলেও গ্রন্থভুক্ত হলো।

সাজজাদ হোসাইন খান
০৬-০২-২০১২

www.pathagar.com

সূচি

'পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিরা সবার মনোযোগ হারিয়ে ফেলছে'	৯
সাহিত্যের উঠানে বন্যবরাহের উৎপাত	১২
আমার শিক্ষক আমার বন্ধু	১৫
উৎসেই যখন দহন শুরু হয়	১৯
লিখতে না পারার বেদনা	২২
অতিথিপাখি	২৫
বালক বয়সের 'বাল্যশিক্ষা'	২৮
রাষ্ট্র ও ধর্ম	৩২
লেখকের সম্মান	৩৬
জাতির আইডেন্টিটি	৩৯
বাঙালীর শ্রেষ্ঠত্ব এখন জরিপের গোলক ধাঁধাঁয়	৪২
কবিতার প্রতি অনুরাগ কবিদের প্রতি ভালোবাসা	৪৫
অন্নদা শঙ্কর রায় এবং তেলের শিশি বিষয়ক রচনা	৪৮
রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল বিতর্ক নবরূপে	৫২
অবশেষে ইতিহাসের কপালে হাতুড়ী	৫৬
শপ্তকের সাতকাহন	৫৯
'লাল শাড়ী'র জামেদ আলী	৬২

www.pathagar.com

www.pathagar.com

'পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিরা সবার মনোযোগ হারিয়ে ফেলছে'

'চৌরঙ্গী' উপন্যাসের লেখক শংকর, তার পুরোনাম মনি শংকর মুখোপাধ্যায়। বাংলা সাহিত্যের উপন্যাস জগতে এই গ্রন্থটিই তার অবস্থানকে দৃঢ় করেছে। প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তি জুগিয়েছে। আরও আরও বিখ্যাত উপন্যাসের প্রণেতাও তিনি। সত্যজিৎ রায়ের মতো চলচ্চিত্র ব্যক্তিও শংকরের উপন্যাসের চিত্রায়ন করেছেন। সম্প্রতি শংকর এসেছিলেন ঢাকা, বাংলাদেশে। তার তিনখানা উপন্যাসের বাংলাদেশ সংস্করণ হচ্ছে। এ জন্যই ঢাকায় আসা। শংকর এর আগে বাংলাদেশ সফরে আসেননি। যদিও তাদের আদি বসতি ছিল যশোর, বাংলাদেশে। তার পিতা অবশ্য দেশ ভাগের আগেই মাইগ্রেট করেছিলেন ভারতের হাওড়ায়। কলকাতা থেকে 'বাবুরা' আসেন। কেউ আসেন সফরে কেউ আপ্যায়িত হতে। আবার কেউ কেউ এসে বলেন, আমরা এসেছি আমাদের পিতৃপুরুষের ভিটেমাটি দেখতে। দেশ বিভাগের পর যদিও এদের আটানব্বই জনই অধিকতর স্বাচ্ছন্দ্য পাবার আশায় জমিজমা বেচাবিক্রি করেই চলে গিয়েছিলেন ওপারে। কেউ কেউ আবার অদল-বদল করেছিলেন সহায়-সম্পদ। এপারে হিজরতের সংখ্যাটাও বোধ হয় কম হবে না। তবে এদের অনেকেই কপর্দকহীন এসেছেন। বাস্তুভিটা খুইয়ে। কবি-গবেষক আবদুল মান্নান সৈয়দের লেখায় এমন বর্ণনার উল্লেখ আছে। তার পৈতৃক নিবাস ছিল পশ্চিমবাংলার বশিরহাট জেলায়। শংকরকে সাধুবাদ তিনি এমন কোন দাবি করেননি যে পূর্বপুরুষের ভিটে দেখব।

শংকরের তিনটি উপন্যাস বাংলাদেশী প্রকাশনা থেকে প্রকাশ পাচ্ছে, এটি একটি আনন্দের খবরতো বটেই। পাঠকনন্দিত এই ঔপন্যাসিক ঢাকার পাঠকের অনেক কাছে চলে আসবেন। হৃদ্যতা বৃদ্ধির ব্যাপারটিতো আছেই– এমনিতে শংকর একজন সজ্জন মানুষ। তার কথাবার্তা, আচার-আচরণে তেমনটাই মনে হলো। 'পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিরা সবার মনোযোগ হারিয়ে ফেলছে' এমন অকপট উচ্চারণের জন্য তাকে আবারো সাধুবাদ। আসলে সেখানকার বাংলাভাষীরা তাদের ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি, ব্যবসা-বাণিজ্যতো আছেই, হিন্দি তথা দিল্লীর পীড়নে দারুণভাবে পীড়িত। এই পীড়ন এখন তাদের মানসিক বিপর্যয়ের কারণ হয়ে উঠে আসছে। কলকাতার কবি- সাহিত্যিকরা বর্তমানে বাংলাদেশের পাঠকের মনোযোগ প্রত্যাশা করে প্রতিনিয়ত। বাংলাভাষা সাহিত্যের দুর্দশা যে কতটা চরমে শংকরের এই নিপাট ভাষণ বিষয়টি অনেকেরই উপলব্ধিতে চলে এসেছে। এ জন্যে ঢাকাবাসীর করুণা এবং দুঃখবোধ জাগাটা

www.pathagar.com

স্বাভাবিক। কেবল শংকরই নন, এমন হতাশা-আক্ষেপ সেখানকার আরও অনেক কবি-সাহিত্যিকই করে গেছেন এর আগে। সমগ্র ভারতে বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতি যে কতটা অপাঙক্তেয় সেখানকার চ্যানেলগুলোর অনুষ্ঠানের দিকে নজর দিলেই বুঝা যায়। এক সময় হিন্দি গানের লিজেন্ডরা বাংলাগান করতে পারলে নিজেদের ধন্য মনে করতেন। মোহাম্মদ রফি, তালাত মাহমুদ, লতা-সায়গলরাতো এখনো বাঙালিদের কাছে জনপ্রিয়। কিন্তু বর্তমানের দৃশ্য সম্পূর্ণই বিপরীতে। সেখানকার চ্যানেলগুলোতে সঙ্গীতের প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। সমগ্র ভারত থেকে তারা গায়ক-গায়িকা সংগ্রহ করেন। এগুলোর মধ্যে 'ইন্ডিয়ান আইডেল' এবং 'সারেগামা' জনপ্রিয়তার শীর্ষে। কিন্তু অবাক করা ব্যাপার হলো সেখানে রাজস্থানী, কর্নাটকি, গুজরাটি, পাঞ্জাবী এসব গানের প্রবেশাধিকার থাকলেও প্রবেশ নিষেধ কেবল বাংলাগানের। বিচারকদের মাঝেও কোন বাঙালির উপস্থিতি থাকছে না। থাকলেও কালেভদ্রে। যদিও দু' একজন বাঙালি গায়ক-গায়িকা অংশগ্রহণের সুযোগ পান তাদেরকেও যোগ্যতা প্রতিষ্ঠা করতে হয় হিন্দিগান চর্চা করে। এসব আলামত থেকেই প্রতীয়মান হয় বাংলার দুর্দশা কতটা প্রকট। পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিরা যে আসলেই সবার মনোযোগ হারিয়ে ফেলেছে তা ঢাকাবাসী টের না পেলেও শংকর অর্থাৎ কলকাতাবাসীরা তা হাড়েহাড়ে উপলব্ধি করতে পারছেন। স্মরণযোগ্য, সংগীত রচনা (তামাম ভারতে) দুই সম্রাট কিন্তু বাংলাভাষী। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং কাজী নজরুল ইসলাম। ডিএল রায়, রজনীকান্ত, সজনী কান্তরা তো আছেনই। এরপরও সেখানে বাংলা সঙ্গীত এখন 'কোমাতে'। বাংলা চলচ্চিত্রের অবস্থাও খুব একটা ভাল নয়। হিন্দির আগ্রাসনে বাংলা সিনেমা এখন ক্ষতবিক্ষত।

কলকাতার জনপ্রিয় লেখকদের গ্রন্থ প্রকাশের রেওয়াজটা নতুন নয়। এখানে শুধু ব্যবসায়িক লাভালাভের বিষয়টিই মুখ্য এমন ভাবাটাও সঠিক নয়। আন্তরিকতার ব্যাপারটিও দৃষ্টিযোগ্য। হৃদয়ের প্রশস্ততা না থাকলে শুধু লাভের আশায় কেউ এমন ঝুঁকিতে যেতে চায় না। কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে লোকসানের অংকটাও বিপুল। এমনতো নয় যে কলকাতার লেখকের বই পেলেই ঢাকার পাঠক হুমড়ি খেয়ে পড়বে। আর সব নিঃশেষ হয়ে যাবে মুহূর্তে। ঢাকার লেখকরা কি লিখতে জানে না? বাংলা জানে না? ঢাকায়তো অনেক শক্তিশালী লেখক আছেন, জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক আছেন। হুমায়ূন-মিলনের উপন্যাসতো পাঠক লাইন দিয়ে কিনে। তাদের ক'টি উপন্যাসের কলকাতা সংস্করণ প্রকাশ পেয়েছে? বা তাদের সৃজনশীলতা নিয়ে কলকাতার পত্রিকা-সাময়িকীতে লেখালেখি হয়েছে? ব্যতিক্রম থাকলে থাকতেও পারে। সেগুলোতো আর ধর্তব্যের মধ্যে পড়ে না। ঢাকার পত্রিকা-সাময়িকীতে কলকাতার তরুণতম লেখকটি নিয়েও উৎসুক প্রকাশ করতে দ্বিধা করে না। বুদ্ধদেব বসু, অমীয় চক্রবর্তী, তারা শংকর, সমরেশ, জীবনানন্দ, সুনীল এমনকি বর্তমানের জয়গোস্বামী'র খোঁজ-খবরও রাখেন ঢাকার পাঠক। তাদের আলোচনা-সমালোচনা প্রকাশ করে এখানকার সাহিত্যপত্রগুলো। ব্যতিক্রম কেবল কলকাতার পত্র-পত্রিকা, লেখক-সাহিত্যিকবৃন্দ। সেখানকার অনেক বড় লেখককে প্রশ্ন করে জানা গেছে, তারা ঢাকার সাহিত্যের প্রসার-প্রতিপত্তির বিষয়ে বরাবরই অন্ধকারে

www.pathagar.com

আছেন। অনেকে আবার সচেতনভাবেই এই কর্মটি করে থাকেন। পাঠতো দূরের ব্যাপার, লেখকের নামটি পর্যন্ত শুদ্ধ উচ্চারণে লিখতে এবং বলতে গিয়ে ব্যর্থতার পরিচয় দেন। এই ব্যর্থতার পশ্চাতে যে হৃদয়ের ক্ষুদ্রতাটাই প্রকটভাবে প্রকাশিত হয়ে যাচ্ছে– সে ব্যাপারেও যেন তারা অসচেতন। জেগে ঘুমানোর ভান করলে অবশ্য ভিন্ন কথা। কবি জসীম উদদীন কলকাতার বাবুদের এরকম উৎকট সাম্প্রদায়িকতার বিশদ বর্ণনা রেখেছেন তার 'ঠাকুর বাড়ির আঙ্গিনায়' গ্রন্থে। ঢাকার অনেক জনপ্রিয় এবং বিখ্যাত কবি-সাহিত্যিকেরই উত্থান-নাম-যশ কলকাতায়। জসীমউদদীন, আবুল ফজল, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, আবুল মনসুর আহম্মদ, আবুল কালাম শামসুদ্দিন, ফররুখ আহমদ, আহসান হাবীব, আবুল হোসেন, সৈয়দ আলী আহসান এরা সবাই তো কলকাতার সৃষ্টি। কিন্তু বর্তমানের কলকাতা কি এদেরকে কখনো স্মরণ করে? বাংলাসাহিত্যের এক মহাপণ্ডিত ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। তিনি কতটা প্রকাশিত কলকাতায়? ফররুখ আহমদের মতো বড় কবি তো আঙ্গুলে গোণা। তারপরও কলকাতার পাঠক কেন, কবি-সাহিত্যিকদের কাছেও তিনি অনুল্লেখ্য। সেখানকার কোন পত্র-পত্রিকায়ই তার সৃষ্টিকে বিবেচনায় আনা হয় না। জসীমউদদীনের মতো বাংলাসাহিত্যের জনপ্রিয় কবিই এখন সেখানে বিলুপ্ত 'প্রজাতির' তালিকায়। ঢাকার কোন কবি-সাহিত্যিককে নিয়ে সেখানকার কোন উল্লেখযোগ্য সাহিত্য-সমালোচক বা গবেষক কোন কাজ করেছেন, পুস্তক প্রকাশ করেছেন এ জাতীয় খবরাখবর দৃষ্টিতে আসেনি। কলকাতার পত্রপত্রিকায় বইয়ের যে সব বিজ্ঞাপন ছাপা হয়, সেখানে তেমন কোন আলামত দেখা যায় না। তসলিমার কথা হয়তো বলতে পারে কলকাতা। আসলে তসলিমা কি লেখক?

শওকত আলী, সৈয়দ শামসুল হক, আখতারুজ্জামান ইলয়াস, শামসুর রাহমান, আল মাহমুদ, মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, আবদুল মান্নান সৈয়দ, রাবেয়া খাতুন, সেলিনা হোসেনরা সৃজনী শক্তিমত্তায় কোন্ অংশে কম? সাহিত্যিক তুল্যমুল্যে এঁরা কি সমরেশ-আশাপুর্নার কাছে এতটাই ম্লান যে, কলকাতার সমালোচকরা তাদেরকে অনুল্লেখ্যই ভাববেন? সেখানকার বাঙালীর সর্বনাশটা এখানেই। নিজেদের হামবড়া ভাবটাই তাদের দূরে ঠেলে দিচ্ছে সব এলাকা থেকেই। কলকাতার বাবু বাঙালীদের মনের এই ক্ষুদ্রতা এবং অতি সাম্প্রদায়িকতাই সবার মনোযোগ হারাচ্ছে। এমন মনোভাব পরিবর্তন না করলে জাতি হিসাবে একদিন বিলীনই হতে হবে হয়তোবা। তখন ঢাকার বাঙালীদের দিকে তাকিয়ে হা-হুতাশ করা ছাড়া আর কোন উপায় অবশিষ্ট থাকবে না। বাংলাদেশের চ্যানেলগুলো ভারতে প্রদর্শন নিষেধ, বইপত্র প্রবেশেও নানান প্রতিবন্ধকতা– এসব অন্যায়ের বিপক্ষে কলকাতার কবি-সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীদের জোরালো কোন প্রতিবাদ উত্থিত হয়েছে কী? এমন দৃশ্য এখনো কল্পনায়। আসলে এটি হলো সেখানকার বাবু বুদ্ধিজীবীর মনের ক্ষুদ্রতা আর সাম্প্রদায়িকতার মনোভঙ্গির চূড়ান্ত। তা না হলে বিষয়টি এতদিন লালফিতায় আটকে থাকত না। শংকরদের কথা হলো নেব কিন্তু দেব না। রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য ছিল মেলাব, মিলিব। আর এখনকার কলকাতার লেখক বুদ্ধিজীবীদের কৌশল হল মিলিব কিন্তু মেলাব না।

২৯. ১০. ১০

www.pathagar.com

সাহিত্যের উঠানে বন্যবরাহের উৎপাত

রবীন্দ্র-নজরুলের সময়েও সাহিত্যে বিভাজন ছিল। তবে এ বিভাজন শোভনতার সীমাকে অতিক্রম করেনি। খুন শব্দ নিয়ে নজরুল-রবীন্দ্রের মধ্যে কলমযুদ্ধ হয়েছে। কিন্তু তা খুনাখুনির পর্যায়ে গিয়ে ঠেকেনি। মুখ দেখাদেখি বন্ধ হয়নি। হৃদ্যতার এতটুকু কমতি ঘটেনি। শিল্প-সাহিত্যের জগতটাই ছিল তখন এরকম। দল ছিল, চিন্তার বৈপরিত্য ছিল, তবে চলনে-বলনে দলন ছিল না। ফলন ছিল বাধাহীন। প্রতিযোগিতা ছিল, প্রতিবন্ধকতা ছিল না। যে জন্যে সে সময় বাংলাসাহিত্যের নব উত্থান ঘটেছে। রবীন্দ্র-নজরুলের মতো বিশ্বস্পর্শী লেখক পেয়েছে দেশ– সাহিত্য। ক্ষুদ্রতা আর নীচুতা সব মহৎ সৃষ্টির জন্যেই ক্ষতিকর। বর্তমানে এমনি একটি বৈরী কালের মুখোমুখি, বিশেষ করে বাংলাদেশের শিল্প-সাহিত্য জগত। এখানে বন্যবরাহের উৎপাত যেন প্রকট থেকে প্রকটতর হচ্ছে। যে কারণে দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানেও কোন চমকপ্রদ নতুন অর্জন অনুপস্থিত। বিশেষভাবে এই অঙ্গনে।

চিন্তার ভিন্নতাতো থাকতেই পারে। থাকাটাই স্বাভাবিক। মতপার্থক্য অপরাধের কোন ব্যাপার নয়; যতক্ষণ না সেই মত দেশবিরোধী বা জাতি বিধ্বংসীরূপে আবির্ভূত হয়। একজন দায়িত্বশীল লেখক-শিল্পীর কাছে প্রত্যাশা হলো প্রথমতো নিজ দেশের প্রতি আনুগত্য, জাতির ইতিহাস-ঐতিহ্য এবং বিশ্বাসের প্রতি আস্থা। তিনি যদি নিজকে বিশ্বনাগরিকও ভাবেন এরপরও তিনি তার সৃষ্টিতে উপরোক্ত বিষয়গুলোর প্রতিফলন ঘটাতে পারেন, অনায়াসে। আসলে প্রতিটি ব্যক্তিই বিশ্বনাগরিক। বিজ্ঞানের বিস্ময়কর উদ্ভাবন বিষয়টিকে আরো সহজ করে দিয়েছে। তাই পৃথিবীর উত্তর প্রান্তের একজন লেখকের চিন্তার সাথে দক্ষিণ প্রান্তের লেখকের ভাবনার সাজুয্য আবিষ্কার করা যাচ্ছে। পার্থক্য কেবল পরিবেশনার। পরিবেশকে তফাতে রাখলেও কল্যাণের চিহ্নগুলো কি করে আলাদা করবো? কল্যাণতো সব পরিবেশেই হিতকর। বর্তমানে একটি শ্রেণীর উদ্ভব ঘটছে যে শ্রেণী মতের পার্থক্য দেখলেই তেড়ে আসে। অশোভন আচরণ করে। এটি কোন অবস্থায়ই সুস্থতার লক্ষণ নয়। এই অসুস্থ লক্ষণগুলো যেন দিন দিন স্পষ্ট হয়ে উঠছে, আমাদের সাহিত্যে– সমাজে। এখানে লেখকই লেখকের শত্রু হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে। তবে আশার কথা এরা সৃজনী শক্তিতে ততটা পুষ্ট নয়, যতটা অসাহিত্যিক আচরণে পটু। প্রতিভার চমকে এরা চমকিত নন বিধায় এদের চমক ভিন্ন প্রান্তে। চন্দ্রের জোসনাও অসহ্য ঠেকছে এ তালিকায় যাদের অবস্থান তাদের কাছে, ইদানীং। কেউ জ্ঞাতে আবার কেউ অজ্ঞাতে এমনটা করছেন। এখানে সবাই নির্বোধ

www.pathagar.com

এমন ঘোষণা হয়তো দেয়া যাবে না। স্বার্থ বলে একটা শব্দতো রয়েছে বঙ্গ ভাষায়। এটি যে, কোন অবস্থায়ই মঙ্গলের বার্তাবাহী নয় তা হয়তো বলাই বাহুল্য।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন প্রবলভাবে একজন আস্তিক লেখক। জগতের অধিকাংশ বড় প্রতিভা ধর্ম বিশ্বাসের প্রতি তাদের যত প্রণতি। এই আস্তিক্যকেই তারা তাদের সাহিত্যকর্মে যুক্ত করেছেন। আফসোসের কথা হলো রবীন্দ্রনাথের মতো একজন চরম আস্তিক সাহিত্যিককে নিয়ে বাণিজ্য করেন নাস্তিকরা, ধর্মনিরপেক্ষ বলে যারা নিজেদের প্রকাশ করতে ব্যস্ত, তরা। যদিও রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং একটি বিশেষ ধর্মীয় গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করেন। এসব কর্মকাণ্ডে একটা সূক্ষ্ম, কোন কোন সময় স্থূল রাজনীতির প্রলেপও আবিষ্কৃত হয়ে পরে। রবীন্দ্রসাহিত্যের অন্তরের আকুতি এরা গ্রহণ করে না। এরা গ্রহণ করে কতিপয় আচার-অনুষ্ঠান। রাজনীতির সূক্ষ্ম চালটা এখানেই। একথা সত্য রবীন্দ্রনাথের ধর্মবিশ্বাস তাকে মহৎ করেছে। রবীন্দ্রসাহিত্যকে করেছে মহান। বিপরীতে নজরুল বা ফররুখও তাদের সাহিত্যকর্মে যুক্ত করেছেন নিজ ধর্মবিশ্বাস, ইতিহাস-ঐতিহ্যির প্রতি আনুগত্য। একই কারণে রবীন্দ্রসাহিত্য মহৎ হলে নজরুল-ফররুখের বেলায় বাধাটা কোথায়? হীনম্মন্য ব্যাধিতে যারা আক্রান্ত এবং আর একটা শ্রেণী আছে যারা নির্বোধের দলে এরা এখানে এসে তালগোল পাকিয়ে ফেলেন। আরও একটা শ্রেণী আছে নেপথ্যচারী। যারা বিভ্রান্তি ছড়ায়। এই বিভ্রান্তির শিকার আমাদের কতিপয় লেখক-সাহিত্যিক। সংখ্যার দিক থেকে নবীন-তরুণ লিখিয়ে, এরাই এ তালিকায় অধিক। জানা-শোনার স্বল্পতা এবং অল্প অভিজ্ঞতার কারণেই এরা বিভ্রান্তিতে আক্রান্ত হন, শিকার হন।

ভিন্ন মত হলেই এটি অগ্রহণীয় এমন একটি মানসিকতা দিন দিন সোচ্চার হচ্ছে, বিশেষ করে যেসব সাহিত্যিক-লেখক নিজের সৃষ্টিকে ধর্মীয় অনুভবে সিক্ত করেন, আপনসত্তা আবিষ্কারের আগ্রহী, অগ্রণী ভূমিকায়, তাদেরকেই মূলত সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী বলে চিহ্নিত করা হচ্ছে। এমনকি তাদের গতি-বিধির ওপর নজরদারী চালানো হচ্ছে রীতিমত। এরা কোথায় কোথায় আড্ডা দেন, কোন্ কোন্ পত্রিকায় লেখালেখি করেন ইত্যকার অনুসন্ধান নাকি তাদের নিত্য দিনের কর্মযজ্ঞের মধ্যে একটি বৃহৎ অংশ দখল করে রাখে, যারা নিজেদেরকে অসাম্প্রদায়িক অমৌলবাদী বলে ঘোষণা দেন, আধুনিক এবং প্রগতিশীল ভাবেন। লেখাতো লেখাই, যদি সে লেখায় প্রতিভার দীপ্তি থাকে তাতো পাঠকনন্দিত হবেই। ঐ তথাকথিত মৌলবাদ বা সাম্প্রদায়িকতা বাধা হয়ে দাঁড়ানোর কথা নয়। মহাকবি হাফিজ, রুমী, ফেরদৌসী, সাদীরাতো এতো দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানেও বিশ্ব পাঠকের মস্তিষ্কে আলোড়ন তোলে যাচ্ছেন নীরবে, কখনো সরবে। তাদের কাব্যভবনাও ধর্মীয় অনুভবকেই উচ্চকিত করে। তাও আবার 'নির্বোধদের' কথিত 'মৌলবাদী' ধর্ম। আসলে এখানে লেখকের উপস্থাপনের কৌশল এবং প্রতিভার দীপ্তিটাই মূল। বিষয়টি উপলক্ষ মাত্র। তবে লক্ষ্যে পৌঁছার সোপানতো বটেই। রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি কি ধর্মীয় প্রার্থনা সঙ্গীত নয়?

মতের বেমিল হবেই, তাকে 'অচ্ছুত' ভাবতে হবে এ ধরনের আচরণ আদতে মনের ক্ষুদ্রতারই লক্ষণ। বিশেষভাবে যেসব কবি-সাহিত্যিক তাদের লেখায় নিজের

www.pathagar.com

ধর্মীয় বিশ্বাসকে যুক্ত করেন নিজস্ব ইতিহাস-ঐতিহ্যকে প্রকাশ করেন তাদেরকেই টার্গেট করা হয়-হচ্ছে। তাদের অবাধ বিচরণকে বাধাগ্রস্ত করার সবরকম কূটকৌশল প্রয়োগ করা হচ্ছে। এসব কর্মে অগ্রণী ভূমিকায় থাকছে একশ্রেণীর তথাকথিত লিখিয়ে, যাদের প্রতিভার চোখ সঠিকভাবে এখনো ফোটেনি। তাদের সহযোগীরূপে বিশেষ জায়গায় বসে থাকা দু'একজন প্রবীণ-নবীন সাহিত্যকর্মী। তাদের খবরদারী হলো অমুক পত্রিকায় লেখা যাবে না। এদের সাথে মিশা যাবে না। লিখলে বা মিশলে প্রকাশের অন্যসব পথ রুদ্ধ করে দেয়া হবে। এমনটা করেছে ওরা কারো কারো ব্যাপারে, শোনা যায়। তবে স্বস্তির সংবাদ হলো এরা যাদেরকে সাম্প্রদায়িক-মৌলবাদী বলে চিহ্নিত করার দুর্বুদ্ধি আঁটছে বিপুল বিস্ময়ে সেইসব কবি-সাহিত্যিকের মিছিলই দীর্ঘ হচ্ছে প্রতিদিন। হয়তো এটাও একটা ভীতির কারণ হয়ে ওঠে আসছে, আমাদের সাহিত্যের উত্থান নিয়েও যারা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত তাদের কাছে। এজন্যই নানা প্রলাপ। বহু মতের মেলবন্ধন সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে, পুক্ত করে। যারা এই সমৃদ্ধি দেখতে চায় না তারাই নেপথ্য ষড়যন্ত্রকারী। পুতুলকে যে কয়জন ব্যক্তি নাচায় তারা পর্দার আড়ালে অবস্থান করে। তাদের আঙ্গুলে বাধা সুতার টানে পুতুল মঞ্চে নর্তনকুর্দন করে, সেখানে পুতুলের নিজস্ব কোন ইচ্ছা-অনিচ্ছা থাকে না। লিখিয়ে নামধেয় কারো কারো নাচানাচি প্রত্যক্ষ করে মনে হচ্ছে এমনি একটা পুতুল নাচ বাংলাদেশের সাহিত্যমঞ্চে।

সাহিত্যে বিভাজন দোষণীয় কোন বিষয় নয়। তবে মতান্তরকে যখন মনান্তরের পর্যায়ে নিয়ে ঠেকানো হয় তখনি সর্বনাশটা শুরু হতে থাকে। তাছাড়া রহিমের সাথে রামের মতের মিল থাকতেই হবে সাহিত্যে তো এমন কোন দিব্বি নেই। তাহলে এই সৃষ্টি ছাড়া আয়োজন কার স্বার্থে? দলের মনোভঙ্গি দিয়ে কখনো সাহিত্য তৈরি হয় না। করলেও এসবের স্থায়িত্ব বুদবুদের মতো, ক্ষণিকের। কারণ দলতো আরো আছে। তাদেরওতো মতামত থাকতে পারে। এ ব্যাপারে উল্লেখ করা যায় চীন এবং রাশিয়ার দলীয় সাহিত্যের দুর্দশার দৃশ্যটি। জোরজবরদস্তি করে সাহিত্যের গতি পরিবর্তন সম্ভব নয়। নদীর গতির মতোই সাহিত্য চলে। প্রয়োজনে পাড় ভাঙ্গে, কূল ভাঙ্গে। পুরাতন মতকে পরিহার করে নতুন ঠিকানার খোঁজ করে। এটাই স্বাভাবিক পদচারণা। এখানে খবরদারি অচল। ইদানীং যারা খবরদারির মাস্টারিতে নিযুক্তি পেয়েছেন তারা হয় নির্বোধ অথবা যারা বাংলাদেশের সাহিত্যের উত্থানকে ব্যাহত করতে চায় সেইসব ষড়যন্ত্রকারীর দোসর।

১. ১০. ১০

www.pathagar.com

আমার শিক্ষক আমার বন্ধু

চুয়াত্তরে তাঁর সাথে পরিচয় এবং ঘনিষ্ঠতা। তাঁর লেখালেখির জগতে প্রবেশ করেছিলাম এর অনেক আগেই। আবদুল মান্নান সৈয়দ পরাবাস্তব কবি এবং দুর্বোদ্ধ লেখক হিসেবে তিনি তাঁর অবস্থানকে একটা আলাদা উপত্যকায় দাঁড় করিয়ে ফেলেছিলেন ইতোমধ্যে। প্রতিভার প্রখরতা আর সাধনা-মমত্ববোধ সাহিত্যামোদিদের তাঁর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে বাধ্য করেছিল। মান্নান সৈয়দের উপস্থাপনের কৌশল ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ধাঁচের, ভিন্ন মাত্রার। যে কারণে পাঠকের মুগ্ধতা ছিল তাঁর প্রতি। তিনি ছিলেন বহুমাত্রিক প্রতিভার ধারক। কবি, প্রাবন্ধিক, গবেষক, সমালোচক, গল্পকার, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক, সম্পাদক, অভিনেতা, কী ছিলেন না তিনি। প্রতিটি অঙ্গনেই মান্নান সৈয়দ ছিলেন প্রথম কাতারের। নজরুলগবেষক হিসেবে অনন্য। কবি জীবনানন্দ দাশের পুনর্জন্মতো মান্নান সৈয়দের হাতেই। রবীন্দ্রনাথ, মানিক বন্দোপাধ্যায়, ফররুখ আহমদকে নিয়ে লিখতে পারতেন, বলতে পারতেন অবিরল। তাঁর জানাশোনার ভুবন ছিল বিশাল। তিনি বলতেন এদেশে কতিপয় লোক রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে রাজনীতি করে। কিন্তু তাঁর সাহিত্য ব্যাপারে ওরা নিশ্চুপ। অজ্ঞতা থেকেই এমন মানসিকতার উদ্ভব। তিনি বলতেন রবীন্দ্রনাথকে আমার মতো কজনে পাঠ করেছে? তাই দেখা যেতো নজরুলবার্ষিকীতে প্রধান বক্তা মান্নান সৈয়দ, রবীন্দ্রবার্ষিকীতে প্রধান উপস্থাপক বা মূল প্রবন্ধ পাঠকও মান্নান সৈয়দ। জীবনানন্দ-ফররুখ বা মানিকের সভা-সেমিনারেও শিরোমণি মান্নান সৈয়দ। এ দৃশ্য থেকেই আন্দাজ করা যায়, তাঁর পড়াশোনার ব্যাপকতা কতটা বিস্তীর্ণ ছিল। যেকোন তুচ্ছ বিষয়েও মান্নান সৈয়দ বলতে পারতেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। এই যে বলার ক্ষমতা, অর্জন করতে হয়েছে অধ্যয়নের প্রতি ব্যাপক অভিনিবেশের কারণে। যা ছিল মান্নান সৈয়দে ষোলআনা উপস্থিত। তাছাড়া কবি আবদুল মান্নান সৈয়দ ছিলেন সাহিত্যিক বিভাজনের বাইরে। এই নীচু মানসিকতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। তিনি দলমত নির্বিশেষে সব পত্রিকায় লিখতেন, সবার সাথে মিশতেন। তিনি ছিলেন উদারচিত্ত মানুষ। তাঁর কথা ছিল 'মতান্তর থাকতেই পারে, মনান্তর হবে কেন'? আমাদের সমাজে কতিপয় লোক আছে যারা সাহিত্যেকও বিভাজিত করতে চায়। তারা দলের নিরিখে সাহিত্য বিচার করে। আসলে এই শ্রেণীর লোক সত্যসন্ধ লেখকের যেমন শত্রু, ওরা সাহিত্যেরও দুশমন। কল্যাণকামী সাহিত্য কোন বিশেষ দলের চিন্তা-চেতনাকে ধারণ করে না। সাহিত্যের অবস্থান দলের উর্ধ্বে, সর্ব প্রকার সংকীর্ণতার বাইরে। বলতে দ্বিধা নেই মান্নান সৈয়দ ছিলেন সর্বজনগ্রাহ্য এক সাহিত্যসাধক। সমাজ সচেতন একজন লেখক, ঐতিহ্যপ্রিয় বিদ্বজন।

www.pathagar.com

জগন্নাথে এমএ ক্লাসের ছাত্র থাকাকালীন সময় মান্নান সৈয়দের সাথে একান্তভাবে মেশার সুযোগ পেয়েছিলাম। যে মেলবন্ধন তাঁর ইন্তিকালের আগ মুহূর্ত পর্যন্ত অটুট ছিল। আমি ছিলাম তাঁর প্রিয় ছাত্রদের একজন। তিনি ছিলেন বাংলা বিভাগের শিক্ষক। আর আমি সে বিভাগের ছাত্র। আমাদের ছন্দের ক্লাস নিতেন তিনি। পাঠদানের কৌশলটি ছিল চমৎকার। ক্লাস চলাকালীন সময় কোন প্রকার গুঞ্জন প্রশ্রয় পেত না। আবিষ্ট মনে তাঁর প্রতি মনোযোগী হতো সবাই। লেখালেখির অভ্যাস থাকার কারণে মান্নান সৈয়দের জীবন-জিজ্ঞাসার সাথে কখন যে যুক্ত হয়ে পড়েছিলাম বুঝতে পারিনি। এই হৃদ্যতা বিমুক্ত হয়নি শেষদিন অবধি। তাঁর প্রতিটি বাসায়, প্রতিটি কর্মস্থলে আমার গতায়াত ছিল অবাধ। তিনি যখন নজরুল ইনস্টিটিউটে, প্রায়ই ফোন করতেন, আমাকে বলতেন, চলে এসো, আজ দুপুরে একসাথে খাবো। অথবা তিনি বলতেন, অফিসে আছোতো, আমি আসছি। তিনি তাঁর খাবার সাথে রাখতেন। অসুস্থতার পর বাইরের খাবার গ্রহণ করতেন না। আমার এখানে বসে বেগ থেকে খাবার বের করতেন এবং আমার জন্য হোটেল থেকে খাবার আনাতেন, আমাকে মূল্য দিতে বারণ করতেন। এমন অনেকদিনই করেছেন তিনি। সংগ্রামসাহিত্যে প্রকাশিত তাঁর বহু লেখাই আমার কক্ষে বসে শেষ করেছেন। কোন কোনটি সম্পূর্ণটাই এখানে বসে লেখা। মাস ছয়েক আগে সংগ্রামসাহিত্যে প্রকাশিত মান্নান সৈয়দের শেষ লেখাটিও চা পান করতে করতেই সমাপ্ত করেছিলেন। সেটি ছিল তাঁর শিক্ষকজীবনের স্মৃতির এক ঝলক। তিনি বলতেন, তুমিতো শুধু আমার ছাত্রই নও আমার বন্ধুও বটে। তিনি তাঁর ব্যক্তিগত কথা, সংসারের কথা কারো কাছে প্রকাশ করতেন না। এসব ব্যাপারে কেউ জিজ্ঞেস করলে বিরক্ত হতেন, কোন কোন সময় ক্ষেপে যেতেন। কিন্তু তিনি তার মনোবেদনা-আনন্দ অনেক কিছুই আমার সাথে শেয়ার করতেন। তিনি তাঁর মোবাইল নম্বর কাউকে দিতেন না। সৌভাগ্যবান যে দু'একজন জানতো তাদের মধ্যে আমিও ছিলাম একজন। বাসায় গেলে ভাবীকে ডেকে বলতেন এই রানু সাজজাদ এসেছে, ওকে মিষ্টি দাও। তিনি জানতেন আমি মিষ্টি পছন্দ করি। তিনি যখন গেজেটিয়ারে কাজ করতেন তখন তার কাছে গেলে হাতীর পুলের দক্ষিণ মাথায় একটা মিষ্টির দোকান ছিল আমাকে সেখানে নিয়ে যেতেন তিনি। তার হৃদয়ের এই উষ্ণতা আমাকে আপ্লুত করেছে বরাবর। আমিও শিক্ষকের প্রতি যতটা বিনীত হওয়া প্রয়োজন তার সবটাই ঢালতে চেষ্টা করেছি। আমার অসুস্থতার সময় তিনি দেখতে এসেছিলেন মিরপুরের বাসায়। আরও একবার উপস্থিত ছিলেন একটি ঘরোয়া অনুষ্ঠানে। তাঁর একমাত্র মেয়ে জিনানের বিয়েতে দাওয়াত দিতে সংগ্রামে এসেছিলেন। আমাকে টেবিলে না পেয়ে একটি চিরকুট রেখে গিয়েছিলেন, তাতে লেখা ছিল 'ব্যক্তিগত অতি জরুরি, সাজজাদ, আজ সন্ধ্যেবেলা সপরিবারে তুমি 'সাজান কমিউনিস্ট সেন্টার' (সোহাগ কমিউনিটি সেন্টার ও পাসপোর্ট অফিসের মাঝখানে) অবশ্যই আসবে। কার্ডদ্রষ্টব্য। আবদুল মান্নান সৈয়দ ৩/৩/৯২।' গত বছর আমার সাহিত্যকর্ম নিয়ে তিনি 'কালের ছায়া' শিরোনামে একটি লেখা লিখেছিলেন। কবি মান্নান সৈয়দের এই লেখাটিকে আমি তার স্নেহের পরশ বলেই মনে করি। স্মৃতি সতত বেদনার। স্যারের সাথে আমার স্মৃতির অন্ত নেই। গত পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বছরের স্মৃতি কি এত অল্প সময়ে ব্যক্ত করা সম্ভব?

www.pathagar.com

'সাজজাদ কেমন আছ', স্যারের এই বাক্যটি আমার কানে আটকে আছে। হয়তো আরও বহুদিন বাজবে। গত তিন-চার মাস প্রায় প্রতিদিন আমাকে ফোন করতেন। কোন কোন সময় দু'বার। কথা বলতেন নদীর ঢেউয়ের মতো। পনর-বিশ মিনিটের আগে টেলিফোন রাখতেন না। বিষয় অধিকাংশ সময়ই সাহিত্য, লেখালেখি টুকটাক ব্যক্তিগত। স্যারের একটা অভ্যাস ছিল তার কোন লেখা প্রকাশ পেলেই আমাকে ফোন করে বলা অমুক পত্রিকায় প্রকাশিত লেখাটা পড়েছ? না পড়ে থাকলে এখনি পড়ে নাও, আদেশ করতেন। আরে পড়াশোনা না করলে লিখবে কি। আমারও অভ্যাস ছিল আবদুল মান্নান সৈয়দের কোন লেখা ছাপা হলেই তা পাঠ করা। মাস কয়েক আগে ফোন করে জানালেন 'গীতাঞ্জলি' নিয়ে তার একখানা প্রবন্ধ প্রকাশ পেয়েছে, একটি দৈনিকের সাহিত্যপৃষ্ঠায়, আমি যেন লেখাটি সত্বর পাঠ করি। আরও জানালেন লেখাটিতে প্রচুর নতুন তথ্য আছে। মান্নান সৈয়দের লেখায় নতুন তথ্য থাকা তো স্বাভাবিক। কথার এক ফাঁকে জানালাম স্যার আমার সংগ্রহে 'গীতাঞ্জলি'র প্রথম মুদ্রণটি রয়েছে, ডাব্লু বি ইয়েটসের ভূমিকাসহ ১৯১২ সালের। মনে হলো তিনি লাফিয়ে উঠেছেন। জবাব এলো 'বলো কি! তাহলে তো তোমার বাসায় একদিন আসতে হবে। ফোনআড্ডা চলেছিল অনেক সময় ধরে। তখনি তিনি আমাকে জানিয়েছিলেন বাংলাসাহিত্যের চারটি কাব্যগ্রন্থ নিয়ে সহসা একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখবেন, মনে মনে প্রস্তুতি নিচ্ছেন। শরীর-স্বাস্থ্য ভাল থাকলে ঈদের পর পরই শুরু করবেন। এই চারটি কাব্যগ্রন্থই পুষ্পিত হয়েছে ধর্মীয় অনুভবকে আশ্রয় করে। তার মতে, গ্রন্থগুলো বাংলাসাহিত্যের টার্নিংপয়েন্ট, মাইলস্টোন। কাব্যগুলো তিনি সাজিয়ে ছিলেন এভাবে- কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গীতাঞ্জলি' কবি কাজী নজরুল ইসলামের 'মরুভাস্কর' কবি ফররুখ আহমদের 'সীরাজাম মুনিরা'-এবং চতুর্থ গ্রন্থটির শিরোনাম আবদুল মান্নান সৈয়দের 'সকল প্রশংসা তাঁর'। কবি গবেষক আবদুল মান্নান সৈয়দের চিরপ্রস্থান এমন একটি মহত বিবেচনা থেকে বঞ্চিত হলো পাঠক, সাহিত্যপ্রেমী বাংলাভাষীকুল। তাঁর আরো একটি অভিপ্রায় প্রায়শই প্রকাশ করতেন। তিনি বলতেন, সব ভাষার বড় লেখকরা জীবনের কোন না কোন সময়ে তাদের মেধাকে বিশ্বচরাচরের রহমত মহামানব হযরত মুহম্মদ মোস্তফা (সা.)-এর জীবনে সমর্পণ করেছেন। আমারও ইচ্ছা আমিও তাঁকে নিয়ে একটি দীর্ঘ পুস্তক রচনা করি। তার এ ইচ্ছা যৎকিঞ্চিৎ ধ্বনিত হয়েছে সকল প্রশংসা তাঁর কাব্যগ্রন্থে।

গত ৫ই সেপ্টেম্বর ইফতার শেষ করে সবেমাত্র মাগরিবের সালাত আদায় করেছি, এমন সময় কবি রেদওয়ানুল হকের টেলিফোন, শুনেছেন কবি আবদুল মান্নান সৈয়দ নাকি ইন্তিকাল করেছেন টেলিভিশনে খবর দিচ্ছে! আমারতো তখন আকাশ থেকে মাটিতে পড়ার যোগাড়। পরপর আরো কয়েকটি ফোন পেলাম। কারেন্ট না থাকায় টেলিভিশন দেখা গেল না। খবরটি বিশ্বাস হচ্ছিল না কোনমতেই। কারণ এই তমাশাচ্ছন্ন ৫ তারিখ সকালে স্যারের সাথে আমার কথা হয়েছে। নতুন লেখার জন্য বা কোন সাহিত্য তথ্যের জন্য আমিও প্রায়ই স্যারকে বিরক্ত করতাম। ইদানীং তিনি প্রচণ্ডরকম হতাশায় ভুগছিলেন, দেশের অবস্থা, সাহিত্যের বিভাজন তাকে পীড়া দিত।

www.pathagar.com

মাস কয়েক আগে আবদুল মান্নান সৈয়দকে কারা যেন থ্রেট করেছিল এই এই পত্রিকায় লেখা যাবে না। লেখলে বিপদ হবে। স্যার ছিলেন এমনিতে ভীতু প্রকৃতির লোক। এতে তিনি ভীত ছিলেন। জিজ্ঞেস করলে বলতেন বিষয়টা তোমার কাছে পরে খোলাসা করবো। তবে আকারে-ইঙ্গিতে কতকটা প্রকাশ ও করেছিলেন। সেদিন ফোন করেছিলেন নটা-সাড়ে নটার দিকে। প্রায় দশ মিনিট কথা হয়েছিল। আন্দাজই করতে পারিনি তিনি আজই আমাদের কাছ থেকে চিরবিদায় নিচ্ছেন। তাঁর একটি পান্ডুলিপি নিয়ে কথা হয়েছিল, আমারই মধ্যস্থতায় বাংলাবাজারের এক প্রকাশককে পান্ডুলিপিটি দিয়েছিলেন। প্রুফ এবং কিছু সম্মানী নিয়ে তাঁর বাসায় সেই প্রকাশকের পৌঁছার কথা ছিল সেদিন। কিন্তু কোন বিশেষ কারণে প্রকাশক হাজিরা দিত পারেননি। আবার ফোন এলো বেলা পৌনে দু'টার দিকে। অপরপ্রান্তে কবি গবেষক আবদুল মান্নান সৈয়দ। এবার তাঁর গলায় হালকা বিরক্তির রেশ। বললেন, ঐ ছেলেটিতো এখনো এলো না। তুমি পান্ডুলিপিটি ফেরত নিয়ে নিও। ঈদের পর তোমার কাছ থেকে সংগ্রহ করবো। বাংলাসাহিত্য পরিষদ এটি প্রকাশ করবে। তুমিতো ভালোর জন্যেই দিয়েছিলে, ওরা পারলো না কি করা। তারপরই অন্য কথায় চলে গেলেন। বললেন, শোন আজ বিকালে আমি ডাক্তারের কাছে যাচ্ছি, আমার জন্য দোয়া করো। আমি বললাম স্যার, আমার জন্যও দোয়া করো। আমি বললাম স্যার, আমার জন্যও দোয়া করবেন। তিনি হাসলেন, বললেন অবশ্যই। কে জানতো এই কথাই তাঁর শেষ কথা হবে, আমার সাথে। রাত সোয়া আটটাই গিয়ে পৌঁছলাম ৫১/৫২ গ্রিন রোডের সেই সুবাস্তু টাওয়ারে, যেখানে বহুবার এসেছি প্রাণোচ্ছল কবি মান্নান সৈয়দের বাসায়, আমার প্রিয় শিক্ষকের আস্তানায়। তাঁর লাশ রাখা আছে এম্বুলেন্সে, শিয়রের কাছে বসে কাঁদছে তাঁর একমাত্র মেয়ে জিনান। ভক্তরা আসছেন একে একে। খবর শুনে সেই প্রকাশকও বাংলাবাজার থেকে ছুটে এসেছিলেন, ব্যথিত মনে। ততক্ষণে বাংলা সাহিত্যের ঝলমল তারাটি ঠিকানা বদলে ফেলেছেন। আমি তাঁর কপালে হাত রাখলাম, তখনো সেখানে বিন্দু বিন্দু ঘাম। তাঁর চেহারার দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছিল এই বুঝি তিনি বলবেন 'সাজজাদ কেমন আছো'?

১৭. ৯. ১০

www.pathagar.com

উৎসেই যখন দহন শুরু হয়

একসময় দেশ-বিদেশের মনীষীদের জীবনপাঠে আগ্রহবোধ করতাম। বিশেষ করে স্কুলজীবনে। স্কুলের স্যাররাও মনীষীদের নাম ধরে ধরে বলতেন অমুকের জীবনী পড় তমুকের জীবনী পড়। সে নামের তালিকায় দেশী-বিদেশী অনেকের নামই যুক্ত হতো। কবি-সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক, ধর্মবেত্তা, বিজ্ঞানী, রাজনীতিবিদ কেউ বাদ পড়তো না। আমরাও তখন যথাসাধ্য চেষ্টা করতাম বইগুলো যোগাড় করতে। পাঠ্য বইয়েও প্রয়োজনমত পাঠ তালিকায় রাখা হতো নানা জনের জীবনবৃত্তান্ত। হাজী মুহম্মদ মহসিন আর জগদীশ চন্দ্র বসুকেতো চিনে ফেলেছিলাম প্রাইমারি ক্লাসেই। স্যার সৈয়দ আহমদ, রাজা রামমোহন রায়, মাওলানা শওকত আলী, মোহাম্মদ আলী, করম চাঁদ গান্ধী, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, নবাব সলিমুল্লাহ আর হাজী নিসার আলী তিতুমীরের জীবন পাঠে মুগ্ধ হতাম। তাছাড়া রাসূল (সাঃ) এবং চার খলিফার জীবন পাঠতো ছিল বাধ্যতামূলক। স্যারদের আন্তরিকতা আর পাঠদানের কৌশলে পাঠকরাও একাত্ম অনুভব করতো মনীষীদের বেড়ে ওঠার সাথে। তখন বিভাজন ছিল না, মানসিক সংকীর্ণতা এতটা প্রবলও ছিল না। সে জন্য দল-ধর্ম-সম্প্রদায় কোনটাই বাধা হয়ে দাঁড়াতো না, তাদের ভালো কর্মগুলোকে আপন করে নিতে। তখন শিক্ষা ছিল সত্যকে গ্রহণ করার, আর মিথ্যাকে বর্জন করার শিক্ষা। শিক্ষকরা ছাত্রদের বিবেচনা করতেন আপন সন্তান। সেভাবেই তারা ছাত্রদের অন্তরে ফোটাতেন জ্ঞানের পুষ্প। বর্তমানেতো জ্ঞান আহরণের পরিবর্তে রাজনীতির সবক'টাই মুখ্য। আজকাল পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তুতেও দলের অপছায়া। যখন যে দল ক্ষমতায় আসে তখন তারা বইপত্রে দলের দাপটকেই প্রবল করে তুলে। সত্য-মিথ্যা একাকার হয়ে ওঠে। দলের নীতি-নিষ্ঠতা তখন তামাম জাতিরই কেবল নয় সমগ্র মানবজাতির নীতিরূপেই যেন প্রতিষ্ঠা পেয়ে যায়। দলবাজ শিক্ষক আর দলবাজ ছাত্রের পেষণে প্রকৃত শিক্ষার অবস্থা এখন ত্রিশংকু। দলের নীতির সাথে একাত্ম না হলে তিনি যত বড় মনীষীই হোন না কেন তাকে পাঠতালিকা থেকে খারিজ করে দেয় এসব দলবাজ শিক্ষকরা, তাদের নামের সাথে নানা অপবাদ যুক্ত করে। কুরুচীপূর্ণ অভ্যাসই হোক বা মূর্খতাই হোক এটিই যেন এখন একটা দস্তুরে পরিণত হতে যাচ্ছে। এই দস্তুর ইদানীং প্রায় সর্বব্যাপী সংক্রমিত। জীবনের প্রতিটি এলাকায় এই ব্যাধির অনুপ্রবেশ যেন অবাধ এখন। হিংসা আর বিদ্বেষের সর্বগ্রাসী বিষকামড়, অসত্য আর মিথ্যার বিস্তার পরিবেশ-পরিস্থিতিকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে তুলছে প্রতিনিয়ত। যে কারণে দেশের উন্নয়ন এবং জাতি বিকাশ

www.pathagar.com

বারবার পর্বতপ্রমাণ বাধার মুখোমুখি। যারা বরণীয়, যারা স্মরণীয় তাদের প্রতি অবজ্ঞা, তাদের প্রতি অমোচনীয় অবহেলা এটি যেন কোনো ব্যাপারই নয়। যার প্রতিফল ভোগ করতে হচ্ছে সমগ্র জাতিকে, বিবেকবান মানুষকে। স্কুলজীবনেই পাঠ করেছিলাম একটি কবিতা 'ভাব সম্প্রসারণ কর' এই বলে প্রায় পরীক্ষায়ই থাকতো সেই কবিতাটির ক'টি লাইন। অনেকটা এ রকম ছিল লাইনগুলো- 'মহাজ্ঞানী মহাজন/ যে পথে করে গমন/ হয়েছেন প্রাতঃস্মরণীয়/ সেই পথ লক্ষ্য করি/ স্বীয় কীর্তির ধ্বজা ধরি/ আমরাও হবো বরণীয়।' বালকবয়সে পঠিত এ কবিতাটির গ্রহণযোগ্যতা বোধহয় হারিয়ে ফেলেছে বহু আগেই। বিশেষ করে বাংলাদেশের ইদানীংকালের পরিবেশ-পরিস্থিতিতে। এই কবিতার লেখক যদি আজতক জীবিত থাকতেন তবে বোধহয় এমনটাই ভাবতেন। আর নিজের চিন্তার দীনতা নিয়ে আফসোস করতেন। তামাম বিশ্বেই কতক ব্যক্তিত্ব আছেন যারা স্মরণীয়-বরণীয় এবং অনুকরণ অনুস্মরণীয়। ব্যতিক্রম বোধহয় কেবল বাংলাদেশ। এখানে কেউ যদি কোন স্মরণীয় ব্যক্তিকে বরণ করতে চান, কালবিলম্ব না করে ভিন্নমতের অন্যজন সেই স্মরণীয় ব্যক্তিটির চৌদ্দগোষ্ঠী উদ্ধার করে রচনা তৈরি করে ফেলবেন। দলবাজ পত্রিকাগুলোও অতীব গুরুত্বের সাথে সেই রচনা প্রকাশ করে দিবেন সত্য-মিথ্যার বালাই না করেই। প্রতিটি ব্যাপারেই এখানে বিতর্ক। ধোঁয়াসার ধূম্রজাল। ধর্ম, ইতিহাস, সাহিত্য, রাজনীতি, শিল্প প্রতিষ্ঠান কোনটাকেই বিতর্কের বাইরে রাখা যাচ্ছে না। এ ব্যাধি আগেও যে ছিল না তা নয়। তবে বর্তমানের মতো পরিবেশের স্বাভাবিকতাকে বাধাগ্রস্ত করতো না। বিষয়টি এখন প্রকট থেকে প্রকটতরের দিকেই যেন ধাবিত হচ্ছে। আতংকের খবর হলো একশ্রেণীর বৃদ্ধ থেকে প্রাইমারির শিশু পর্যন্ত এই অকল্যাণকর বিতর্কে জড়িয়ে যাচ্ছে, জড়ানো হচ্ছে। আমাদের স্মরণীয়-বরণীয় কারা! শেরেবাংলা, মওলানা আকরম খাঁ, খাজা নাজিম উদ্দিন, নবাব সলিমুল্লাহ, আবুল হাশেম এমন আরও অনেকেরই নামের উল্লেখ করা যায়। এসব নাম শোনামাত্রই অন্য একদল সুজন-কুজনের ব্যানারে গেল গেল বলে ঝাঁপিয়ে পড়ছে ময়দানে। তাদের ভাষ্য ওরা আমাদের স্মরণীয়-বরণীয় হতে যাবে কেন? ওরাতো মৌলবাদী, সাম্প্রদায়িক সিআইয়ের দালাল, পাকিস্তানের দালাল, প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জুয়া। অন্যদিকে মওলানা ভাসানী, শেখ মুজিবুর রহমান, মওলানা তর্কবাগীশ, মুশতাক আহমদ, জিয়াউর রহমান তারাও বিতর্কের ঊর্ধ্বে থাকছে না। তাদেরকে চিহ্নিত করা হচ্ছে ভারতের দালাল, চীনের দালাল, রাশিয়ার দালাল, ধর্মহীন মুর্তাদ কাফের হিসাবে।

বাংলাদেশের লেখালেখির এলাকায়ও বিভাজনের অন্ত নেই। তারাও দালাল সাম্প্রদায়িক, ধর্মদ্রোহী, মৌলবাদী ইত্যাকার বিশেষণে বিশেষিত। ধর্ম প্রচার যারা করে তারাতো 'সমাজচ্যুত' একশ্রেণীর অতিবুদ্ধিজীবীর দৃষ্টিতে। শিল্পজগতে নাকি সব দুর্নীতিবাজ, ঠকবাজ, চোরাকারবারী কর ফাঁকিবাজ পত্র-পত্রিকায় এমন খবর প্রায়ঃশই প্রকাশ করে। কয়েদ করা হয় শিল্পপতিদের। মামলা-মোকদ্দমাতো চলছে এন্তার। এক সরকার এসে ঘোষণা দেয় বিরোধী রাজনীতিকরা সব চোর-ডাকাত, দেশোদ্রোহী, তাদেরকে জলে পাঠাও, মামলা কর, রিমান্ডে নাও। আজকালতো ছিঁচকে চোরের

www.pathagar.com

জন্যও রিমান্ডের ডিমান্ড করে উকিল। আবার অন্য সরকার এসে পূর্বের সরকারের পথটিই মসৃণ ভেবে, একই পথে হাঁটতে স্বচ্ছন্দ বোধ করে। বাংলাদেশের মানুষজন যে দুর্নীতিপরায়ণ-এর প্রতিষ্ঠা পায় সরকারিভাবেই, সীলছাপ্পরসহ। বাংলাদেশ চুরি-চামারীতে বারবার বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হবার কারণ বোধহয় এটিও একটি। আমরা আমাদের নিজেদেরকেই উপস্থাপন করি অসভ্য জাতি রূপে বিশ্ব সমাজের কাছে। একজন আর একজনকে ভিনদেশী চর হিসাবে চিহ্নিত করতে দ্বিধা করি না।

এই যদি হয় সার্বিক অবস্থা- তাহলে কাকে স্মরণ করবো, কাকে বরণ করবো? বৃটিশবিরোধী আন্দোলনের একজন অগ্রসেনানী ছিলেন মাওলানা মুহাম্মদ মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী। অস্ত্র সংগ্রহ করতে গিয়ে বৃটিশ চরদের হাতে পাকড়াও হয়েছিলেন আফগান সীমান্তে। তাকে আমরা ক'জন জানি বা জানানোর ব্যবস্থা করি। বহু ভাষাবিদ ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বর্তমানে এক প্রকার বিস্মরণের তালিকায়। তাকে নিয়ে তেমন কোন আলোচনা নাই, আলোকপাত নাই। 'পারস্য প্রতিভা'র লেখক মুহম্মদ বরকত উল্লাহ নামের এক লেখক ছিলেন সে খবর বর্তমান প্রজন্মের সামনে উপস্থাপন করে না কেউ। এই না করে করে স্মরণীয়, বরণীয়দের বিস্তৃতির জঞ্জালে জড়িয়ে ফেলা হচ্ছে। এক শ্রেণীর শিক্ষিতজনকে মানসিক বৈকল্যে পেয়ে বসেছে। আত্মবিশ্বাসের অভাবজনিত কারণেই এই বৈকল্যের জন্ম। যে জন্যে বৃটিশবিরোধী যোদ্ধা সুবেদার রজব আলী অবহেলা আর অবজ্ঞার তালিকায় উঠে আসেন। গবেষক-বুদ্ধিজীবীরাও তার ব্যাপারে বরাবরই শীতল যতটা উচ্চকণ্ঠ সূর্যসেন বা প্রীতিলতার ব্যাপারে। মানসিক গরিবি নিম্নমুখি হলেই এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়।

প্রতিটি জাতিরই স্মরণ করার মতো ব্যক্তিত্ব এবং বরণ করার মতো ব্যক্তিত্ব থাকে। যারা সে জাতির দুর্দিনের বাতিঘর। যে ঘরের আলো তাদের পথের সন্ধান দেয়। গরিমা ও গর্বের আধার হিসাবে ওঠে আসে, শিকড়ের অস্তিত্ব অনুভব করে। বোধহয় আমরাই সেই দুর্ভাগাজাতি, মাটিসহ নিজের আত্মপরিচয়ের শিকড় উপড়ে ফেলায় ব্যস্ত। স্বাধীনতার স্থপতি শেখ মুজিবুর রহমানকে চিহ্নিত করা হয় ভারতের দালাল আবার অন্যদিকে স্বাধীনতার ঘোষক জিয়াউর রহমানকে পাকিস্তানের দালাল বলে সাব্যস্ত করা হয়। এরপর গোলাম আযম, নিজামীকে বলা হচ্ছে সৌদি আরবের দালাল। তবে তো বাংলাদেশের আপন বলে কেউ আর অবশিষ্ট থাকছে না। আমরা কাকে স্মরণ করবো, কাকেই বা বরণ করবো? এলেক্স হেক্সিলিতো সন্ধান করে করে তার শিকড় পর্যন্ত পৌঁছতে পেরেছিলেন। তার আত্মপরিচয় আবিষ্কার করেছিলেন। বাংলাদেশে ইদানিংকালের যা আয়োজন তাতে তো সামনে শুধু অন্ধকার। উৎসভূমিতেই যখন দহন শুরু হয় সে দহনের জ্বালা শিকড় পর্যন্ত পৌঁছতে বেশি সময়ের প্রয়োজন পড়ে না।

২৩. ৭. ১০

www.pathagar.com

লিখতে না পারার বেদনা

লিখতে গিয়ে থেমে যাচ্ছে কলম। জট পাকিয়ে যাচ্ছে ভাবনা-চিন্তায়। লিখেই যখন জীবন ধারণ করি তখন না লিখতে পারার বেদনা মনকে পীড়িত করে বৈ কি। এই পীড়ন মস্তিষ্কেও ঘর বাঁধে। তখন দেখাতেও হেরফের ঘটে যায়। ঝাপসা হয়ে আসে নজর। অতি দেখার প্রবণতাও উঠে আসে মাঝে মধ্যে। চারপাশে যে ধরনের আলামত প্রত্যক্ষ করছি তাতে করে সঞ্চারিত হচ্ছে ভীতি, দেহ ও মনে। সত্য বলতে গেলেও ভয়, লিখতে গেলেও ভয়। যেমন স্বাধীনতার শুরুর কয়েকটা বছর দিনাতিপাত করেছিল দেশবাসী। একটা অস্বস্তি আর ভীতিকর সময় ছিল তখন। সময় নাকি চলে যায়, সময় কিন্তু আবার ফিরেও আসে। পারিপার্শ্বিক অবস্থা দেখে তেমনটাই প্রতীয়মান হচ্ছে। স্বস্তিহীনতার সাথে সাথে সম্ভ্রমহীন সময়ের ভিতর যেন একটু একটু করে ঢুকে যাচ্ছি। হায়া-শরম-বিবেক কিছুরই অবশিষ্ট থাকছে না আর। নিরীহ মানুষজনদের জন্য এটা দুঃসময় না সুসময় ভবিষ্যতই নির্ণয় করবে বিষয়টি। কি লিখবো আর কি লিখবো না, দ্বন্দ্বটা সেখানে নয়। মোটকথা লিখতেই মন চাইছে না। চারপাশে লেখার অন্তহীন বিষয়। অতি ভোজন যেমন পেটের জন্য ক্ষতিকর, ঠিক তেমনি অতি বিষয় যতিহীনতার লক্ষণ। এই তো সেদিন নিমতলীতে কত উচ্ছল সংসার পুড়ে ছাই হলো, অবসান ঘটলো একশত উনিশটি জীবনের। মরণযন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে আরো কতজন। এখন আমাদের বোধ জাগ্রত হয়েছে। রাসায়নিক পদার্থের গুদাম আবাসিক এলাকায় থাকবে কি থাকবে না সেই সিদ্ধান্তের আঁচল ধরে এতকাল পর টানাহেঁচড়া। সীলগালা নিয়ে দৌড়ঝাঁপ করছে কর্তাব্যক্তিরা। কোনো প্রকার সময় না দিয়ে হুটহাট সব সীলগালা মেরে দিলেতো মুশকিল। রাসায়নিক সরঞ্জামের অভাবে যে অন্য রকম বিপদও আসতে পারে সেই বোধটাওতো থাকা দরকার। পুরান ঢাকা ঘিঞ্জি এলাকা, জরাজীর্ণ দালান-কোঠা, এই বুঝি পড় পড়। হতশ্রী রাস্তা-ঘাট। কর্তাব্যক্তিদের আলাপ-সালাপ শুনে মনে হচ্ছে এসব এই মাত্র তাদের নজরে এলো। কোনো রকম অঘটন ঘটলেই ঘুম থেকে জাগেন কর্তৃপক্ষ, মন্ত্রী-আমাত্যরা। তাই জীবনানন্দ দাসের মতো বলতে হয় 'এতদিন কোথায় ছিলেন নাটোরের বনলতা সেন!'

বেগুনবাড়িতে দালান ভেঙে প্রাণ হারালো পঁচিশ-ছাব্বিশজন। এই পড়ে যাবার প্রক্রিয়াটিতো আর একদিনে শুরু হয়নি, বেশ ক'দিন যাবতই হেলাহেলির ব্যাপারটি ঘটছিল হয়তো। কিন্তু নজর দেয়ার ফুরসত কারো ছিল না। এলাকার বাসিন্দাদের, না কর্তৃপক্ষের। যা হবার তাই হলো। আকাশ ভেঙে বাজ পড়ার মতো দালান ভেঙে মাথায় পড়লো।

www.pathagar.com

আচমকা 'আমার দেশ' পত্রিকা বন্ধের সরকারি ঘোষণা, সম্পাদককে গারদেপুরা, রিমান্ডের নামে শারীরিক নির্যাতন দেশবাসীর মাথায় আকাশ ভেঙে বাজ পড়ার মতোই আর একটি খবর উঠে এলো প্রায় সমসময়ে। এই অন্যায় এবং অশোভন খবরটি দেশের যেকোনো বিবেকসম্পন্ন নাগরিককে বিচলিত করা স্বাভাবিক। মত প্রকাশের স্বাধীনতা গণতান্ত্রিক রীতি-নীতিরই অংশ। কিন্তু 'আমার দেশ' সংক্রান্ত ব্যাপারটিতে বর্তমান সরকার সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়নি এমন মত দেশের বিজ্ঞজনরা ব্যক্ত করেছেন। এটি যে সরকারের হিংসাত্মক আচরণেরই বহিঃপ্রকাশ সে মতও তারা উচ্চারণ করেছেন লেখায়, কথায়। ভিন্নমত থাকতেই পারে। তাই ভিন্নমতিদের টুটি চেপে ধরাটা কোনো সভ্য চিন্তার কর্ম নয়। কিন্তু সেই কর্মটিই করা হচ্ছে হর-হামেশা, অভব্যভাবে।

একেবারেই ঠুনকো অজুহাতে চ্যানেল ওয়ানের সম্প্রচার বন্ধ করে দিলো সরকার। যমুনা টিভি'র চোখেও পট্টি বাঁধা হলো। বলা হলো খামোশ! ভিন্নমতে এতটা অসহিষ্ণু হলেতো মুশকিল। একদিকে ঘোষণা হচ্ছে অবাধ তথ্যপ্রবাহের পক্ষে, অন্যদিকে বন্ধ করা হচ্ছে বিপক্ষ মতের পত্রিকা-চ্যানেল। এই যে আচরণের বৈপরিত্য তা একটি সুসরকারের জন্য স্থিতিপ্রদতো নয়ই, দেশ ও জনগণের জন্যও স্বস্তিপ্রদ নয়। সাবেক আমলে অর্থাৎ মইন-ফখরুদ্দীনের অবৈধ সময়ে এমনি করে সিএসবি নামের টিভি স্টেশনটি বন্ধ করে দিয়েছিল তারা। সেই ধারাবাহিকতাই যেন এখন প্রবাহমান দেশে। এই যদি হয় অবস্থা তাহলে আমাদের উত্তরণটা ঘটলো কোথায়! মুখে গণতন্ত্র আর আচরণে স্বৈরতন্ত্র কেবল শাসক কেন, দেশের জন্যও বয়ে আনে অমঙ্গল। চারপাশে যখন এমন দৃশ্য অবলোকন করি তখন বাকরুদ্ধ হয়ে আসে। থেমে থাকে কলম। লেখার ইচ্ছাতেই কিসের যেন কামড় অনুভূত হয়, বেদনা অনুভব করি। তাই লেখার বিষয় বিবেচনায় বিভ্রাটে পড়তে হয়।

দেশের বিদ্যাপীঠগুলোতে যখন দেখি জ্ঞানসন্ধানীদের বিপরীতে 'বন্যবরাহের' বিচরণ অবাধ, তখন কষ্টের অন্ত থাকে না। যে হাতে থাকবে বই, খাতা আর কলম সে হাত শোভিত এখন নানা নামের অস্ত্রে। একজন আর একজনের ছিঁড়ে নিচ্ছে কলিজা-হাড়-মাংস। সবই হচ্ছে রাজনীতির নামে। যখন খবর আসে এসব অনাচারের সাথে কতিপয় শিক্ষকেরও সায় আছে, তখন আর কলম ধরতে ইচ্ছে হয় না, রাগে-ঘৃণায়। ভয়তো আছেই। রাজনৈতিক নেতাদের আশ্রয়-প্রশ্রয়ে নাকি এমন 'বরাহনৃত্য' দেশের সবগুলো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে। প্রচার-প্রপাগান্ডা এমনটাই। এমন প্রচার দীর্ঘ সময় থেকেই। কথায় আছে 'যা রটে কিছু না কিছু বটে।' এসবের বিপক্ষে প্রবল কোন প্রতিরোধ নেই। প্রতিবাদের কণ্ঠও ক্ষীণ। এমন চললে তো শিক্ষার ঘরেও আগুন জ্বলতে থাকবে। যে জন্য গত চল্লিশবছরেও তেমন কোন অর্জন লক্ষ্যযোগ্য নয় এই এলাকায়। খুন-খারাবি আর অসভ্যতা ছাড়া। প্রায় প্রতিদিনই একটা না একটা বন্ধ হচ্ছে শিক্ষালয় হুটহাট। কৃষকের সন্তানকে আবার কৃষিতে ফিরিয়ে দেবার প্রক্রিয়া কিনা এটি কে জানে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রাক্কালে কলকাতার বাবুরা বলেছিলেন, বাংলাদেশে তো এগ্রিকালচারই আছে সেখানে আবার কালচারের কী প্রয়োজন। কলেজ-ভার্সিটির সাম্প্রতিক আলামত দেখে মনে হচ্ছে কারা যেন এগ্রিকালচারের পাঠ

www.pathagar.com

শিখাচ্ছে আমাদের। লিখতে গেলে তো বিষয় হিসেবে এসবই চলে আসে। তাই লেখালেখিতে মন সায় দেয় না। সত্য ভাষণে দুশমন বাড়ে।

যে 'বিডিআর-এর নাম শুনলেই শত্রুর হৃদকম্পন শুরু হয়ে যেত সেই বিডিআর-এর শিরদাড়া ভেঙ্গে দেয়া হলো আচমকা। নিধন করা হলো সেনাবাহিনীর চৌকস সব সেনাঅফিসার। বিডিআর 'বিদ্রোহ'-এর নেপথ্যনায়ক কারা এ তথ্য চাপাই পড়ে থাকলো। বিচারের নামে প্রহসনের প্রহেলিকা চলল। এখন আবার হঠাৎ তাও বন্ধ। সেনাসদস্যদের মনে যদি শান্তি আতঙ্ক ছড়িয়ে দেয়া যায় তখন তো এরা সীমান্ত রক্ষার পরিবর্তে নিজেকে রক্ষায়ই বেশি ব্যস্ত থাকবে। বিডিআর-এর অভ্যন্তরে এমনি একটা অজানা আতঙ্কের প্রাসাদ তৈরি করে ফেলেছে আমাদের যারা চিরদুশমন, তারা। বিভীষণদের আশ্রয়-প্রশ্রয় এবং সহযোগিতাই-এমন কাণ্ড ঘটার ইতিহাস অনেক। বিডিআর-সেনা নিধনের প্রক্রিয়াটি এ দেশীয় বিভীষণদেরই কূটচালের কর্ম! বিভীষণদের আখের মঙ্গলজনক নয়। মীরজাফরদের অন্তিম সময়গুলোর কাহিনী কি অজানা কারো। সীমান্তে বিএসএফ বাংলাদেশীদের ওপর 'চানমারি' করে প্রায় প্রতিদিন, লাশ হয় জনাকয়েক বাংলাদেশী। বিপরীতে আমাদের কর্তৃপক্ষ নির্বিকার। প্রতিবাদ করলেও কণ্ঠ এতটাই ক্ষীণ যে, সে আওয়াজ বাতাসেই মিলিয়ে যায়। বর্তমানে এমন অবস্থায় এসে ঠেকেছে 'ভাসুরের নাম মুখে আনতেই যেন বারণ।' অন্যদিকে বন্ধুত্বের উষ্ণতায় শার্ট-প্যান্ট-গেঞ্জি সবই অর্পণ করছি বন্ধুর করকমলে। কেবল আন্ডারওয়ারটা দিতে পারছি না লজ্জায়-শরমে। একদিন হয়তো তাও অর্পণে দ্বিধা করব না। চারপাশে যা আলামত এসে জমা হচ্ছে, তাতে তো এর বাইরের কিছু ভাবা যাচ্ছে না। তাই মনঃপীড়ায়, হতাশায় আর অপমানে লেখালেখির পাঠ চুকিয়ে ফেলার কথাই ভাবছি। বলতে গেলে তো বিষয় হিসেবে এদের নিয়েই টানাটানি করতে হবে। যেখানে মানিলোকের মান রাখতে আমরা ব্যর্থ, মিথ্যা এবং অসভ্য মামলায় জড়িয়ে দৈনিক 'আমার দেশ' সম্পাদক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব মাহমুদুর রহমানকে রিমান্ডের নামে শারীরিক নির্যাতন করা হয়। এমন অন্যায়ের বিপক্ষে শক্ত কোনো প্রতিবাদ-প্রতিরোধ ওঠে না, তাও ভয়ে আতঙ্কে। তখন লেখার ইচ্ছাটাই উবে যায়। নীমতলীতে আগুন লাগে, বেগুনবাড়ীতে দালান ভেঙে মাথায় পড়ে-এসব কিসের আলামত তা দেশবাসী উপলব্ধি করতে পারে না। এই না পারার কারণেই সবার কপালেই এখন আগুন। অন্যায়-অবিচারের দালান ভেঙে পড়ছে মাথায়। লিখতে গেলে তো আগুনের কথায় আসতে হবে, দালান ভাঙার খবর দিতে হবে। লিখলে কি অন্যায়ের আগুন থামবে? না, হেলেপড়া, অবিচারের দালানটি সোজা করা যাবে। যদি তা করা সম্ভব না হয় তবে লেখে কী লাভ!

১১. ৬. ১০

www.pathagar.com

অতিথিপাখি

'অতিথি' পাখি আসে, 'অতিথি' পাখি যায়। যাবার আগে বাংলাদেশের ধান, গম, ফল-ফসল, সাথে মৎস্যকুল সাবাড় করে মহা আনন্দে। ভ্রমণ শেষ করে উড়াল দেয় অন্যদেশে। তখন তারা দেহে-মনে হৃষ্ট-পুষ্টতো বটেই। এসব পাখি এদেশের খাল-বিল, নদী দাপিয়ে বেড়ায় নিরুপদ্রব, ভাবনাহীন। পাখি তো পাখিই, আমাদের মুরগি যেমন পাখি, হাঁসও পাখি প্রজাতির মধ্যেই পড়ে। এক সময় নানা প্রজাতির পাখির উপস্থিতি লক্ষ্য করা যেত গ্রামে-গঞ্জে, খাল-বিল, নদী-নালায়। সেকালের অনেক পাখি এখন আর নজরে আসে না। উজাড় হচ্ছে দিন দিন। আগেতো শকুনের মেলা বসতো গ্রামের বড় বৃক্ষগুলোতে। এখন কালে-ভদ্রে চোখে পড়ে। বন-জঙ্গল নিঃশেষ হচ্ছে, নদী যাচ্ছে শুকিয়ে, খাল-বিলে উঠছে বসতি-এভাবেই ধ্বংস হচ্ছে পাখির আবাস। পরিবেশের অভাবে ভিনদেশে উড়ে যাচ্ছে কি না আমাদের দেশের পাখিরা কে জানে! পাখিবিশারদরা তা বলতে পারবেন হয়তো। পাখিপ্রেমীরা জানলেও জানতে পারেন।

পাখির আবার দেশ-বিদেশ কি। তাদের তো আর সীমান্ত মেনে উড়তে হয় না। পাখিদেরও আলাদা আলাদা আবাসভূমি থাকলে না হয় ভিন্ন কথা। পাখি গ্রীষ্মে যদি বসতি গড়ে এদেশে দেখা গেল শীতে উড়াল দিল অন্য এলাকায়। দু'একটি ব্যতিক্রম ধর্তব্যের মধ্যে আনা কতটা সমীচীন তা ভাববার বিষয়। যখন যে দেশে বসবাস করে তখন সেটিই তার দেশ-বাড়ি। তাই বিদেশীর তকমাটা আর রাখা যায় না। ফি বছরই আমরা এদেরকে দেখছি, একটা বিশেষ সময়ে। হোক বিশেষ সময়, দেখছি তো এদের। আমাদের গাছে, খালে-বিলে এমনকি নদীতে, ফসলের মাঠেও এসব পাখির যন্ত্রণা অনুভব করে কৃষক প্রতি বছর। পুকুর-বিলের মাছ সাবাড় করে নদীর রুই-মৃগেলে ঠোকর বসাতেও কসুর করে না এসব পক্ষীসমাজ। শীত নামছে পাখিরাও আসলো বলে। ঝাঁকে ঝাঁকে ওরা আসবে, নানা বর্ণের নানা প্রজাতির। আমরা এদেরকে দেখে তৃষিত নয়নকে শীতল করবো। প্রফুল্ল করবো হৃদয়-মন। পাখির সৌন্দর্যে কে মুগ্ধ না হয়। এই মুগ্ধতা থেকেই ভালোবাসার জন্ম। তাই পাখির প্রতিও ভালোবাসার বিস্তার ঘটে। অনেকে পাখি পোষে, একটি পাখির প্রতি ভালোবাসারই উদাহরণ।

অতিথি কাকে বলে। প্রতি বছর আনাগোনা করলে তো আর অতিথি থাকা যায় না। তিনদিনের অধিক সময় অবস্থান করলে তিনি অতিথির তালিকা থেকে খারিজ হয়ে যান-এমনি একটা গুঞ্জন আমাদের সমাজে নাকি আছে। পাখিরা তো আরো অধিক

www.pathagar.com

সময় অবস্থান করে। বিচরণ করে নানা এলাকা। দু'-তিন মাসতো থাকেই, তারও বেশি সময় ধরে কোনো কোনো পাখি আহারে-বিহারে মনোযোগী হয়। কেউ কেউ থেকেও যায়। পাখিবিশারদরা বলে থাকেন এ বছর যে পাখির ঝাঁক যে স্থানটিতে নামলো আগামী বছর সে ঝাঁকটি নাকি ঠিক পূর্বের স্থানটিতেই এসে ভিড় করে। তাহলে এরা আর অতিথি থাকলো কি করে? তারা তো তাদের আবাসভূমি চিহ্নিত করেই নিয়েছে। অনেক ধনাঢ্য ব্যক্তি বা রাজা-বাদশা পৃথিবীর নানা দেশে বাড়িঘর করেছেন। এদেশেরও অনেক মন্ত্রী-উপমন্ত্রীর যেমন আছে। মাঝে মধ্যেই তারা তাদের সেসব ঘরবাড়িতে আরাম-আয়েশের জন্য যান। সেখানে তো তারা কেবল বেড়াতে যান না, তত্ত্ব-তালাশ করতেও যান ধন-সম্পত্তির। নিজের বাড়িতে যাবেন সেখানে আবার অতিথি কি। তাই পাখিরাও আসে, তাদের নিজেরই আবাসভূমিতে। জায়গা যখন চিহ্নিতই থাকে তখন আবার অতিথির সাইনবোর্ড কেন?

অতিথি পাখি নিয়ে খুব হৈ চৈ হয় আমাদের দেশে। অতি উৎসাহী মানুষ এরা, এদেরকে পাখিপ্রেমী বলে। তারা এ মৌসুমে সরব হন, পাখি বন্দনায় মত্ত হন। পাখি প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেন নানা জায়গায়। যেমন চিড়িয়াখানার ঝিল, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ঝিল প্রভৃতি এলাকায়। হ্যাঁ, খুব ভালো একটি আয়োজন। এমন আয়োজন এবারও হবে বিলক্ষণ। সেমিনার সিম্পোজিয়ামও অনুষ্ঠিত হয়ে যেতে পারে পাখিপ্রেমীদের উদ্যোগে। এর সবটাই ভালো। এ জন্য পাখিপ্রেমীদের প্রতি আন্তরিক শুভেচ্ছা-অভিনন্দন। কিন্তু অতিথি শব্দটি নিয়ে আপত্তি আছে বরাবরের মতো। তাছাড়া অতিথির সংজ্ঞায়ও এরা আসে না। তারপরও উচ্চকণ্ঠে চিৎকার, ধরা যাবে না, ছোঁয়া যাবে না, খাওয়া তো যাবেই না। এদের চিৎকারে মনে হয় এগুলো নিষিদ্ধ তালিকার পাখি। আল্লাহ্ আমাদের জন্য হারামের তালিকায় রেখেছেন এদেরকে। একশ্রেণীর পত্র-পত্রিকায় দেখি কানাবগির ছবি ছাপিয়ে ক্যাপশন লেখা হয় বিদেশী পাখি নিধন হচ্ছে নির্বিচারে। হায় প্রেম! বিদেশী পাখিপ্রেমে এতটাই অজ্ঞান কানাবগিকেও আলবাস্টার ঠাউড়াই।

তথাকথিত অতিথি পাখি ভক্ষণে অসুবিধাটা কোথায়! এদের সুস্বাদু গোশ্তে আমরা রসনা তৃপ্ত করবনা কেন? বালিহাঁসের আস্ত মোসাল্লামতো অমৃত সম। পানকৌড়ির গোশত দেখতে কালো হলেও স্বাদে মন্দ নয়। হালাল পাখি তো মানুষের জন্যেই। এখানে অতিথি-অনতিথির বিভাজন কেন? সব পাখিই আমরা খাব। খাব অর্থ এই নয় যে, খাবার মহা জেয়াফত শুরু করব। পাখি তো প্রতিবেলার ভোজনে থাকে না, থাকে কালেভদ্রে। শীতের পাখিও শীতেই ভোজ্য, শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান। এই উপাদান থেকে আমরা বঞ্চিত হব কেন?

দেশীয় পাখিতে কোন অনীহা নেই, নিষেধাজ্ঞা নেই, যত নিষেধের দেয়াল তথাকথিত অতিথি পাখিতে। এমন নিষেধ অবিবেচনাপ্রসূত এবং হঠকারিমূলক। আমরা হাঁস-মুরগি নিধন করব নির্বিচারে, সেখানে কোন প্রেম নেই, দুঃখবোধ নেই! এ জাতিয় একচোখা প্রেমে দাপট থাকে, দায়িত্ব থাকে না। তাই আমাদের দায়িত্ববান হতে হবে। ভারসাম্য রক্ষার জন্য দেশ আর বিদেশ নয় সব ধরনের পাখিকেই

www.pathagar.com

আমাদের খাদ্যতালিকায় রাখতে হবে। কবুতর যেমন পাখি বালিহাঁস, চীনাহাঁসও পাখি। এখানে বিভাজনের কোন অবকাশ নেই। মনে হয় অতিথি পাখির প্রেমে আমরাই বড় বেশি উতলা। কই বিলাত আমেরিকায় তো তেমন কোন 'পাখিকান্না' শোনা যায় না। সে সব দেশে শীতের পাখি শিকারের জন্য ক্লাব আছে। মাসের বিশেষ সময়ে শিকারীরা পাখি শিকারে বেড়িয়ে পড়েন। নানাজাতির পাখি শিকার করে পরিবারের সবাইকে নিয়ে পাখির গোশত দিয়ে রসনা তৃপ্ত করেন। পাখি শিকারের ক্লাবগুলোর তরফ থেকে রীতিমত পত্রপত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে মওসুমী পাখি শিকারীদের প্রলুব্ধ করা হয়। সেখানে আছে বিদেশী পাখি শিকারের গাইড। (মাইগ্রেটরি বার্ড হান্টিং গাইড, ব্যুরো অব নেচারাল রিসোর্সেস ওয়াইল্ড লাইফ ডিভিশন)। কথিত অতিথি পাখিরা আমাদের আহার-বিহারে পুষ্ট হবে আর এদের উপর আমাদের কোন অধিকার ঘাটতে গেলে এটি অন্যায় এবং অযৌক্তিক।

পাখি ধরব আর খাব এমন নয়। তবে বিশেষ সময়ে পাখি শিকার অবশ্যই নিয়মরীতির মধ্যে আনা যায়। উন্নত দেশগুলোতে এই প্রথাই চালু আছে। আমাদের তথাকথিত পাখিপ্রেমীরা অন্ধ হলে তো আর প্রলয় বন্ধ হবে না। নির্বিচারে পাখি নিধনে আইন থাকতে পারে। কিন্তু বিশেষ বিশেষ সময়ে পাখি শিকার নিষিদ্ধ রাখা অবিবেচনা প্রসূত অন্যায় এবং অশোভন। বাংলাদেশেও মওসুমী পাখি শিকারে ক্লাব গড়ে তোলা যায়। এসব ক্লাবের অবশ্যই সরকারি নিয়ন্ত্রণ থাকবে। এতে করে কথিত অতিথি পাখি শিকারও নিয়ন্ত্রিত হবে। আর এদেশের মানুষ আড়ালে আবডালে নয়, প্রকাশ্যেই পুষ্টিগুণ সম্পন্ন পাখি ভক্ষণে তৃপ্ত হবে। কারণ, এরা আমাদের অতিথি নয় স্বজন-স্বদেশী। বড়জোর বলা যায়, মওসুমী পাখি। তাই মওসুমী পাখি শিকার কখনো আইনবিরোধী হতে পারে না। পাখি প্রেম অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু পাখির গোশত ভোজনে অনীহা অবশ্যই অস্বাভাবিকের তালিকায় চলে আসে। যদি তা হালালের মধ্যে পড়ে।

১৩.১১.২০০৯

www.pathagar.com

বালক বয়সের 'বাল্যশিক্ষা'

'বাল্যশিক্ষা' আর 'আদর্শলিপি' এ দুটি বই দিয়েই শুরু হত শিশুদের প্রথম পাঠ। একেবারেই গরীবী হালত ছিল এই পুস্তক দুটির, নিউজপ্রিন্টে নিম্নমানের ছাপা। এরপরও খুবই প্রিয় ছিল শিশুদের কাছে পুস্তকগুলো। বিশেষ করে বাল্যশিক্ষা নামের ছোট্ট বইটি। লালরঙের প্রচ্ছদ, আনারি হাতের আঁকা দুটি শিশু শ্লেটখাতা নিয়ে স্কুলে যাচ্ছে, তাও তুলট কাগজে। বলতে দ্বিধা নাই বর্তমানে পঞ্চাশের উপর যাদের বয়স তারা সবাই এ বই দিয়েই জীবনের প্রথম পাঠ শুরু করেছিলেন। সেই বালক বয়সে পঠিত মদনমোহন তর্কালংকারের 'প্রভাত' কবিতাটি এখনো মুখস্ত বলতে পারেন কেউ কেউ। কবিতাটি ছিল এরকম–

পাখিসব করে রব রাতি পোহাইল।
কাননে কুসুম কলি সকলি ফুটিল॥
শীতল বাতাস বয় জুড়ায় শরীর।
পাতায় পাতায় পড়ে নিশির শিশির॥

ফুটিল মালতি ফুল সৌরভ ছুটিল।
পরিমল লোভে অলি আসিয়া জুটিল॥
গগনে উঠিল রবি সোনার বরণ।
আলোক পাইয়া লোক পুলকিত মন॥
রাখাল গরুর পাল লয়ে যায় মাঠে।
শিশুগণ দেয় মন নিজ নিজ পাঠে॥
উঠ শিশু মুখ ধোও পর নিজ বেশ।
আপন পাঠেতে মন করহ নিবেশ।

প্রায় দেড়শ বছর আগের লেখা এ কবিতাটির আবেদন কি ফুরিয়ে গেছে? দেড়শ কেন দেড় হাজার বছর পরও এ কবিতার আবেদন ফুরাবে বলে তো মনে হয় না।

বাংলাদেশের প্রভাতের চিরন্তন দৃশ্য অংকন করেই কবি তার বক্তব্যের ইতি টানেননি। রাখালকে যেমন কাজের উদ্দেশ্যে মাঠে পাঠিয়েছেন। ঠিক তেমনি শিশুদেরকে মুখ হাত পরিষ্কার করে পাঠে মনোনিবেশের তাগিদ করেছেন। এ তাগিদ একজন সু-অভিভাবক সুলভ আচরণতো বটেই। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে

www.pathagar.com

মানুষের মন মানসিকতারও পরিবর্তন ঘটেছে। তাই কবি সাহিত্যিককেও যুগকে অনুসরণ করতে হয়, কথা বলার কৌশল পালটাতে হয়। আধুনিকতাকে গ্রাহ্য করতে হয়। এই গ্রাহ্যতা তার বক্তব্যে নতুন মাত্রা যোগ করে বৈকি। তবে এমন অনেক কবিতা আছে, সাহিত্যকর্ম আছে উপস্থাপনের ভঙ্গি যাই থাক বিষয় বৈভবে চিরকালের, আধুনিক। এই যেমন মদনমোহন তর্কালংকারের 'প্রভাত' কবিতাটি। কবিতার বক্তব্যে কেবল সময়ের চিত্রই আঁকেননি, এসময়টি যে একজন শিশুর পাঠের উপযুক্ত ক্ষণ সে খবরটি দিতেও তিনি ভুল করেননি। কবির মূল উদ্দেশ্যই হলো নানা কথার ফাঁকে শিশুকে শিক্ষার প্রতি, জ্ঞান সাধনার প্রতি প্রলুব্ধ করা। দিনের শুরুতে সবাই যার যার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। শিশুর কাজ কী। তার কাজ হলো পাঠে মনযোগী হওয়া। কবি এ সত্যটিই স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন প্রতিটি শিশুকে। এখানেই তার কবিতার সার্থকতা। কবি সাহিত্যিকের সুআচরণ সুবিবেচনা সমাজকে প্রভাবিত করে। পাঠককে আলোড়িত করে, আন্দোলিত করে। কারণ একজন বিবেকবান লেখক তার সমাজের, তার জাতির অভিভাবক। এই অভিভাবকত্ব তাকে মহিয়ান করে, গরিয়ান করে। তেমনি একজন গরিয়ান কবির নাম মদনমোহন তর্কালংকার। নদীয়ার অধিবাসী ছিলেন তিনি। গত হয়েছেন ১৮৫৮-তে। পুরানো যুগের শেষ কবি ছিলেন তর্কালংকার। কিন্তু তার প্রভাত কবিতাটি এখনো নবীন।

একটি শিশু তার পরিবারের যেমন ভবিষ্যত, পাশাপাশি শিশুটি তার জাতির ভবিষ্যতের সাথেও যুক্ত। তাই এই ভবিষ্যতকে দীপ্তিময় করে গড়তে হলে প্রথমে প্রয়োজন শিশুর সুশিক্ষা। শিক্ষায় হেরফের ঘটলে সব অন্ধকার। যে জন্যে শিশুর প্রারম্ভিক পাঠ দানটাই আসল। এ সময়ের শিক্ষাটাই শিশুর মনে কামড়ে থাকে। বৃদ্ধ বয়সেও পাঠের সে শিক্ষা পথ দেখায়, আলো ফেলে। যদি তা সুশিক্ষা হয়। বাল্যশিক্ষা না আদর্শলিপিতে শিশুরা পাঠ করতো 'সদা সত্য কথা বলিব। কখনো মিথ্যা বলিব না। মিথ্যা বলা মহাপাপ।' অথবা 'কানাকে কানা বলিও না। খোঁড়াকে খোঁড়া বলিও না। ইহাতে তাহারা মনে দুঃখ পাইবে' ইত্যাদি ইত্যাদি। অনেকে হয়তো বলতে পারেন এখন আধুনিক যুগ, মোবাইল, কম্পিউটারের যুগ, মানুষ দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে এসময় এসব শিক্ষা অচল। কথাটা হয়তো সত্য আবার সম্পূর্ণ সত্যও না। সত্য না কারণ মোবাইল, কম্পিউটারের সুশিক্ষার সাথে সাথে কুশিক্ষার ফর্দটাও কম লম্বা নয়। যানবাহনে উঠলে যে হারে মোবাইলে বিরামহীন মিথ্যা আর অসত্য শুনতে হয় তাতে শিক্ষার মানটা কোথায় গিয়ে ঠেকলো। শিশুরাও কি এই মোবাইল দূষণ থেকে মুক্ত! কম্পিউটার দূষণতো এখন সর্বগ্রাসী। সত্য বলার পাঠটি যদি জীবনের প্রথম ধাপে শিশুদের দেয়ার ব্যবস্থা থাকতো তবে হয়তো মাবাইলে মিথ্যা বলার উপদ্রবটা অনেকেটা সীমিত হয়ে আসতো। পাঠ্য বইয়ের শিক্ষা তাকে কিছুটা হলেও বিবেকে কম্পন ভুলতো।

শিশুপাঠ একটি জটিল বিষয়। অসাবধান হলেই ছন্দপতন। অতীতে পাঠ্যবই রচনা করতেন জ্ঞানী-গুণীরা। শিশু-কিশোরদের যথার্থ মানুষ করে গড়ে তোলার ব্যাপারে তারা থাকতেন সচেতন। পাঠ্যবই রচনা বা সম্পাদনায় একটা ধারাবাহিকতা

www.pathagar.com

রক্ষা করতেন তারা। ইতিহাস-ঐতিহ্য, ধর্মবোধ, নীতি-নৈতিকতা, মনীষীদের জীবন সংক্রান্ত আলোচনা থাকতো সেসব বইপত্রে। কবিতা, গল্প নির্বাচনের বেলায়ও পাঠকের বয়স বিবেচনাকে অগ্রাধিকার দেয়া হতো। বিষয় বিবেচনায়ও থাকতো পাঠকের মানসিক সুস্বাস্থ্য উজ্জীবন। কিন্তু বর্তমানে বিশেষ করে শিশু পাঠকদের বইপত্র যারা রচনা বা সম্পাদনার দায়িত্বে থাকেন তাদের অধিকাংশই থাকেন অসচেতন, দায়িত্বহীন। এসব বই পাঠ করে শিশুরা দেশপ্রেমে জাগ্রত হয় না। নীতি-নৈতিকতা সম্পর্কে থাকে অন্ধকারে। গুরুজনকে মান্য করার দিক-নির্দেশনা থাকে না এসব পাঠ্য বইয়ে। যে কারণে শিশুরা আদব-কায়দার ব্যাপারে থাকে বেখেয়াল। পরবর্তী জীবনে বিষয়টি আরো বিস্তৃতি পায় সবার অজান্তে। মোটকথা এখন শিশু পাঠে অনুপযোগী এসব বইপত্রে থাকে উদ্দেশ্যহীন আবোল-তাবোল সংলাপে ভরপুর। যে জন্যে আমাদের সন্তানরা বড় হচ্ছে লক্ষ্যহীন, দেশপ্রেমবর্জিত, ধর্মবোধে অসচেতন পাঠের মধ্য দিয়ে। কদিন আগে সহযোগী 'আমার দেশ'-এ এমন একটি প্রতিবেদন প্রকাশ পেয়েছিল ভুলে ভরপুর কতগুলো শিশুপাঠ্য ছড়ার বই সংক্রান্ত। এ ছড়ার বইগুলোতে ছন্দে যেমন ভুল থাকছে বাক্য গঠনেও ভুলের অন্ত নেই। এইসব অগ্রহণযোগ্য, পাঠের অনুপযোগী বইপত্রই আমাদের কোমলমতি শিশুদের পাঠ্য তালিকায়। এ ব্যাপারে খবরদারির অভাব বিষয়টিকে আরো তরলিত করেছে। এক শ্রেণীর অসৎ প্রকাশক এজন্যে শতভাগ দায়ী না হলেও বেশির ভাগ অপরাধে তারা অপরাধী। কিন্ডার গার্টেন স্কুল কর্তৃপক্ষও এদের সহযোগী। পাঠ্য তালিকায় থাকবে সেসব বইপত্র যা একজন শিশু-কিশোরকে যথার্থ মানুষ করে গড়ে তুলতে সহায়ক ভূমিকায় উঠে আসে। কিন্তু প্রশ্ন হলো পাঠ্যবই সে ভূমিকায় কতটা অগ্রসর! বিশেষ করে প্রাইমারি শ্রেণীগুলোতে।

আদর্শলিপি অথবা বাল্যশিক্ষার সাথে যারা একসময় পরিচিত হয়েছিলেন তারা হয়তো এই কবিতাগুলোও তাদের পাঠ্য তালিকায় যুক্ত করে থাকবেন। যেমন–

সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি
আমি যেন সারা দিন ভাল হয়ে চলি
আদেশ করেন যাহা মোর গুরুজনে
আমি যেন সেই কাজ করি ভাল মনে।
অথবা–
পারিবনা একথাটি বলিওনা আর
একবার না পারিলে দেখ শত বার।

এমনি আরো অনেক উপদেশমূলক কবিতা পাঠ্য তালিকাভুক্ত ছিল। আধুনিকতার নাম করে শিল্পের অজুহাতে এই কাব্যভাবনাগুলোকে পাঠ্যের অযোগ্য বলে ঘোষণা করছে কোন কোন পণ্ডিত। তথাকথিত আধুনিককালের পাঠ্য বইয়ে তাই সেই উজ্জ্বল কবিতাগুলো থাকছে অনুপস্থিত। তার বদলে আমাদের সন্তানরা শিখছে 'আগডুম বাগডুম, হাট্টিমাটিম টিম, গাধার কান ধরে টানাটানি' অথবা মাথা গরম সবদার ডাক্তারের মত পাগল ডাক্তারের সাথে কেঁচো খাওয়া। এসব কবিতায় শিক্ষার কি

www.pathagar.com

থাকছে? যা একটি শিশুর বা কিশোরের জীবনকে আলোকিত করবে? শিশুসাহিত্য সৃষ্টি হচ্ছে না এমন নয়। তবে ইদানিংকালের শিশুসাহিত্য অনেকটাই বিবর্ণ। শিশুর মানসিক গঠনে সহযোগিতা করতে পারে এমন গল্প কবিতার সন্ধান মিলে কালে-ভদ্রে। এই কালে-ভদ্রের রচনাও অধিকাংশ সময় অতি আধুনিকতার পেষণে পিষ্ট হয়ে চিরাচেপটা হয় প্রায়সই। বলতে দ্বিধা নেই বর্তমানের শিশু সাহিত্যে ইচড়ে পাকামো ভাবখানা পুষ্টভাবেই নজরে আসে। যা পাঠে শিশু-কিশোররা বেপথু হয় বে আব্রু হয়, সভ্যতা-ভব্যতায়। ইংরাজিতে একটা প্রবাদ আছে 'ওল্ড ইজ গোল্ড।' আমাদের সন্তানদের সুনাগরিক হিসাবে গড়ে তুলতে হলে, সুমানুষ তৈরির প্রয়োজনে ওল্ডের কাছে ফিরে যেতে দোষটা কোথায়, বিশেষ করে প্রাইমারি শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকে।

৪. ১২. ০৯

www.pathagar.com

রাষ্ট্র ও ধর্ম

সীমাহীন অজ্ঞতা আর প্রচণ্ড বিদ্বেষপ্রসূতমগজ একজন সুস্থ মানুষকেও ভারসাম্যহীন করে তুলে বৈকি! অজ্ঞতা এবং বিদ্বেষের সাথে যদি 'মতলব' শব্দটি যুক্ত হয় তখন তার আচরণে প্রগলভতা আর প্রলাপের আধিক্যই দৃষ্টিগ্রাহ্য হয়ে উঠে। কদিন আগে যুগান্তরে প্রকাশিত সোহরাব হাসানের 'রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে আলাদা করতে হবে'–(২৪-১২-২০৫) শিরোনামের লেখাটি পাঠ করে সে রকমই মনে হলো। লেখক তার চিন্তা-চেতনাকে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে বারবার ধর্ণা দিয়েছেন মার্কিন পণ্ডিতদের ধ্যান-ধারণার কাছে। বলাবাহুল্য, ইসলাম এবং মুসলিম সম্পর্কে মার্কিনীদের উচ্চারণ বারবারই অসংলগ্ন এবং অসত্য। ইরাকে হামলার পর বিষয়টি আরো উজ্জ্বলতর হয়েছে বিশ্বের কাছে। বিবেকবান মানুষজনদের দৃষ্টিতে সেই মার্কিনীরা যদি হয় ইসলামের ভাল-মন্দের দলিল অথবা রাষ্ট্র ব্যবস্থার সাথে ধর্মের সম্পৃক্ততা থাকা উচিত কি অনুচিতের ফতোয়া, তখন বুঝতেই হবে 'ডালমে কুচ কালাহে'। সমাজতন্ত্রের ভরাডুবির পর সমাজতন্ত্রীরা এখন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে প্রভু হিসাবে গ্রহণ করতে লজ্জাবোধ করছে না মোটেও। অবশ্য ইসলাম বিদ্বেষের ব্যাপারে সমাজতন্ত্র এবং পুঁজিবাদের ফারাকটা খুবই সার্মান্য। তাই কোনো সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে আলগা করার জিগির তুলতে গিয়ে এ ব্যাপারে পুঁজিবাদের দোসরদের সাহায্য ও কৌশল কামনায় দ্বিধা করে না। উল্লেখ্য, ধর্ম বলতে ইসলাম ধর্মের প্রতিই অঙ্গুলি নির্দেশ করে থাকেন তারা। কারন ইসলামই একমাত্র ধর্ম যা ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক কর্মকাণ্ডে সমান পারঙ্গম। জীবনের প্রতিটি স্তরেই যাকে উপস্থাপন করা যায় নির্ভাবনায়। রাষ্ট্র তো জীবন-ভাবনারই একটি স্তর। জীবনকে সততা এবং শোভনতার সাথে প্রসারিত একটি বিস্তৃত অঙ্গন। ধর্মকে যদি পবিত্র বলেই বিশ্বাস করা হয় তাহলে রাষ্ট্রে কি পবিত্রতার প্রয়োজন নেই?

নিবন্ধকার তার নাতিদীর্ঘ লেখার উপসংহার টানছেন এভাবে 'ধর্ম নেতারা যাতে ইহকাল নিয়ে কোনো কথা না বলেন সেটাই হবে সবচেয়ে বড় ধর্মের কাজ। ধর্ম ধর্মের জায়গায় থাক, রাষ্ট্র রাষ্ট্রের জায়গায়। ধর্ম ব্যক্তিগত বিশ্বাসের ব্যাপার। রাষ্ট্র ও রাজনীতি হল বিতর্কের বিষয়, ভোটাভুটির বিষয়। রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে সম্পূর্ণ আলাদা করতে হবে। বাংলাদেশের মূল সংবিধানেও সে কথা বলা হয়েছিল। প্রতিটি নাগরিক তাঁর পছন্দসই ধর্ম পালন করবে, রাষট্র কাউকে কোনো ধর্মীয় বিধান পালন করতে বাধ্য করবে না। রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে আলাদা করার মাধ্যমেই জঙ্গীবাদকে চিরতরে উচ্ছেদ করা যাবে। অন্য কোনো পন্থায় নয়।'

www.pathagar.com

ধর্মীয় নেতারা ইহলোকে বাস করবেন, জীবন সংসার পালন করবেন কিন্তু ইহকালের কর্মকাণ্ড নিয়ে ভাবতে পারবেন না এ কেমন ফতোয়া। ইসলাম সুবিন্যস্ত জীবন ব্যবস্থার নাম। তাই এখানে রাষ্ট্রব্যবস্থা বাদ যাবার সুযোগ নেই। ভোট-বিতর্ক-রাজনীতি থাকলে অসুবিধা কোথায়? হ্যাঁ! অসুবিধা একটা আছে, তা হল ভোট চুরির সুযোগ নাই। অসততা এবং দেশবাসীকে মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে গদি দখলের সুযোগও সেখানে অসম্ভব। তর্ক-বিতর্কের ব্যাপারটিও ভব্যতার সীমাকে অতিক্রম করে না। ধর্মীয় অনুশাসনকে মান্য করেই রাষ্ট্রীয় অবকাঠামো গড়ে ওঠে। তাই সে রাষ্ট্রে দুর্নীতি-অনাচার প্রশ্রয় পায় না বা পেতে পারে না। রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে আলাদা করার জিগিরে নেপথ্য কারণটি (ভয়) কি এখানেই।

পৃথিবীর প্রথম ধর্মসংযুক্ত রাষ্ট্র তথা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মদীনায়। যার শাসক ছিলেন রসূল (সাঃ)। সে রাষ্ট্রে কি সংখ্যালঘুরা নির্বিঘ্নে তাদের ধর্মকর্ম পালন করেনি? খলিফাদের আমলেও ভিন্ন ধর্মীদের উপর কোনো রাষ্ট্রীয় বিধি-নিষেধ আরোপিত হয়নি। এটাই ইসলামের বিধান। ধর্মের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তির অবকাশ নেই ইসলামে। জানা শোনার স্বল্পতার কারণেও এমন বিশ্বাস জন্ম নেয় কোনো কোনো সময়। ধর্মকে যতই ব্যক্তিগত ভাবা হোক, ব্যক্তির আচরণই তো সমাজ বা রাষ্ট্রে ব্যাপ্ত হয়, প্রতিফলিত হয়। একজন ধার্মিক ব্যক্তির আচরণে সততা এবং নম্রতার প্রতিফলন ঘটাই স্বাভাবিক। কারণ ধর্ম নীতি-নৈতিকতা এবং সততা শিক্ষা দেয়। তাই রাষ্ট্রের কর্মকাণ্ডের সাথে ধর্মের তথা ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের সংযুক্তি ঘটলে আতংকিত হবার তেমন কি কারণ থাকতে পারে? বরং স্বস্তিদায়ক বলেই বিবেচ্য। রাষ্ট্রের সুস্থতা এবং সততার জন্য ধর্মকে আলাদা নয় সংযুক্তিটাই অতি জরুরী। অতীত ইতিহাস যেমন এ প্রয়োজনীয়তাকে সামনে তুলে আনে, আধুনিক যুগেও বিশেষ করে বাংলাদেশের রাষ্ট্র ব্যবস্থায়ও ধর্ম একটি বড় ফ্যাক্টর।

খৃস্টান জগতেও রাষ্ট্রপ্রধান বিচারপতিগণ শপথ নেন তাদের ধর্মগ্রন্থ অর্থাৎ বাইবেল স্পর্শ করে। ডলার-পাউন্ডে উৎকলিত হয় স্রষ্টার প্রতি আস্থা-জয়সূচক বাক্য। ধর্মের সাথে তাদের ব্যক্তি জীবনকে (দু-একজন ধার্মিক লোক বাদে) নিষ্ঠার সাথে সংযুক্ত না করলেও রাষ্ট্রীয় অনেক ব্যাপারেই ধর্মের প্রভাব দৃষ্টি এড়ায় না। 'ধর্মনিরপেক্ষ' ভারতের দিকে তাকালেও তো দেখা যায় ধর্মেরই জয় জয়কার। তাদের প্রতিটি কর্মেই (ধর্মীয় বিশ্বাস) মূর্তি অনিবার্য। ভারতীয় টিভি চ্যানেলগুলো নিজস্ব ধর্মকে আশ্রয় করেই কর্ম দিবসের কপাট খুলে। অনুষ্ঠানের সূচনা হয় 'নমস্কার' এর মাধ্যমে আর সমাপ্তিও টানা হয় 'নমস্কার' উচ্চারণে। স্বাভাবিক আচরণ এরকমই হয়। আমাদের এখানকার কতিপয় অতিবিদ্বান (আসলে অজ্ঞ) সালাম-কালামের পরিবর্তে 'শুভ সকাল' আর 'শুভ রাত্রি' বলে নিজেদেরকে ধর্মনিরপেক্ষ হিসেবে জাহির করতে চান। মূলত এটি যে খৃস্টানদের গুড মর্নিং আর গুড নাইটের বঙ্গানুবাদ এ খবরটি তাদের, কে দেবে। মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন হয়ে পড়লে আচরণে এমন তালগোল পাকানো ভাবটা উঠে আসতে বাধ্য।

www.pathagar.com

আফগানিস্তানে তালেবানরা কি বলল বা করল এ জন্য তো ধর্ম তথা ইসলামকে দায়ী করা এক ধরনের আহমকি। দেখতে হবে তালেবানদের কর্মকাণ্ড ইসলামের মূল অনুশাসনের সাথে সম্পৃক্ত কি-না। 'ইসলামে নারীদের লেখাপড়া বা কাজ-কর্ম হারাম' এমন 'ফতওয়া' অসত্য এবং অবিবেচনাপ্রসূত। বরং ইসলামে বিদ্যাশিক্ষা প্রত্যেক নর-নারীর জন্য বাধ্যতামূলক বলে ঘোষিত হয়েছে। এখানে নারী-পুরুষে কোনো সীমারেখা টানা হয়নি। আর কুরআনের প্রথম শব্দটিই হলো 'পড়' উচ্চারণে। পড়ালেখার আদেশ দিয়ে যে ধর্মের আরম্ভ সেখানে কেউ যদি একে হারাম বলে এবং এই কথায় যারা বিশ্বাস স্থাপন করে তারা উভয়েই অকাট মূর্খ, সাথে সাথে ইসলামের শত্রু বলেই বিবেচ্য। সোহরাব হাসান লিখেছেন কে নাকি বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'জন মহিলা শিক্ষিকাকে ইসলামী পোশাক পরর জন্য আলটিম্যাটাম দিয়েছে। এমন ঘটনা আদৌ ঘটেছে কি না আমাদের জানা নেই। আদতে ইসলামে পোশাকের নির্দিষ্ট কোনো মডেল নেই, কি নারী কি পুরুষের। এখানে মূল বিষয়টি হলো শালীনতা। শালীনভাবে পোশাক পরিধানটাই ধর্মে-ইসলামী বিধানের অন্তর্ভুক্ত। অবশ্য যারা নারীকে অশালীনভাবে দেখতে আগ্রহী তারা ইসলামী বিধানকে 'তালেবানী' আখ্যা দিতে কসুর করে না। প্রকৃতগত কারণেই নারী-পুরুষের কর্মক্ষেত্র আলাদা। যদিও অধিকারের ব্যাপারে নারী ও পুরুষে ইসলাম কোনো প্রকার দুচোখা নীতিতে বিশ্বাসী নয়, কুআন-হাদীসে এ রকম ঘোষণা রয়েছে বহুবার, বিভিন্ন বাক্যে। কেবলমাত্র ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে কেউ কেউ বিভ্রান্ত হন। যেমন সোহরাব হাসান লিখেছেন 'কোনো ধর্ম বা বিধান শুধু পুরুষের জন্য হতে পারে না, হবে নারী-পুরুষ উভয়ে জন্য।' জেনে রাখা দরকার ইসলামে বিধি-বিধান তামাম মানুষের জন্য। এখানে নারী-পুরুষে ফারাক করা হয়নি। ব্যবধনের ব্যাপারটি আবিষ্কৃত হলো কোত্থেকে? কুরআন বলছে, 'হে মানবগণ! তোমাদের স্রষ্টা-প্রভুর বিষয়ে (তাঁর প্রতি তোমাদের কর্তব্যের ব্যাপারে)। সতর্ক থেকো। যিনি একক অস্তিত্ব থেকে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের সবাইকে। একই সত্তা থেকে সৃষ্টি করেছেন তার সহচরকে এবং এই দুই থেকে বিস্তৃত করেছেন অসংখ্য পুরুষ আর নারীকে। (৪:১)

হাদীসে বিবৃত হয়েছ এভাবে– 'কোনো বিধবাকে বিয়ে দেওয়া যাবে না তার সঙ্গে আলোচনা না করে। কোনো কুমারীকে বিয়ে দেওয়া যাবে না তার মত না নিয়ে এবং তার নীরবতা হলো (এ ব্যাপারে তার সম্মতি)।' কতিপয় নারীবাদী পুরুষ এবং নারী নেত্রীর ইসলামে নারীর অধিকার বিষয়ক বিভ্রান্তি মূলক প্রচারণা আসলে অজ্ঞতা প্রসূত, কোনো কোনো সময় মতলবজাত। বর্তমানে রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে আলাদা রাখার কারণেই নারী আজ অধিকার হারা, লাঞ্ছনার শিকার।

রাষ্ট্র ধর্মীয় অনুশাসনের অধিনস্থ থাকলে আল কায়দা বা জঙ্গীবাদের জন্ম নেয়ার অবকাশ থাকেনা। তাছাড়া লাদেন-ফাদেন তো মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের সৃষ্টি। উদ্দেশ্য ইসলামকে বিশ্বব্যাপী হেয় প্রতিপন্ন করা। তাদের তৈরী এজেন্ট কর্তৃক ইসলামকে বিকৃতভাবে উপস্থাপনের মাধ্যমে বিষয়টিকে জটিল করে তোলা। 'রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে আলাদা করতে হবে' লেখাটি সেই পশ্চিমাদের ধ্যান-ধারণা আর কৌশলের প্রতিচ্ছবি

www.pathagar.com

বলেই প্রতিভাত হচ্ছে। মনোভঙ্গিটিও যেন তাদের চিন্তা-চেতনার প্রতিধ্বনি। যারা ইসলামের কল্যাণ এবং গ্রহণযোগ্যতার ব্যাপারে বিভ্রান্ত, তাদের বিষয়ে কুরআনের ভাষ্য হলো– 'তোমরা যারা বিশ্বাসী এবং আমলে সালেহ এর উপর প্রতিষ্ঠিত আছ তাদের জন্য আল্লাহর ওয়াদা তিনি অবশ্যই তাদের সফলতা দান করবেন এই পৃথিবীতে, যেমন তিনি তাদের পূর্ববর্তীদের সফলতা দান করেছেন এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্য তাদের ধর্মকে, যে ধর্মকে তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন, প্রতিষ্ঠিত করবেন এবং তিনি এর বিনিময়ে তাদেরকে তাদের ভয় দূর করে নিরাপত্তাদান করবেন। আর যারা আমার উপাসনা করে, তারা কোনো কিছুতেই আমার শরিক করে না। অতঃপর যারা অবিশ্বাস করবে, তারা প্রকৃতপক্ষেই দুষ্কৃতকারী।

০৪. ০১. ২০০৬

www.pathagar.com

লেখকের সম্মান

একজন পকেটমারের বিবেচনা আমাকে মুগ্ধ করেছে। আরো অনেক পাঠককেই মুগ্ধ করে থাকবে হয়তো। দু'এক দিন আগে পকেটমার সম্পর্কিত খবরটি একটি দৈনিকে প্রকাশ পেয়েছে। মাত্র আটি শব্দ সম্বলিত 'ওস্তদের নিষেধ' শিরোনামের খবরটির বর্ণনা এ রকম– ঈদের আগের দিন বাড়ি ফেরার পথে আলম শাইন নামের এক লেখকের মানি ব্যাগটি পকেটমার হয়ে যায়। ঈদের আগে টাকা-পয়সা হারানোর ব্যথাটা স্বাভাবিকভাবেই একটু বেশিই অনুভূত হয় বৈকি। উক্ত লেখকও মনোপিড়ায় ভুগছিলেন। কিন্তু তাকে অবাক করে দিয়ে স্বয়ং পকেটমার তার গ্রামের বাড়ি নোয়াখালিতে গিয়ে মানি ব্যাগের দুই হাজার দু'শত টাকা ফেরত দিয়ে আসে। লেখক খুশি হয়ে রাহা খরচ হিসাবে পকেটমারকে কিছু টাকা দিতে চাইলে পকেটমার বিনয়ের সাথে তা প্রত্যাখ্যান করে বলে কোন লেখকের টাকা নেওয়া ওস্তাদের নিষেধ।' বলাবাহুল্য, মানি ব্যাগের কাগজপত্র ঘেটে পকেটমার ছগির বুঝতে পেরেছিল এই টাকার মালিক একজন লেখক। লেখকের প্রতি ভালোবাসাই হোক অথবা তাদের আর্থিক দৈন্যদশার কথা চিন্তা করেই হোক লেখকদের প্রতি পকেটমারদেও ভিন্নরকম বিবেচনা। যা ভদ্রজন বলে বিবেচ্যদের মাঝে কদাচ লক্ষ্য করা যায়। কোন কোন সময় দক্ষতার সথে লক্ষ্যটাকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিতেও দ্বিধা করে না ভদ্রজনদের কেউ কেউ। পকেটমার সংক্রান্ত খবরটি পড়তে পড়তে আমাদের জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কর্তাদের কথা স্মরণে এসে গেল। সম্প্রতি তারা এক ফরমান জারি করেছেন যে লেখকদেরও ট্যাক্স দিতে হবে। অর্থাৎ তাদের প্রাপ্য রয়েলটির দশ পার্সেন্ট অর্থ ট্যাক্স হিসাবে কাটতে হবে। এই ফরমান গত অর্থবছর থেকেই কার্যকর করা হয়েছে। একজন লেখক যদি দশ হাজার টাকা রয়েলটি পান তা হলে তা থেকে ট্যাক্স হিসাবে এক হাজার টাকা কেটে রাখা হচ্ছে। অন্যদিকে ঠিকাদারদের গুণতে হয় তাদের প্রাপ্য বিলের বিপরীতে দুই থেকে আড়াই পার্সেন্ট ভ্যাট বা ট্যাক্স। আমাদের রাজস্ব বোর্ডের কর্তাদের নজরে লেখকরা ঠিকাদারের চেয়েও অনেক বড় ব্যবসায়ী। তা না হলে যেখানে ঠিকাদারদের দিতে হয় দুই থেকে আড়াই ভাগ আর সেখানে লেখকরা গুণে দশভাগ। কি বিচিত্র আয়োজন। লেখা এখনো পেশা হিসেবে গড়ে উঠেনি এদেশে। কেবল লেখালেখি করে জীবন সংসার চলে না, কাজবাজের ফাঁকফোকড়ে লেখতে হয়। বছরে একটা, দুটা বই প্রকাশ পেলে তাতে আর ক'পয়সাই বা আসে। এখানেও বানরের পিঠা ভাগ।

www.pathagar.com

লেখকরা সব সময়ই থাকেন আর্থিকভাবে হীনবল। এরা বরাবরই বিত্ত-বৈভব সম্পর্কে উদাসীন। যে কারণে গরিবী সব সময় তাদেরকে ছায়ার মত অনুসরণ করে। তাছাড়া সরকারী প্রতিষ্ঠান থেকে যেসব লেখকের বই প্রকাশিত হয় তুলনামূলকভাবে তাঁদের অধিকাংশের আর্থিক অবস্থা থাকে আরো শোচনীয়। এরপর যদি সামান্য প্রাপ্যের একটা বড় ভাগ থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করা হয় এটা গরীব লেখকদের প্রতি জুলুম বলেই বিবেচ্য। গরীব আর ধনী কোন কথা নয়, লেখকের ইজ্জত সবসময়ই গ্রাহ্যতার মধ্যে রাখতে হয়। কারণ এই ইজ্জতটুকুই তাদের একমাত্র সম্বল। যেখানে তাদের ইজ্জতের কথা ভেবে সহযোগিতার হাতকে আরো সম্প্রসারিত করা প্রয়োজন সেখানে সংকুচিত করার অর্থ লেখকদের প্রতি অসম্মানেরই নামান্তর। বলাবাহুল্য, সরকারের তিন চারখানা প্রতিষ্ঠানের প্রকাশনা আছে। যেমন বাংলা একাডেমী, শিশু একাডেমী, ইসলামি ফাউন্ডেশন এবং শিল্পকলা একাডেমী। এই সব প্রতিষ্ঠান থেকে যেসব লেখকের বই প্রকাশিত হয়েছে তাদের সবাইকেই রাজস্ব বোর্ডের তথাকথিত ফরমানকে মান্য করতে হচ্ছে। আপসোসের বিষয় হলো একজন লেখকের প্রতি পকেটমারদের ভালোবাসা-সম্মান যতটা হৃদ্ধ আমাদের রাজস্ব বোর্ডের কর্তাদের এর কণা মাত্র অস্তিত্বও আছে বলে মনে হয় না। অবিবেচনা প্রসূত ফরমানটিই এর উদাহরণ। সকল নাগরিককে ট্যাক্স দিতে হবে। তা বলে এ নয় যে যেখানে এক কেজি সম্ভব নয়, সেখানে এক মণের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া। তাছাড়া ব্যতিক্রম বলেও তো একটা ব্যাপার আছে। লেখকরা পৃথিবীর সব সমাজেই আলাদা একটি শ্রেণী। তাদের আসন সব কালেই সম্মানের ছিল এবং আছে।

লেখকরা প্রতিনিয়তই নির্যাতনের শিকার। তাদের বই ছেপে প্রকাশকরা বাড়ী-গাড়ীর মালিক বনে যাচ্ছে। বিপরীতে লেখকরা তাদের মেধা খরচ করে বরাবরই থাকছেন হতদরিদ্র। প্রকাশকদের কাছে ধর্ণা দিয়ে দিয়ে রয়েলটির টাকা আদায় করা যে কি বিড়ম্বনা, তা ভুক্তভোগী লেখকরা ভালভাবেই জানেন। লেখকের মৃত্যুর পর তাঁর সন্তান সন্ততিরা ঘুরে ঘুরে জীবন ক্ষয় করেও পাওনা আদায় করতে ব্যর্থ হচ্ছেন। দু'একজন ভাগ্যবান লেখকের কথা ভিন্ন। এই যখন চিত্র তখন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলো) এ রকম অবিবেচনা প্রসূত আচরণ সত্যি দুঃখজনক, পীড়াদায়ক, নিন্দার্হও বটে।

লেখকরা দেশ ও জাতির সম্মানের প্রতীক। এই বিষয়টি বিবেচনায় এনে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ফরমানটি প্রত্যাহার করা হোক।

ইতিমধ্যে যেসব লেখকের সম্মানীর অর্থ কাটা হয়েছে তাদের সেই অর্থ ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা নেয়া হোক।

দুস্থ লেখক শিল্পীদের সম্মানীভাতা দশ হাজার টাকায় উন্নীত করা হোক।

সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে কোন পান্ডুলিপি প্রকাশের জন্য বিবেচ্য হলে রয়েলটির একটা অংশ অগ্রীম এবং প্রকাশের এক মাসের মধ্যে সমুদয় রয়েলটি লেখককে প্রদানের বাধ্যবাধকতা সম্বলিত একটি আইন পাসের ব্যবস্থা নেয়া হোক।

www.pathagar.com

সরকারী বেসরকারী উভয় ক্ষেত্রে বইয়ের পনের থেকে বিশ পার্সেন্ট বাড়ানো হোক।

রাজস্ব বোর্ড যদি ট্যাক্স হিসেবে লেখকদের কাছ থেকে কিছু নিতেই চান তাহলে তা এক-দুই পার্সেন্টের মধ্যে নামিয়ে আনা হোক।

লেখকরা সমাজ ও জাতির শিক্ষক। তাই এই শিক্ষকদের নির্ভাবনায় রাখা সমাজ ও জাতির কর্তব্য ও দায়িত্ব। আর লেখকরা তাদের মেধা ও মনন ক্ষয় করে সমাজ ও জাতিকে তুলে ধরেন বিশ্ব দরবারে। এ খবরটুকু একজন পকেটমারের জানা থাকলেও আমাদের রাজস্ব বোর্ডের কর্তাব্যক্তিদের জানা নাই, আফসোসের বিষয়টি হলো এখানেই।

০৯. ১১. ২০০৫

www.pathagar.com

জাতির আইডেন্টিটি

নাখোশ হয়েছেন কেউ কেউ। অনেকে বললে কথাটা অতিশয়োক্তি হয়ে যাবে বৈকি। কারণ যারা নাখোশের দলে তারা ব্যবসায়ীদের কোন কোন অংশ, আমলাদের দু'একজন, বাম-রাম পন্থী বুদ্ধিজীবী গং আর পশ্চিমাদের এজেন্ট কতিপয় রাজনীতি চর্চাকারী। এরা সর্বসাকুল্যে শতভাগের দু-ভাগ হয়তো হবে। তারা কেউ মিটিং-বৈঠক করে বলছেন আর কেউ পত্রিকায় লিখে তাদের 'মূল্যবান' মতামত ব্যক্ত করছেন। অর্থাৎ শুক্রবার ছুটি থাকলে দেশের 'মহাক্ষতি' হয়ে যাবে আর রোববার বন্ধ থাকলে ব্যবসা-বাণিজ্যে শণৈ শণৈ উত্তরণ ঘটবে, তামাম জগত আমাদের এ আচরণে 'দু'বাহু বাড়িয়ে' স্বাগত জানাবে। সম্প্রতি সরকারী তরফ থেকে দু'দিনের ছুটি ঘোষিত হয়ে শুক্র এবং শনি। বলাবাহুল্য, এটি কোন নতুন আবিস্কার নয়। গত পনের বছর যাবতই চলে আসছ। বিশেষ করে শুক্রবারের বিষয়টি। এতদিন যখন কোন অসুবিধা হয়নি, ব্যবসা-বাণিজ্যে ধ্বস নামেনি, বিদেশের সাথে যোগাযোগ থেমে যায়নি, শুক্রবার কারো বাড়া ভাতে ছাই ফেলেনি, এখন ফেলতে পারে এমনটা প্রচারের মতলবটা কী? বিগত বছরগুলোতে যখন সব সহি-সালামতে চলতে পারলো এখনো চলবে এমনটাইতো স্বাভাবিক।

যারা রোববারের পক্ষে উকালতি করছেন তাদের ধারণা হলো শুক্রবার অফিস-আদালত ছুটি থাকলে আমরা সারাবিশ্ব থেকে বিযুক্ত হয়ে পড়ব। এদের যুক্তি শুনে মনে হচ্ছে সময়টা যেন এখন দাঁড়িয়ে গেছে, বাংলাদেশে যখন রোববার সকাল বা দুপুর ইউরোপ-আমেরিকায়ও তেমনটাই। তাতো নয়। ইউরাপীয় দেশগুলার সাথে আমাদের সময়ের বেশকম প্রায় ছয়-সাত ঘন্টা। আর আমেরিকার সাথে সময়ের দূরত্ব প্রায় দশ ঘন্টা। এই যে সময়ের হেরফের তাতে করে দিনের হেরফেরটাও চলে আসে স্বাভাবিক নিয়মে। তাই শুক্রবারের পরিবর্তে রোববার খোলা থাকলে ব্যবসা-বাণিজ্যে আমাদের অসুবিধা হবে, বিশেষ করে ইউরোপ-আমেরিকার সাথে এমন যুক্তি ধোপে টিকে না। তাছাড়া যুগটা তথ্য-প্রযুক্তির। ব্যবসা-বাণিজ্য এখন চলে ইন্টারনেটে, ই-মেইলে। তাই শুক্র-রবির বিতর্ক এখানে কোন প্রভাব ফেলে না। মধ্যপ্রাচ্যের প্রায় সবগুলো দেশেইতো সরকারী ছুটি শুক্রবার। সেসব দেশ কি ব্যবসা-বাণিজ্য করে না? শুক্রবার তো তাদের জন্য প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়নি।

বাংলাদেশের ব্যবসায়ীরা কি মধ্যপ্রাচ্যের ব্যবসায়ীদের চেয়েও বেশী টাকাওয়ালা হয়ে গেলেন? ব্যবসা অধিক বোঝেন? বিদেশের সাথে কি মধ্যপ্রাচ্যের ব্যবসায়ীরা

www.pathagar.com

বাণিজ্য করে না? কথায় আছে 'নাচতে না জানলে উঠান বাঁকা।' কোন কোন 'সওদাগরের' অবস্থাটাও অনেকটা তাই। শুক্র-রবি নয়, সততা আর নিষ্ঠার অভাবটাই আমাদের অধিকাংশ ব্যবসায়ীর বড় শত্রু। এমন ধারণা কেউ কেউ করে থাকেন। শুধু ব্যবসায়ীদের একটা ক্ষুদ্র অংশই নয় যারা শুক্র-শনির বিপরীতে শনি-রবির পক্ষে যুক্তি তুল আছেন তাদের উদ্দেশ্য ব্যবসা-বাণিজ্য নয়, এদের আঙ্গুল শুক্রবারের দিকে। কারণ শুক্রবারের সর্বাঙ্গে একটা ধর্মীয় গন্ধ আছে। আর সেটা হলো মুসলমানী গন্ধ। কারো কারো কাছে এ গন্ধ অসহ্য-অগ্রহণীয়। আসলে এই মানসিকতা থেকেই শুক্র-রবি বিতর্কের অবতারণা। বলাবাহুল্য, রবিবারের বিষয়টিও কিন্তু একই উৎস থেকে উৎসারিত। রবিবার খৃস্টজগতের কাছে পবিত্র দিন অর্থাৎ হলিডে। খৃস্টজগত যদি তাদের পবিত্র দিনে ছুটি ঘোষণা করতে পারে আমরা আমাদের পবিত্র দিনকে ছুটি ঘোষণা করলে অপরাধটা কোথায়? প্রত্যেক জাতিরই একটা আইডেনটিটি থাকে, থাকা উচিত।

সদ্য প্রকাশিত একটি দৈনিকে একজন সাবেক আমলার ক্ষুদ্র একটি লেখা পাঠ করলাম। এখানেও দেখলাম তিনি রোববারকেই অধিক যুক্তিযুক্ত মনে করেন ছুটির দিন হিসাবে শুক্রবারের বদলে। আমলাসুলভ যুক্তিও পেশ করেছেন তার ধারণার পক্ষে। দেখা যাক তার ধারণাটা কি, তিনি লিখছেন– 'পবিত্র কুরআনেও আছে, আযান হলে কাজ বন্ধ কর, আবার নামায শেষে জীবিকার অন্বেষণে কাজ কর। সুতরাং শুক্রবার ছুটি না থাকলে কোন অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। পাকিস্তান ঘোষণা দিয়েছে, তারা ইসলামিক দেশ, তারপরও তাদের রোববার সরকারী ছুটি। তাদের যদি অসুবিধা না হয় তাহলে আমাদের শুক্রবার খোলা থাকলে অসুবিধাটা কোথায়?'

চমৎকার যুক্তি? অসুবিধা কোথায়? সবটাই সুবিধা। শুক্রবারকে বাতিল করলে সাম্রাজ্যবাদীদের শুডবুকে নাম তোলা যাবে। পাকিস্তান করেছে তাই আমাদের করতে হবে বা করা উচিত এটি কি রকম যুক্তি? তাহলে তো বলতে হবে পাকিস্তান এটম তৈরী করেছে আমাদেরও এর অনুসরণ করতে হবে। তারা রুটি খায়, আমরাও রুটি খাব। পাকিস্তান ইসলামিক রাষ্ট্র ঠিকই আছে, বাংলাদেশের রাষ্ট্রধর্মও যে ইসলাম এ ব্যাপারে সাবেক আমলার বেখবর থাকা বিষয়টি বোধগম্য নয়। সব মুসলমানের জন্যই নামায পড়া ফরজ। অনেকে তা মান্য করে না। এ জন্য আমি নামায পড়ব না এটা তো কোন যুক্তি হতে পারে না। তাছাড়া পাকিস্তান আমাদের অনুকরণীয় রাষ্ট্র নয়। নজর ফেলতে হবে কুরআন-সুন্নাহর দিকে আর মক্কা-মদীনায় কি হচ্ছে, বিশেষ করে ধর্মীয় আচার-আচরণের ব্যাপারে। অবশ্য আরো কেউ কেউ পাকিস্তান, মালয়েশিয়া, তুরস্কের উদাহরণ টেনে এনেছেন তাদের বিবৃতি-লেখায়। যুক্তি পেশ করা অপরাধের কিছু নয়, তবে এখানে লক্ষ্য করার বিষয়টি হলো এটি যুক্তি না কুযুক্তি। মতলবী যুক্তির ব্যাপারেও সজাগ থাকা বাঞ্ছনীয়।

আবার সাবেক আমলার যুক্তির কাছে ফিরে আসা যাক। তার যুক্তি হলো শুক্রবার অফিস-আদালত খোলা থাকলে অসুবিধার কিছু নাই। তার যুক্তির পক্ষে কুরআনের হাওলা টেনেছেন। তিনি হয়তো ভুলে গেছেন অথচ চেপে গেছেন যে কুরআন অন্যান্য

www.pathagar.com

দিনের তুলনায় শুক্রবার অর্থাৎ জুমাবারকে আলাদা মর্যাদায় আসীন করেছে। যে জন্যে জুমার নামাযের সাথে অন্য ওয়াক্তের নামাযের তফাতটা প্রচুর। এ নামাযে খুতবা হয়, আদলটাও ভিন্ন, অনেকটা ঈদের মতো। তাই জুমাবারকে বলা হয়, মিনি ঈদ। ঈদের সময় যেমন সকাল থেকে প্রস্তুতি প্রয়োজন পড়ে শুক্রবারেও শারীরিক ও মানসিক প্রস্তুতিটা নিতে হয় শুরু থেকেই। অফিসের কর্মব্যস্ততার ফাঁক-ফোকড়ে তা কখনো সম্ভবপর হয়ে ওঠার কথা নয়। কোন যথার্থ সজ্জন মুসলিমের পক্ষে। রোববারকে নয় কুরআন শুক্রবারকেই মর্যাদাবান বলে ঘোষণা করেছে।

তাছাড়া পৃথিবীর প্রথম মানুষ হযরত আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছিল শুক্রবারে আর মহাপ্রলয়ের ঘটনাটিও ঘটবে এই শুক্রবার দিনেই এমনি ঘোষণা আছে বিভিন্ন অথেনটিক বই-পুস্তকে। তাই শুক্রবার অফিস-আদালত বন্ধ রাখা নানাদিক থেকেই মঙ্গলজনক দেশ ও জাতির জন্য।

১৪. ০৯. ২০০৫

www.pathagar.com

বাঙালীর শ্রেষ্ঠত্ব এখন জরিপের গোলক ধাঁধায়

সম্প্রতি ঘোষিত হলো জরিপের ফলাফল, হোটেল শেরাটনের মার্বেল রুমে। ঘোষক ছিলেন ড. আনিসুজ্জামান। জরিপটি করা হয়েছে মার্কিন মুল্লুকে বসে। আয়োজনে প্রকাশকগোষ্ঠী মুক্তধারা। তাদের ঠিকানা নাকি বর্তমানে সেখানেই। বিদেশে বসে দেশের খবর, দেশপ্রেমের পরাকাষ্ঠা বৈকি। জরিপের বিষয় ছিল বাঙালী খোঁজা। খুঁজে পেতে তারা দশজন বাঙালীর খবর উদ্ধার করেছেন যারা কিনা বাঙালীদের মাঝে শ্রেষ্ঠ, মুক্তধারার কলা-কৌশলে এমনটাই ধরা পড়েছে। এসব 'শ্রেষ্ঠ বাঙালী' এখনো সরব ও সচল। অর্থাৎ জীবিত। যাদের ললাটে 'তিলকের ফোটা' পড়ল তারা কি কি কারণে শীর্ষে এ বিষয়ে পত্র-পত্রিকায় তেমন কিছু প্রকাশ পায়নি। নেপথ্যে হয়তো কিছু একটা আছে। মুক্তধারা জানে, আমরা জানি না। বলাবাহুল্য, মাঝে মধ্যে বিদেশী কিছু সংস্থা থেকে কারো কারো কাছে চিঠি আসে যে এত ডলার পাঠান আপনাকে ডক্টরেট ডিগ্রী প্রদান করা হবে। আবার দেশেও এমনটা হরহামেশা ঘটছে গাইটের কড়ি খরচ করে শ্রেষ্ঠ সমাজকর্মী অথবা শ্রেষ্ঠ কবি-সাহিত্যিক হওয়ার রেওয়াজ। মুক্তধারার 'শীর্ষ বাঙালী'র পশ্চাতে এমন বাণিজ্য ধারণা নাও থাকতে পারে। তবে শাস্ত্রে আছে 'বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী।' স্মরণযোগ্য, দেশে মুক্তধারার বই বাণিজ্য পশ্চিমে হেলে পড়ার অবস্থায়। এরপরও তাদের এই কসরতের জন্য সাধুবাদ জানাতেই হয়।

জরিপে দেখা গেল দশ জীবিত বাঙালীর নাম সবার উপরে। বালক বয়সে উত্তম-সুচিত্রার একটি সিনেমা দেখে পুলকিত হয়েছিলাম তার নামও ছিল 'সবার উপরে'। এই মধ্যবয়সেও কোটি কোটি বাঙালীর মধ্যে দশজনকে 'সবার উপরে' দেখে পুলকিত হলাম। আমার মতো আরো অনেকেই হয়েছেন, এ বিষয়ে পত্র-পত্রিকায় লেখালেখির বিস্তার লক্ষ্য করে এরকমই মনে হচ্ছে। অনেকের মত কবি সৈয়দ শামসুল হক দৈনিক সমকালে একটি দীর্ঘ বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। সে বক্তব্যে আয়োজকদের তিনি তুলাধুনা করেছেন। সৈয়দ হক জরিপকারীদের ব্যাপারে আমাদের মতো আমজনতার সন্দেহটাকেই তুলে এনেছেন এভাবে– 'আমি বহুবার বলেছি আবারো বলছি–এদেশে এখন মূর্খতাই অলঙ্কার, বেয়াদপিই শক্তি। এই সঙ্গে যোগ করতে হয় মতলববাজিটাকেও। মুক্তধারার এ জরিপ ও তার ফলাফলের নমুনা দেখে এর পেছনে মতলব যে কিছু নেই বলতে পারছি না। বিশেষ করে পাঁচ তারা হোটেলের মার্বেল রুমে এত বিস্তর অর্থ ব্যয় করে এমন একটি অনুষ্ঠান করা। প্রশ্ন তো থেকেই যায়।' এমন প্রশ্ন অবশ্য সৈয়দ হকের মতো আরো বহু জনের।

www.pathagar.com

অর্থ আগমন-নির্গমনের বিষয়টি আয়োজকদের একান্ত ব্যাপার। এত খরচপাতি বাণিজ্য না থাকলে কি করে হয়? নিজের স্বার্থ পাগলেও বোঝে। মুক্তধারা অর্থাৎ আয়োজকগণের স্বার্থ বুদ্ধিটা আরো প্রখর থাকারই কথা, কারণ তারা পাগলের তালিকায় পড়েন না, সুস্থ। তবে মতলবের ব্যাপারটা নিয়ে সন্দেহ থেকেই যাচ্ছে। যদিও পত্রিকায় প্রকাশিত লম্বাচৌড়া প্রতিবেদনে হক সাহেবের মতলবটাও আটকা থাকেনি। শব্দের শরীর ফুটো করে তাঁর মতলবটাও উঠে এসেছে। ইতোমধ্যে এ ব্যাপারে অনেকে পত্র-পত্রিকায় লিখেছেন, খোলাসাও করেছেন। তবে এ কথা সত্য পৃথিবীর কোন কাজই মতলবের বাইরে থাকছে না ইদানীং, উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম বাদে। এই যেমন বুশ সাহেব, ব্লেয়ার সাহেব সন্ত্রাস সন্ত্রাস করে আফগানিস্তান দখল করল, ইরাক দখল করল। এখন অবশ্য সাহেবদ্বয়ের নেপথ্য মতলবটা খোলাসা হয়ে গেছে দুনিয়ার কাছে। মতলব চাপা থাকে না বেরিয়ে পড়ে একদিন, মতলবের ধরন যত কৌশলীই হোক না কেন। মুক্তধারার জরিপে যে দশজন 'শ্রেষ্ঠ বাঙালী' বনে গেছেন 'ঝর্ণাধারার' জরিপে দেখা যাবে শ্রেষ্ঠের খাতায় অন্য দশজন। পূর্বের দশ বাঙালী বাতিল। আগে তো শ্রেষ্ঠত্ব মাপার সর্বজনগ্রাহ্য 'বাটখারা' আবিষ্কার প্রয়োজন। ওজনযন্ত্রে গড়মিল থাকলে মাপে গড়মিল ধরাপড়াটা স্বাভাবিক। জরিপের ফল প্রকাশের পর এমন সব কথাবার্তা হচ্ছে, লেখালেখিও পত্রিকায় আসছে গড়মিলের সূত্র ধরে।

যে দশ 'শ্রেষ্ঠ বাঙালী'র ছবি দেখলাম কাগজে এদের মাঝে চারজন ভারতীয়ও রয়েছেন। বাংলাদেশের সাথে ভারতকে গুলিয়ে ফেলার মতলবটা বোধগম্য নয়। দশ 'শ্রেষ্ঠ বাঙালী'র কেউইতো বিতর্কের উর্ধ্বে নন এক-দু'জন ছাড়া। বিতর্কের ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ হয় কোন যুক্তিতে? বাংলাদেশের দুই সাহিত্যিক ভাইয়ের ছবিও ছাপা হয়েছে শ্রেষ্ঠদের(!) সারিতে। হাস্যকরই মনে হল বিষয়টা, সাহিত্যের তুল্যমূল্যে এরা কোন উঁচুদরের লেখক নন। তাছাড়া একজনতো বৃদ্ধ বয়েসে 'প্রেম' কেলেংকারীতে পড়ে মান-ইজ্জত খুইয়ে শেষ করেছেন এরই মধ্যে। এসব ব্যক্তি যদি 'শ্রেষ্ঠ বাঙালী' বলে বিবেচিত হন তাহলে বাঙালীর কপালে আরো দুঃখ আছে বৈকি।

'শ্রেষ্ঠ বাঙালী' খোঁজার অনুরূপ আরো একটি জরিপ করেছিল বিবিসি, গত বছর। তাদের শ্রেষ্ঠের তালিকায় ছিল বিশজন। এসব বাঙালী নাকি কেবল শ্রেষ্ঠ নন তারা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ! সর্বশ্রেষ্ঠদের শীর্ষে দেখানো হয়েছে শেখ মুজিবর রহমানকে। এ তালিকায় ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, তিতুমীর, শেরে বাংলা, আরো অনেক বড় বড় ব্যক্তিত্ব। এখানেও বিবিসির মতলবটা স্পষ্ট। জরিপের ফল প্রকাশের পর মুজিবভক্তরা মিটিং মিছিল ঢোল করতাল দিয়ে রাস্তা-ঘাট উল্লাসে মুখরিত করে তুলেছিল। পত্র-পত্রিকায় আবেগ-উচ্ছ্বাসের ঝড় বইয়ে দিয়েছিল চিহ্নিত কিছু ব্যক্তি। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়েছিল তাদের হাতে যেন চাঁদ এসে গেছে। লোকে বলে চাঁদেরও কলঙ্ক আছে। বিবিসির জরিপ সম্পর্কে নাকি ডক্টর আনিসুজ্জামান মন্তব্য করেছিলেন গুরুদেব থাকতে 'বঙ্গবন্ধু'? তাহলে বুঝাই যাচ্ছে কোন জরিপই সর্বজনগ্রাহ্য হচ্ছে না। কর্মের পেছনে বদমতলব থাকলে বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থাকলে তা গ্রহণযোগ্যতা হারায়। দু'একদিন

www.pathagar.com

হৈ চৈ তারপর বুদবুদের মত সব বাতাসে মিলিয়ে যায়। মুক্তধারার জরিপ তো শুরুতেই ফ্লপ। আর বিবিসির জরিপ অতি মতলবীর কারণে পত্রিকার পৃষ্ঠা থেকে বাইরে আসতে পারছে না। কারণ বিবিসি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালীর যে ধারাক্রম তৈরী করেছে তা দেখে "বাঁশের চেয়ে কঞ্চিদঢ়" বাক্যটি বারবার স্মরণে আসে। বিবিসির জরিপে নাকি মীর জাফরও বার ভাগ ভোট পেয়েছিল। পক্ষান্তরে বাঙলা বিহার উড়িষ্যার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা গোনর বাইরে থাকলেন। যে সিরাজের বাল্য-কৈশোর আর যৌবন বাঙলার আলো-বাতাসে বেড়ে উঠেছে। বাঙলার স্বাধীনতার জন্য জীবন পর্যন্ত দিলেন সিরাজ। শ্রেষ্ঠ বাঙালীর তালিকায় তার নাম খুঁজে পাওয়া গেল না। মীর জাফর বাঙালীদের সারিতে দাঁড়াতে পারলে সিরাজ পারবে না কোন যুক্তিতে? শ্রেষ্ঠ বাঙালী খোঁজার কারিগরদের মানসিক অবস্থানটা এ থেকেই পরিমাপ করা যায় অবলীলায়। শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি কি? যাদেরকে শ্রেষ্ঠত্বের তগমা পরানো হলো মানুষ হিসেবে তাদের অবস্থানটা কোথায়? আগে তো ভালো মানুষরূপে গ্রহণযোগ্যতায় আসতে হবে। বাঙালী না ইংরেজ সে তো পরের বিচার। শ্রেষ্ঠ বাঙালী বা সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালীদের (!) কয়জন মনুষ্য বিচারে শ্রেষ্ঠত্বের কাতারে দাঁড়াতে পারবেন। আদৌ কেউ পারবেন কী? তাই জরিপ করে বলতে হবে শ্রেষ্ঠ মানুষ খোঁজার। যার বা যাদের অন্তরে মনুষ্যত্বের অভাব, তাকে বা তাদেরকে শ্রেষ্ঠ বা সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ঘোষণাতে কার কি আসে যায়। না দেশের না জাতির।

সর্বকালের না হোক শ্রেষ্ঠ বাঙালী হিসেবে মনোনয়ন দিলেতো ইলিয়াস শাহকেই দিতে হয়। জরিপ-টরিপের প্রয়োজন পড়ে না। কারণ তিনিই প্রথম বাংলাদেশের সীমানা নির্ধারণ করেছিলেন। তাঁর রাজ্যের নামকরণ করলেন সুবা বাঙ্গালাহ। আর নিজকে ঘোষণা করেছিলেন শাহ-এ-বাঙ্গালাহ। বাঙ্গালাহ অর্থ ভাটি অঞ্চল। এ ভাটি অঞ্চল দেড়-দু'হাজার বছর আগ থেকেই স্বাধীন, মাঝে-মধ্যে স্বাধীনতার সূর্য ডুবলেও সূর্য উঠেছে শেষাবধি। আমাদের আজকের স্বাধীনতা সেই ধারাবাহিকতারই ফসল। প্রশ্ন উঠতে পারে ইলিয়াস শাহ কি বাঙালী? আলবেনিয়ার তেরেসা যদি শ্রেষ্ঠ ভারতীয় হতে পারেন ইলিয়াস শাহ শ্রেষ্ঠ বাঙালী হতে বাঁধা কিসের? ইলিয়াস শাহ তো স্বাধীন বাংলার শাসক ছিলেন। তাঁর উপাধি ছিল শাহ-এ-বাঙ্গালাহ।

১৩. ০৭. ২০০৫

www.pathagar.com

কবিতার প্রতি অনুরাগ কবিদের প্রতি ভালোবাসা

হোটেল পূর্বানীতে যখন ঢুকলাম তখন আসরের ওয়াক্ত প্রায় সমাগত। সাথে ছিলেন কবি ইসমাঈল হোসেন দিনাজী। আমাদের গন্তব্য, বিশ্ব নবীকে নিবেদিত কবিতা উৎসব। আয়োজনে ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র। ফি বছর তারা এই মহতি কাজটি করেন, পূর্বানীর জলসা ঘরে। স্মরণযোগ্য, এমন একটি আয়োজন করতো ইসলামিক ফাউন্ডেশন। নবী দিবসে তারা কবিতা পাঠের আসর বসাতো উন্মুক্ত চত্বরে। গত দু'বছর যাবত ইসলামিক ফাউন্ডেশন বড় বেশী শীতল এ ব্যাপারে। তাদের নাকি টাকা পয়সার অভাব। গরিবী হালত এখন। নবীর নামেও পয়সা খরচ করতে অপারগ। তবে শোনা যায়, প্রতিষ্ঠানটির প্রধানকর্তা নাকি এখন কবিতা বিমুখ। যে জন্যে এ আয়োজনে বর্তমানে ভাটা। কবিতার প্রতি ছিল প্রচণ্ড অনুরাগ। আর কবিদের প্রতি ছিল বিশ্ব নবীর প্রগাঢ় ভালোবাসা।

জলসা ঘরে প্রবেশ করে অনুভব করলাম এক অনাবিল প্রশান্তি। প্রায় শ' দেড়েক প্রবীণ নবীন কবির উপস্থিতিতে মুখরিত পূর্বানীর জলসাঘর। কবিরা এসেছেন তাদের হৃদয়নিঙরানো শব্দ দিয়ে তৈরী করা ভালবাসার পুষ্প নিয়ে। যা নিবেদন করবেন তাদের প্রিয় মানুষটির উদ্দেশ্য, বিশ্ব নবীর পদপ্রান্তে। আনন্দের খবর হলো উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মহিলা কবির উপস্থিতি। এরি মধ্যে অর্ধেকের মতো কবি তাদের ভালোবাসার পাপড়িগুলো উড়িয়ে দিয়েছেন মদিনার দিকে। পিছনের একটি খালি চেয়ারে গিয়ে বসলাম। বন্ধুবর আশরাফুল ইসরাম কোত্থেকে এসে আমাকে টেনে সামনের সারির দিকে নিয়ে গেলেন। আমি দ্বিতীয় সারি একটি সোফাতে গিয়ে বসলাম। সেখানে আগে থেকেই বসেছিলেন কবি সৈয়দ শামসুল হুদা ভাই। বহুদিন পর তার সাথে সাক্ষাৎ। কুশল বিনিময় করলাম। সামনের সারিতে অনুজপ্রতিম কবি আবদুল হাই শিকদারকে পেলাম। তার সাথে অনেক দিন পর দেখা। কবিতা পাঠ শেষে কবি মোশাররফ হোসেন খানও এসে বসলেন আমাদের কাছে। তাকেও পেলাম কয়েক মাস পর। এসব অনুষ্ঠানের আর একটি দিক হল বন্ধু-বান্ধব কবি-সাহিত্যিকদের পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ। ব্যস্ত নাগরিক জীবনে দিন তারিখ ঠিক করে কুশলবিনিময় করা এখন কষ্টদায়ক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে বৈকি। এরি মধ্যে তরুণ কবি মুর্শিদ-উল-আলমের নাম ঘোষিত হলো। একটি চমৎকার কবিতা নিবেদন করলেন কবি। তার

www.pathagar.com

কবিতার আলাদা একটি স্বাদ আছে, মুগ্ধতা আছে। তখন মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন তথ্যমন্ত্রী শামসুল ইসলাম, সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের পৃষ্ঠপোষক জনাব মকবুল আহমদ, কেন্দ্রের কর্ণধার সাইফুল্লাহ মানসুর, কবি আসাদ চৌধুরী এবং কেন্দ্রের কর্মকর্তাদ্বয় কবি হাসান আলিম, কবি আসাদ বিন হাফিজ। প্রবীণ নবীন সবাই চমৎকার সব কবিতা নিবেদন করলেন। তবে আমাকে সবচে পুলকিত করেছে, আবেশিত করেছে নূর-ই-আউয়ালের নাত, তাঁর দরদভরা কণ্ঠ। মনে হচ্ছিল পঙ্কজ মল্লিক শুনছি।

কবিতার প্রতি প্রচণ্ড অনুরাগ এবং মুগ্ধতা ছিল রসূলের। কবিদের প্রতি ছিল তাঁর এক অন্যরকম ভালোবাস। তিনি তাঁর আচরণে এর প্রকাশ ঘটিয়েছেন বারবার। তিনি একজন বোদ্ধা সমালোচকও ছিলেন কবিতার। সে যুগের শ্রেষ্ঠ কবি ইমরুল কায়েসের কবি প্রতিভার প্রশংসা করতেন। কিন্তু তার কাব্যভাষা এবং বিষয়ের ছিলেন তুখোড় সমালোচক এবং বিপক্ষে। তিনি বলেছেন, কবি ইমরুল কায়েস হবে দোজখে তার অনুগামী কবিদের সরদার। রসূল সেই সব কবি এবং কবিতার প্রতি সপ্রশংস ছিলেন যারা সত্য এবং কল্যাণকে ধারণ করেন তাদের শব্দে এবং বিষয়ে। এর বিপরীতপন্থি কবিদের প্রতি রসূলের ঘৃণা এবং লানত। আফসোসের সংবাদ হলো আমাদের কোন কোন বড় কবি ভাবেন যত বেশি যৌনতা আর যত বেশি নারীর আবরণ উন্মোচন সম্ভব তত বেশি উপাদেয়, তত বেশি উৎকৃষ্ট, তার সাহিত্য তার কাব্যকুশলতা। অশোভন এবং অশালীন বিষয় কখনো কল্যাণকে স্পর্শ করে না। যতই শিল্পের তক্‌মা তাতে ঝুলানো হোক। জীবনের সব বিষয়ই কি প্রকাশযোগ্য? সাহিত্যে গ্রহণ-বর্জনের একটা মাত্রা আছে। ইতর প্রাণীদের অবশ্য প্রকাশ-অপ্রকাশের মধ্যে কোন দেয়াল থাকে না, যেমন সারমেয়। এই গোত্রের কবিদের প্রতিই রসূলের ঘৃণা এবং লানত। বলাবাহুল্য, ইমরুল কায়েসের কবিতার বিষয় ছিল নারী এবং যৌনতা। স্মরণে আনতে হবে রসূলের আদর্শে গোঁজামিলের কোন স্থান নেই। ভণ্ডামি তাঁর পছন্দের তালিকায় ছিল না। তাঁর দলের সব কবি অতীতের দুর্গন্ধ নর্দমায় নিক্ষেপ করেই নতুন প্রভাতের সূচনা করেছিলেন। এই তথ্যটি স্মরণে রেখেই আমাদের আশ্রয়-প্রশ্রয়ের তালিকা সংশোধন করা দরকার। কারণ, মুখে শেখ ফরিদ আর বগলে ইট এ জাতীয় কর্মকৌশল ছিল রাসূলের কর্মপদ্ধতির বাইরে।

তৃপ্তির খবর হলো কাব্যের বাগানে এখন অন্যরকম বাতাস। দুর্গন্ধের পরিবর্তে সুগন্ধির স্নিগ্ধতা, অকল্যাণের বিপরীতে কল্যাণের পুলক, অশ্লিলতা এবং অসভ্যতার ঘরে এখন শ্লীলতা-ভব্যতার ঔজ্জ্বল্য। দৃশ্যপট পাল্টানোর কারিগর বর্তমানের এক ঝাঁক তরুণ কবি। তাদের কাব্য ভাষা যেমন সুন্দর, তেমনি তাদের কবিতার বিষয়ও মানব কল্যাণকে উচ্চকিত করে। এরি মধ্যে আমরা আসর এবং মাগরিবের সালাত আদায় করে নিলাম। এ এক আনন্দময় দৃশ্য। এখানে ভাষা এবং আশা যেন একাকার। এটি কি কবিতার শিল্প নয়! কল্যাণের শিল্প নয়! কর্ম-ধর্ম আর বর্ম কোনটাই অনাত্মীয় নয়। তারা একে অন্যের পরিপূরক। রসূলের শিক্ষাও এটি। এই মহামানবকে সালাম জানানোর জন্যেই এখানে সমবেত হয়েছি আমরা কতক ভক্ত কবি। জাতীয় সংসদ

www.pathagar.com

থাকায় আগেভাগে বক্তব্য রেখে চলে গেলেন তথ্যমন্ত্রী। অনুষ্ঠানের শেষের দিকে এলেন কবি আল মাহমুদ এবং কবি আল মুজাহিদী। সময় বাড়ছে কবির তালিকাও কমছে। প্রধান কবিরা তাদের আর্তি পেশ করলেন নবীর প্রতি, আসরের শেষাংশে। আপ্যায়নের মাধ্যমে সমাপ্তি ঘটল এই মহতী মিলন মেলার। তখন রসূলের নামের সৌরভ উড়ছে সারা ঘরময়।

নিন্দুকেরা যে যাই বলুক কল্যাণের ঔজ্জ্বল্য বাড়ছে। এ জন্যে ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রকে ধন্যবাদ। সাধুবাদ তাদের কর্ম-কুশলতাকে তারা একঝাঁক তরুণ কবির হৃদয়ে স্থাপন করতে পেরেছেন আলোর ঝালর, যেখান থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে নবীপ্রেম। আর নবী প্রেমই সব কল্যাণ এবং শোভনতার আধার। তাই কেন্দ্রের কর্মকর্তাদের প্রতি একটি প্রস্তাব, আগামীর অনুষ্ঠান আর ক্ষুদ্র পরিসরে নয়, বৃহত্তর আঙ্গিনায় আনা হোক। কারণ যাঁর নামে এ আয়োজন তিনি মহা এক ব্যক্তিত্ব। তাই আয়োজনটিও সে রকমই হওয়া বাঞ্ছনীয়। অনুষ্ঠানটি হতে পারে বাংলাদেশ চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে, তিনদিনব্যাপী। তামাম বিশ্ব থেকে ভক্ত কবিরা আসবেন রসুলের প্রতি সালাম জানাতে। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন দেশের প্রধানমন্ত্রী। প্রেসিডেন্টও হতে পারেন। মঞ্চে থাকবেন ইকবাল, ফররুখের মতো কবি। সৃষ্টি এবং স্রষ্টার মধ্যে যেখানে কোন আড়াল নেই।

১৭. ৫. ০৫

www.pathagar.com

অন্নদা শঙ্কর রায় এবং তেলের শিশি বিষয়ক রচনা

অন্নদা শঙ্কর রায় মারা গেছেন কলিকাতায় সম্প্রতি। তিনি ইংরেজ আমলের আইসিএস এবং ভারত সরকারের একজন ডাকসাইটে আমলাও ছিলেন। চাকুরি জীবনের অনেকটা সময় তিনি কাটিয়েছেন তৎকালীন বাংলাদেশে। ভারত ভাগ হওয়ার সময় অন্নদা শঙ্কর রায় ছিলেন মোমেনশাহীর জজ। জন্মেছিলেন উড়িষ্যায়। ওড়িয়া ভাষায়ই সাহিত্য চর্চা শুরু। অন্নদা শঙ্কর মূলত জন্মসূত্রে ওড়িয়া। পরবর্তী সময় তিনি বাংলা সাহিত্য চর্চা শুরু করেন। এবং প্রথম সারির একজন সাহিত্যিক হিসাবেও উঠে আসেন। বিশেষ করে তিনি ছড়া লিখে প্রভূত নাম করেন তখন। গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধও লিখেছেন অনেক। অন্নদাশঙ্কর তার রাজনৈতিক মতামতকেই প্রচার করেছেন ছড়া, গল্প, উপন্যাস প্রবন্ধে। আচার-আচরণ আর বক্তৃতা-ভাষণেও তিনি একই বৃত্তের মানুষ। প্রচণ্ড ভাবে তিনি ছিলেন ভারতপন্থী এবং ভারত ভাগের বিপক্ষে। আমৃত্যু অন্নদা শঙ্কর এমতকেই ধারণ করে গেছেন। ভারত বিভক্তিকে তিনি মারাত্মক ভুল বলে মনে করতেন। ভাঙ্গা ভারত তার হৃদয়ে এক ধরনের প্রদাহের সৃষ্টি করেছলো। নানাভাবে তিনি তা প্রকাশও করেছেন। এই প্রদাহ নিয়েই 'দাহ' হয়েছেন শেষাবধি। দীর্ঘায়ু পেয়েছিলেন অন্নদা শঙ্কর। জন্ম ১৯০৪ আর মৃত্যু ২০০২। তাই দেখা-শোনা এবং জানা-শোনার পরিধি ব্যাপক। চাকুরি জীবনে রাজশাহীর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে যোগ দিয়েছিলেন ১৯৩৭ সালে। অর্থাৎ ইংরেজের একজন একান্ত বাধ্যগত কর্মচারী হিসাবেই অন্নদাশঙ্করের যাত্রা শুরু।

সাহিত্যের চেয়ে অন্নদা শঙ্কর তার রাজনৈতিক মতামতের জন্যেই আলোচিত হয়েছেন অধিক। সাতচল্লিশের ভারত ভাগকে তিনি মানতে পারেননি। এর বহিঃপ্রকাশ ঘটছে তার একটি ছড়ায়। খুকু ও খোকা শিরোনামের এ ছড়াটিতে তিনি বললেন, "তেলের শিশি ভাঙল বলে/খুকুর পরে রাগ করো/তোমার যে সব বুড়ো খোকা/ভারত ভেঙ্গে ভাগ করো!/তার বেলা?" এটি লিখেছিলেন সাতচল্লিশে। তিনি তার এমতকে ধারণ করেছেন আমরণ। কিন্তু অন্নদার এ ধারণা কতটা গ্রহণযোগ্য আমাদের কাছে! ভারত ভাগ না হলে স্বাধীন বাঙলাদেশ কি করে ভাবা যেতো? তারপরও বাংলাদেশেরই কোনো কোনো বর্ণচোরা লেখক-পত্রিকা অন্নদা শঙ্করের এই যুক্তিহীন মনোপীড়াকেই যুক্তিগ্রাহ্য করে তুলতে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েন। ভাষার মারপ্যাঁচে বুঝাতে চান অন্নদার ধারণাই সঠিক। তার এই ছড়াটির উদ্ধৃতি বারবার তুলে এনে বলা হয় : এটি একটি 'যুগান্তকারী' ছড়া। বিখ্যাত ছড়া। শেখ রেহানা সম্পাদিত বিচিত্রায় 'কীর্তিমান পুরুষ

www.pathagar.com

অন্নদা শঙ্কর রায়', এই শিরোনামের লেখাটিতে এক জায়গায় বলা হচ্ছে 'দেশ ভাগ ছিলো তাঁর জীবনের বড় বেদনার ঘটনা। তিনি প্রতিনিয়ত বেদনায় বিদ্ধ হতেন এই ভেবে – বাঙালি জাতির মেরুদণ্ডে ঘুণ ধরিয়েছে এই দেশ ভাগ।" যথানিয়মে বিখ্যাত (?) ছড়াটিও তুলে দেয়া হয়েছে। প্রতিবেদনটির লেখকের নাম 'রুদ্রাক্ষ রহমান' (নাম দেখেই প্রতীয়মান হয় তাহারা কাহারা)। আসলে অন্নদা শঙ্করের সাথে সাথে বিচিত্রা পরিবারকেও যে বেদনায় বিদ্ধ করছে ভারত ভাগ, তা হয় তো বলাই বাহুল্য। বিচিত্রার প্রতিবেদনটি পাঠ করলে যে কোনো পাঠক এ সত্যটি উপলব্ধিতে আনতে কষ্ট হবার কথা নয়।

একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় অন্নদা শঙ্কর বাংলাদেশের পক্ষে প্রচুর লেখালেখি করেছিলেন। আমাদেরকে উজ্জীবিত করেছিলেন। এ জন্যে আমরা তার কাছে কৃতজ্ঞ অবশ্যই। (তার এই অযাচিত স্নেহ, ভালোবাসা কি একেবারেই উদ্দেশ্যহীন ছিলো! হয়তো না। অন্নদা শঙ্কর ভেবেছিলেন এইবার বুঝি ভাঙ্গা শিশি জোড়া লাগতে যাচ্ছে। কিন্তু হা হতস্যি! সকলি গরল ভেল। আগষ্টের অভ্যুত্থানের পরপর বাংলাদেশে ভারতীয় সৈন্য পাঠানোর অনুরোধ করেছিলেন তিনি ইন্দিরাকে। এ থেকেই স্পষ্ট হয় বাংলাদেশের প্রতি অন্নদার ভালেবাসার নেপথ্যের কার্যকারণ।)

এই কৃতজ্ঞতার কারণেই হয়তো বাংলাদেশের পত্র-পত্রিকায় প্রচুর লেখালেখি প্রকাশ পেয়েছে অন্নদা বিষয়ক। অবশ্য এর বেশীর ভাগই স্মৃতিচারণমূলক রচনা। প্রচার করা হয় অন্নদা শঙ্কর অসাম্প্রদায়িক উদার মানবিক। কিন্তু এর কোনো লক্ষণ তার বিপুল সাহিত্যে খুঁজে পাওয়া যায় না। পাশাপাশি বাস করার পরও মুসলিম সম্প্রদায় তার সাহিত্যে এমনভাবে উল্লেখিত হয়নি। অন্নদা শঙ্কর রায় ভারত ভাগ বা বাংলা ভাগের বিপক্ষে অবস্থান করতেন। কারণ এতে করে প্রতিবেশী সম্প্রদায় তার সমকক্ষে চলে আসবে সে আশঙ্কায়। যদিও ধর্ম সম্পর্কে তার ধারণা ছিলো অদ্ভুত। অন্নদা মঙ্গল শিরোনামে দাউদ হায়দারের একটা লেখায় পড়লাম অন্নদা শঙ্কর বলছেন 'ঋগ্বেদ পড়লে জানবে ঈশ্বর বা ভগবান নয়, ধর্ম তৈরী করেছে প্রাচীন রাজারা।' হয়তো হতেও পারে। অন্নদা শঙ্কর যে সম্প্রদায় থেকে এসেছেন সে ধর্মের বেলায়। কিন্তু সব ধর্ম সম্পর্কে অন্নদার এই ঢালাও মতামত কতটা সঠিক বা যুক্তিযুক্ত! তারপরও অন্নদার একান্ত ব্যক্তিগত চিন্তা-চেতনাকে 'শাশ্বত' বাণী বলে চালিয়ে দিতে চান কেউ কেউ। দাউদ হায়দারের লেখাটি অনেকটা সে রকমের। তবে তার অন্নদা বিষয়ক লেখাটি সুখপাঠ্য এবং ইনফর্মেটিভ।

অন্নদা শঙ্করের সাহিত্যালোচনা এক কথা আর তার রাজনৈতিক মতামতকে প্রতিষ্ঠা করার কসরত করা অন্য কথা। অন্নদা শঙ্কর ভারত ভাগকে বরাবর 'ভুল' বলে প্রচার করতেন। আমরাও কি তার মতকেই সত্য বলে মেনে নেব?

উনপঞ্চাশে নজরুলকে নিয়ে অন্নদা শঙ্কর একটি ছড়া লেখলেন– 'ভুল হয়ে গেছে বিলকুল/আর সব কিছু ভাগ হয়ে গেছে/ভাগ হয়নিকো নজরুল/এই ভালটুকু বেঁচে থাক/বাঙালী বলতে একজন আছে/দুর্গতি তার ঘুচে যাক।' কিন্তু ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে অন্নদা শঙ্করের এই 'ভুল' ধারণাকেও ভুল প্রমাণ করে নজরুলও ভাগ হয়ে গেল

www.pathagar.com

অবশেষে, বাহাত্তুরে। নজরুল চলে এলেন তাঁর নিজস্ব ঠিকানায়। তখন হতাশ হয়ে বিভ্রান্ত অন্নদা শঙ্কর নজরুলকে নিয়ে আরো একটি ছড়া লিখলেন সাতাত্তুরে 'বিদ্রোহী রণক্লান্ত' শিরোনামে। দীর্ঘ ছড়ার শেষ স্তবকে লিখলেন– কেউ ভাবল না ইতিহাসে ফের/ভুল হয়ে গেল বিলকুল/এতকাল পরে ধর্মের না .ম/ভাগ হয়ে গেল নজরুল।

অন্নদা শঙ্কর আরো জীবন পেলে হয়তো তিনি এমন আরো কিছু ঐতিহাসিক ভুল প্রত্যক্ষ করে যেতে পারতেন। বলা বাহুল্য ভাগ হবার আগে নজরুলের দুর্গতি বেড়েছে বৈ কমেনি। দুর্গতির কারণ অবশ্যই তার ধর্ম। নজরুলের দুর্গতির অবসান হয় ঢাকায় আসার পর। তার স্বজাতির আশ্রয়ে ফেরার পর। সে জাতি শুধু বাঙালী নয়– তারা বাঙালী মুসলমান তথা বাঙলাদেশী জাতি। কলকাতায় কবির কি অনাদর অবহেলায় কেটেছে সেসব কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে কাগজের পাতা-ছবিতে। অন্নদা শঙ্কর তো তখন জীবিত ছিলেন। কই এর প্রতিকারে তিনি কতটা এগিয়ে এসেছিলেন? আসেননি। আসেননি মূলত নজরুলের ধর্ম বিশ্বাসের কারণে হয়তো। এই বিশ্বাসই নজরুলকে বৈরী করে রেখেছিল ভারতীয়দের কাছে। বাঙালী হিন্দু সম্প্রদায়ের কাছে। যে জন্যে ঢাকার নজরুল আর কলকাতার নজরুলের ব্যবধানটা ছিল বিস্তর। অন্নদা শঙ্কর 'ভুল' ভাবলেও যা ভাগ হবার নিয়মের আবর্তে তা হবেই। যেমন অন্নদা শঙ্করের জীবিতকালেই ভারত ভেঙে কয়েক টুকরা হয়েছে। ভবিষ্যতে আরো যে ভাঙবে না তার নিশ্চয়তা কী? ভুল হোক শুদ্ধ হোক অন্নদা শঙ্করের এটি ব্যক্তিগত মত। কিন্তু অন্নদা শঙ্করের মতলবি এই মতকে এদেশীয় কতিপয় বর্ণচোরা লোক নানা ফন্দিফিকিরে প্রতিষ্ঠিত করতে চাচ্ছে। শুধু চাচ্ছেই না খোলামেলা বলতেও দ্বিধা করছে না।

অন্নদা শঙ্কর ছড়া লিখতেন। প্রবোধ কুমার সেন নাকি অন্নদা শঙ্করকে ছড়ার রাজা বলতেন। সাহিত্যের এই অংগনের একজন মুগ্ধ পাঠক হিসাবে তাঁর 'ছড়া সমগ্রে' চোখ বুলিয়ে দেখেছি, দু'একটি ব্যতিক্রম বাদে 'যত গর্জে তত বর্ষে না'। প্রায় প্রতিটি ছড়ায় কষ্ট কল্পনা আর অন্তমিলে কসরতে ভরা। ভিন্নজনে ভিন্নমত হতেই পারে।

এটি অন্য আর এক প্রসঙ্গ। প্রসংগান্তরে না গিয়ে অন্নদা শঙ্করকে নিবেদিত ঢাকার একটি ছড়ার উদ্ধৃতি টেনেই লেখার ইতি টানছি। ক'দিন আগে পাঠ করেছিলাম, পঠিত ছড়াটির শেষ কটি লাইন ছিল এ রকম–

'ভাঙা ভাঙ্গির ভাগ, বাটোরা/চলছে খেলা চমৎকার/আফসোসে কি লাগবে জোড়া/ভাংগা শিশি, ছিন্ন হার।/ভারত দেখ ভাংগবে আরো/ভেংগে ভেংগে ছত্রখান/সেই সুদিনে উড়বে হাওয়ায়/শান্তি সুখের পত্রখান।'

লেখাটি শেষ করে ফেলেছিলাম। কিন্তু রবীন্দ্র নাথের ছোট গল্পের সংজ্ঞার মতো 'শেষ হইয়াও হইল না শেষ।' কারণ চ্যানেল আই-এর ধারাবাহিক নাটক 'গৃহগল্প' নাটকটি রচনা করেছেন তুখোড় নাট্যকার আবুল হায়াত। অভিনয়েও আছেন তিনি তার এই গল্পে নাটকে। দেখলাম অন্নদা শঙ্কর ম্যানিয়া এই নাটকেও। মনে হলো ভারত বিভক্তির দুঃখে চ্যানেল আই বেদনা বিদ্ধই নয় একেবারে শুল বিদ্ধ। এই নাটকের একটি দৃশ্যে (১৪/১১/০২ তারিখে প্রচারিত) বড় ভাই তার পঙ্গু বোনকে একটি বই উপহার দেয়। যথানিয়মে বইটি অন্নদা শঙ্করের ছড়া সংকলন। অন্নদা শঙ্করের উচ্ছ্বসিত

www.pathagar.com

প্রশংসায় পৃষ্ঠা উল্টতে উল্টাতে বড় ভাই ছোট বোনকে বলছে সূচীতে ছড়ার প্রথম লাইন লেখা আছে পড়লে মজা পাবি। কিন্তু গরজ বড় বালাই বড় ভাই নিজেই পড়া শুরু করলো 'তেলের শিশি ভাংগল বলে খুকুর পরে রাগ করো। তোমরা যে সব বুড়ো খোকা/ভারত ভেঙে ভাগ করো।' এতো ছড়া থাকতে বেছে বেছে এই বিশেষ ছড়াটি কেন? না দর্শকদের জানিয়ে দেয়া হলো ভারত ভাগাভাগিটা খুবই খারাপ কাজ হয়েছে। তাই ভারত আবার এক করে সেই খারাপের প্রায়শ্চিত্ত করা হোক। এবং অন্নদার আদর্শকে (?) প্রতিষ্ঠা করা হোক। আদর্শ (?) প্রচারের চমৎকার কৌশল আবিষ্কার করেছে নাট্যকর। আলামত দেখে মনে হচ্ছে ভাংগা ভারত জোড়া লাগানোর ঠিকাদারি এবার বর্তেছে চ্যানেল আই'র কর্তৃপক্ষ আর আবুল হায়াতের উপর? বলা বাহুল্য, বড় ভাইয়ের ভূমিকায় অভিনয় করেছিল শহিদুল ইসলাম সাচ্চু।

২০. ১২. ২০০২

www.pathagar.com

রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল বিতর্ক নবরূপে

মাত্র দশ এগার দিনের ব্যবধানে দুই মহাকবির জন্মবার্ষিকী। একজন রবীন্দ্রনাথ অন্যজন নজরুল। এরা দু'জনই বাংলা ভাষা সাহিত্যের গর্ব ও গরিমা। ২৫শে বৈশাখ রবীন্দ্রনাথ আর ১১ই জ্যৈষ্ঠ চিরবিদ্রোহী নজরুলের। বাংলাদেশের মানুষ কবি নজরুলকে তাদের জাতীয় কবির আসনে বরিত করেছে। স্মরণযোগ্য, নজরুল গত চল্লিশ দশকেই অবিভক্ত বাংলার জাতীয় কবি হিসেবে ঘোষিত হয়েছিলেন এক নাগরিক সংবর্ধনায়, কলকাতার এলবার্ট হলে। ঘোষক ছিলেন নেতাজী সুভাস বসু। কবি রবীন্দ্রনাথ তখন জীবিত। বাংলাদেশের মানুষের কাছে রবীন্দ্রনাথও প্রিয় কবি ব্যক্তিত্ব। তাঁর লেখা গান আমাদের জাতীয় সঙ্গীত। রণসঙ্গীত নজরুলের। তাই এরা দু'জনই কাছের মানুষ, দূরের নয়। যে জন্য বাংলাদেশে রবীন্দ্র-নজরুল উৎসবের আয়োজন হয় ফি বছর। সরকারীভাবে, বেসরকারী উদ্যোগেও। বিপরীতে ভারতীয় বাংলার চিত্র ভিন্ন রকম। রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত থাকলেও নজরুল থাকেন বরাবরের মতো অনুপস্থিত। বিশেষ করে সরকারী আয়োজনে। ছিটাফোটা বেসরকারী আয়োজনও থাকে উত্তাপহীন। এর প্রমাণ নজরুল প্রসঙ্গে সে দেশের পত্র-পত্রিকা আর ইলেক্ট্রনিক্স মিডিয়াগুলোর ব্যবহার। কলকাতার আনন্দবাজার গোষ্ঠীর পত্রিকা 'দেশ' প্রতিবছর রবীন্দ্রনাথের উপর বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করলেও নজরুলকে নিয়ে তাদের তেমন কোন উদ্যোগ নেই। এমনকি নজরুলের জন্ম-মৃত্যুর খবরটিও 'দেশ' কর্তৃপক্ষের জানা থাকে না। আসলে সাম্প্রদায়িক মনোভঙ্গির প্রাবল্যের কারণেই এরা এমনটি করে। নজরুল ব্যাপারে কেবল 'দেশ' নয় বাকিদের ব্যবহারও অভিন্ন।

পাকিস্তান যুগে নাকি নজরুলকে খণ্ড-বিখণ্ড দ্বিখণ্ড করা হয়েছিল। বাংলাদেশ আমলে নজরুলকে আমরা 'পূর্ণাঙ্গ' পেলাম। মুশকিল হলো প্রচারণাটি অনেক পুরানো, জং ধরা এবং সত্যের অপলাপ। এমন মতলববাজ কথা অনেকে অনেকভাবে বলেছেন। আসলে এদের কেউই কিন্তু নজরুলের সুহৃদ নন। সপ্তাখানেক আগে 'শিহাব সরকারের 'রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল' শিরোনামের একট লেখা পাঠ করেছিলাম 'দৈনিক আমার দেশ' পত্রিকায়। সে লেখায় আরো অনেক প্রসঙ্গের সাথে এ তথ্যটিও ছিলো।নজরুল তো সব সময়ই উন্মুক্ত। সাবেক আমলে নজরুলের কোন পাঠ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল এমনতো কখনো শোনা যায়নি। তাহলে খণ্ড-বিখণ্ডের প্রসঙ্গটি আসে কেন। (তবে হ্যাঁ ইংরেজ আমলে নজরুলের কিছু অংশ অপাঠ্য ঘোষিত হয়েছিল)। নজরুলের ইসলামী

www.pathagar.com

ও অন্য সঙ্গীতের তুলনায় শ্যামাসঙ্গীত আর কীর্তন তেমন প্রচারিত হতো না তখন। 'পূর্ণ' নজরুলপ্রেমীদের মূল তীরটি সেখানে। বর্তমানে শ্যামা-কীর্তনের অবস্থানটা কোথায় বাংলাদেশে? বারণ তো ছিলো না, এখনো নেই। নজরুল সৃষ্টির কতো শতাংশ এই শ্যামা আর কীর্তন!

নজরুল সম্পর্কে সে লেখায় একটি 'অশালীন' উক্তি, উক্তিটি এরকম 'জনশ্রুতি আছে পাকিস্তানকে নজরুল ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন 'ফাকিস্তান।' জনশ্রুতি আর বাস্তবতা কি এক? যে 'শ্রুতি' তথ্যভিত্তিক নয় তা প্রচার করাও অরুচিকর, বিশেষ করে নজরুলের মতো ব্যক্তিত্বের নামে। নজরুলের একটি লেখা আছে যার শিরোনাম 'আমার লীগ কংগ্রেস'। যা প্রকাশ পেয়েছিল 'দৈনিক নবযুগে' ১৯৪১ সালে। সে লেখায় মোহাম্মদ আলী জিন্নার নেতৃত্বের প্রতি নজরুল তাঁর অনুরাগ এবং বিশ্বাসকে উচ্চকিত করেছিলেন। নজরলের এ আচরণটিকে আমরা কোন 'শ্রুতিতে' আনব? বলা বাহুল্য, এর কয়েক মাস পরেই নজরুল অসুস্থ হয়ে পড়েন।

'অ্যাবসার্ড' আর 'সাম্প্রদায়িক' যে অভিধায়ই চিহ্নিত করা হোক সাতচল্লিশে ভারত বিভক্ত না হলে আজকের বাংলাদেশ ছিল দুঃস্বপ্ন। পাঞ্জাব, কাশ্মীর আর আসাম এর উজ্জ্বল উদাহরণ। শেরেবাংলা এবং সোহরাওয়ার্দী যে বৃহৎ বাংলার স্বপ্ন দেখেছিলেন এ স্বপ্নের পক্ষে মত দিয়েছিলেন জিন্নাহ। কিন্তু বর্ণহিন্দু আর নেহেরু গং এই উদ্যোগের বিপক্ষে অবস্থান নেয়। এটি ইতিহাসের পাঠ, অশ্লীল উক্তি নয়। যারা বঙ্গ রদে ভূমিকা রেখেছিল তারাই আবার বাংলা ভাঙ্গার প্রধান কারিগর হিসেবে উঠে এলো। এর সবটাই ছিল সাম্প্রদায়িক ঈর্ষা থেকে উদগত। সে সময় নজরুল সুস্থ থাকলে হয়তো 'জাতের নামে বজ্জাতির' মতো আরও একটি কবিতার জন্ম দিতেন। বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের কর্মকাণ্ডও গৌন ছিল না। ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের বিরোধিতায় কলকাতার হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের পাশে রবীন্দ্রনাথও যুক্ত ছিলেন। তাদের বক্তব্য ছিল ঢাকায় যখন 'এগ্রিকালচার' আছে সেখানে আর 'কালচারের' প্রয়োজন কি। অর্থাৎ কৃষকের সন্তানের শিক্ষাদীক্ষার কি দরকার। উপমহাদেশ ভাগের প্রশ্নটা কিন্তু এসেছিল এসব কারণেই।

শিহাব সরকার 'রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল' লেখাটা শুরু করেছলেন এভাবে, 'রবীন্দ্রনাথের লোকজন নজরুলকে বিষ খাইয়ে পাগল করেছে। নইলে নজরুলও নোবেল পুরস্কার পেতে পারতেন। কবি হিসেবে তিনি রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বড়।...বিষয়টি প্রায়ই আমাদের ধন্দে ফেলতো।' রবীন্দ্রনাথ তো নয়, তাঁর 'লোকজন'। রবীন্দ্রনাথ নজরুলকে কবি সম্বোধন করায় তার 'লোকজন' ক্ষেপে ছিল। রবীন্দ্রনাথের লেখায় এ সত্যের উল্লেখ আছে। এখন বুঝুন নজরুল সম্পর্কে প্রতিবেশী সমাজের মনোভাবখানা কেমন ছিল। 'বিষের' বিষয়টি যখন এসেছে এ ব্যাপারে কিছু বলা দরকার। নজরুল তখন এইচ এম ভিতে সংগীত রচনায় মগ্ন। কবির পানের আসক্তি ছিল প্রবল। কাড়ি কাড়ি পানের খিলি তাঁর সামনে এনে রাখা হতো। সেই পানের সাথেই নাকি মিশানো হতো ধুতরার বিষ। কে মল্লিক বহুবার নজরুলকে সতর্ক

www.pathagar.com

করেছিলেন এ বিষয়ে। কে মল্লিক অর্থাৎ মোহাম্মদ কাশেম, নজরুল সংগীতের এক দিকপাল, তিনি তাঁর আত্মজীবনীমূলক বইয়ে এ ঘটনাটির উল্লেখ করেছেন। বইটি প্রকাশ করেছে জাতীয় জাদুঘর। এমন ইঙ্গিত আরো কেউ কেউ করেছেন। 'জনশ্রুতির' সাথে এই 'শ্রুতিটির' কিন্তু তফাৎ অনেক।

সংগীতে নজরুল তুলনা রহিত, সুর বৈচিত্র্য আর বাণীর ভিন্নতায়। সংগীত গবেষক দিলীপ কুমার রায়ের মন্তব্য হলো 'আমি কাজী নজরুলকে সুরকার হিসেবে রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বড় মনে করি।' অতুল প্রসাদের মন্তব্যও ছিল এ রকম। গানের সংখ্যার দিক দিয়েও নজরুল শীর্ষে। এ পর্যন্ত নজরুলের সাড়ে তিন হাজার গান আবিষ্কৃত হয়েছে। গবেষকদের ধারণা নজরুলের গানের সংখ্যা চার হাজারের উপরে। নজরুলের সৃষ্টির পরিধি মাত্র বিশ থেকে বাইশ বছর। নজরুল সাহিত্য জুলুমবাজদের বিরুদ্ধে, স্বাধীনতার পক্ষে অর্থাৎ বৃটিশবিরোধী কাফেলায় তিনি ছিলেন অগ্রসেনানী। তাঁর কণ্ঠে ছিল মিলনের গান। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ তাঁর নজরকে অবেশিত করেনি কখনো। যে কারণে নজরুলের কবিতায় হিন্দু মিথের ব্যবহার অগণন। ইসলামী গান যেমন রচনা করেছেন শ্যামা-কির্তন রচনায়ও নজরুল ছিলেন স্বপ্রতিভ-সাবলিল। কবি নজরুলের এই ঔদার্যের কাছে রবীন্দ্রনাথ বড় বেশী অনুজ্জ্বল। এরপরও রবীন্দ্রনাথ আমাদের প্রিয় কবি, আপনজন।

নজরুলকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বসন্ত নাটকটি উৎসর্গ করেছিলেন। এটি একটি বড় খবর, আনন্দের সংবাদ। ধূমকেতু পত্রিকার জন্য আশীর্বাদ বাণী পাঠিয়েছিলেন, নজরুরের অনশন ভঙ্গের জন্যও অনুরোধ করে পত্র লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এই সবকটি কাজই নজরুলের প্রতি রবীন্দ্রনাথের স্নেহ ভালবাসার উজ্জ্বল উপমা। অন্য পিঠেও ঘটনা আছে। নজরুলের 'খুন শব্দ' ব্যবহার নিয়ে রবীন্দ্রনাথ যখন প্রায় 'খুনাখুনি' শুরু করলেন, নজরুল তাতে ভীষণ বিরক্ত হয়েছিলেন। এই বিরক্তির প্রকাশ ঘটেছিল নজরুলের 'বড়র পিরিতি বালির বাঁধ' লেখাটিতে। নজরুলের এই লেখাটি আবার নতুন করে পাঠ করা যেতে পারে।

আরো একটি সংবাদ, বিধান চন্দ্ররায় তখন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী। তিনি নাকি একটি গোপন সার্কুলার জারী করেছলেন প্রচার মাধ্যমগুলোর উদ্দেশ্যে। তাতে লেখা ছিল 'ডেস্ট্রয় অল দা ইসলামী সংস অব কাজী নজরুল।' এমন খবরে কমরেড মোজাফফর আহমদ বিচলিত হয়ে কবি আবদুল কাদিরকে পত্র লিখেছিলেন অতিসত্বর নজরুলের ইসলামী গানের রেকর্ডগুলো সংগ্রহ করার জন্য। মোজাফফর আহমদের পত্রটি নজরুল একাডেমী পত্রিকায় প্রকাশ পেয়েছিল। এই সংবাদে কাজী আবদুল অদুদও শংকা-আশংকা প্রকাশ করেছিলেন বলে জানা যায়। নজরুল বরাবরই ছিলেন বৃটিশ-হিন্দুর ষড়যন্ত্রের আওতায়। এমন ধারণা বোধ হয় অমূলক নয়।

ষাট দশকে আমরাও তো রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী পালন করেছি ঘটা করে। কই কোথাও বাধা এসেছে এমনতো শুনিনি? আর তখন নাকি নজরুলের ইসলামী গান নিয়ে মাতামাতি হতো। মুসলমানের দেশে তো এমনটা হওয়াই স্বাভাবিক। বাংলাদেশ

www.pathagar.com

আগেও মুসলিমগরিষ্ঠ দেশ ছিল, এখনো আছে। কলকাতায় শ্যামা সংগীত কীর্তন নিয়ে মাতামাতি করে। কই সেখানে তো কেউ এমন অবান্তর প্রশ্ন তুলে না। কারণ স্বাভাবিক আচরণ এমনই হওয়া উচিত। এমনই হয়।

বাংলাদেশের মানুষ সব সময়ই উদার। এই ঔদার্যের প্রকাশ তারা বরাবরই করে আসছে। তাই নজরুল যেমন আমাদের জাতীয় কবি, রবীন্দ্রনাথ অনাত্মীয় নন।

১১. ০৫. ০৫

www.pathagar.com

অবশেষে ইতিহাসের কপালে হাতুড়ী

সবাইকে সবকিছু জানতে হবে এমনতো কোন দিব্যি নেই। তাই হাজীগঞ্জে ঐতিহাসিক কোন দূর্গ আছে কি নেই সেসব খবর আমাদের প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের জানা না থাকলে তাতে অবাক হবারই বা কী আছে। মসনদে আলা ঈসা খাঁ ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট না নেপালের বিরোধী দলের নেতা প্রত্ন বিভাগের কর্তারা যদি এমন কোন বেমক্কা প্রশ্ন উলটা করেই বসতেন তাহলেই বা করার কী ছিল। করার থাকেই বা কী?

এ প্রসঙ্গে সাদেকুর রহমান এবং শেখ আবদুল মান্নানের একটি সচিত্র প্রতিবেদন পড়েছিলাম কদিন আগে, সংগ্রামে। সেখানেই উল্লেখ ছিল হাজীগঞ্জ দুর্গ এখন ইট-সুরকির দরে বিক্রি হচ্ছে। আরো জানা গেল হাজীগঞ্জ দূর্গের নাম আমাদের প্রত্ন বিভাগের তালিকায় নেই। তারা নাকি অবগত নন এমন কোন কিছুর অস্তিত্ব আমাদের দেশে আছে। এই প্রথম জানা হলো তাদের। হাজীগঞ্জের মতো সোনাকান্দায়ও ঈসা খাঁর দূর্গ আছে। ইদ্রাকপুরেও তিনি দূর্গ নির্মাণ করেছিলেন মোগলদের আক্রমন প্রতিহত করার জন্য। খিজিরপুরে ঈসা খাঁ কিছুদিন অবস্থান করেছিলেন। বর্তমানের নারায়ণগঞ্জই তৎকালে পরিচিত ছিল খিজিরপুর নামে। পরে তিনি সোনারগাঁওয়ে রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু হতাশার খবর হলো সেই সোনারগাঁওয়ে ঈসা খাঁ'র তেমন কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া মুশকিল। থাকলেও সেসব চিহ্নিত করে দেবার মতো কোন দাপ্তরিক আয়োজন নজরে আসে না। যা উচিত ছিল এবং আছে। এ দায়িত্ব কার, প্রত্ন বিভাগের না পর্যটনের? সোনারগাঁওয়ে স্থাপন করা হয়েছে লোকশিল্প জাদুঘর। ঘটা করে মেলাটেলাও বসানো হয় ফি বছর। গলাবাজী করেন নানান পেশার 'জীবী'রা। সোনারগাঁওয়ের আসল পরিচয় থাকে অন্ধকারে। প্রশ্ন হলো সোনারগাঁও কি লোকশিল্পের নগরী না ইতিহাসের নগরী। এ এলাকা ইতিহাস খ্যাত বেশকজন রাজা-বাদশার উত্থান-পতনের সাথে জড়িত। গিয়াসউদ্দিন আজমশাহ'র মত প্রজা হিতৈষি বিদ্যোৎসাহী বাদশাহর রাজধানী ছিল সোনারগাঁও, পরবর্তী সময় ঈসা খাঁর। শরফুদ্দিন আবু তাওয়ামার বিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি সোনারগাঁওই স্থাপিত হয়েছিল। এরপরও সেখানে ইতিহাস জাদুঘর গড়ে না তুলে করা হলো লোকশিল্প জাদুঘর। এ রকম আয়োজন কি ইতিহাসকে কবরস্থ করার মানসে? লোকশিল্প জাদুঘর প্রয়োজন নেই তেমন কিন্তু না। তবে ঘোড়ার আগে গাড়ী সুস্থ মস্তিষ্কের পরিচয় বহন করে না। স্মরণযোগ্য প্রায় তিন'শ বছর অবধি সোনারগাঁও ছিল রাজপুরুষদের বিচরণ ক্ষেত্র। বাংলার রাজধানী।

www.pathagar.com

বছর কয়েক আগে সোনারগাঁও গিয়েছিলাম। লোকশিল্প জাদুঘর পার হলে পানাম নগরী। পানাম নগরী বলতে এখন দু'সারিতে দাঁড়ানো পঞ্চাশ সাটখানা জীর্ণশীর্ণ দালান। অতীতে এ নগরীর দৈর্ঘ্য-প্রস্থ হয়তো আরো দীর্ঘ ছিলো। সংস্কারের অভাবে অধিকাংশ দালানাদি ধ্বংসের দরজায়। দালানগুলোর বয়স দেড়-দুশ' বছরের বেশী বলে মনে হলো না। সবগুলোতেই লোকজন বাস করছে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে। আশেপাশে আরো কিছু দালান-কোঠা আছে। তবে প্রশিক্ষিত গাইডের অভাবে সে সবের ইতিহাসের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা গেলনা। অনতিদূরে একটি দোতলা দালান দেখিয়ে স্থানীয় একজন বললেন, এটি ছিল ঈসাখাঁর টাকশাল। দালানখানির প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ ধ্বংস হয়ে গেছে। নির্মাণ শৈলী এবং ইটের আকার দেখে বুঝা যায়, এটি কয়েকশ' বছরের পুরানো। ঈসাখাঁর টাকশাল এটি নয়। কারণ, ঈসাখাঁ তার নামে কোন মুদ্রার প্রচলন করেননি। তবে এই দালান যে সোনারগাঁয়েরই ইতিহাসের একটি অংশ তা হয়তো অস্বীকারের উপায় নেই। আমাদেরই দায়িত্বহীনতা এবং অবহেলায় চির বিলুপ্তির দিকে অগ্রসর হচ্ছে এসব ইতিহাসের চিহ্নগুলো। এমন অবস্থা হয়তো দেশের অনেক স্থানেই বিরাজমান। যা কিনা আমাদের প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের নজরেই হয়তো নেই। এই খবরদারিত্বের অভাবে ভূমি দস্যুদের দখলে চলে যাচ্ছে অনেক ঐতিহাসিক স্থাপনা। জিঞ্জিরা প্রাসাদ এখনও উদ্ধার করা যায়নি। কোনদিন যাবে কিনা তাতেও সন্দেহের অবকাশ থেকেই যাচ্ছে। সোনারগাঁওয়ের ব্যাপারেও এমন সত্য প্রবল হয়ে উঠে আসে। প্রতাপশালী রাজা-বাদশার রাজধানীর গৌরবে-গৌরাবান্বিত হবার পরও তেমন কিছুরই অবশিষ্ট নেই সেখানে। এটি অবিশ্বাস্য বৈকি।

সোনারগাঁওয়ের অদূরেই মুগড়াপাড়া গ্রাম। সেখানে গিযাসউদ্দিন আজম শাহের কবর আছে। মুগড়াপাড়া প্রসিদ্ধ আরো একটি কারণে, তা হলো জগৎখ্যাত মসলিন সে গ্রামে তৈরি হতো। রাজধানীর অবস্থানটিও নাকি ছিল এ এলাকা জুড়ে।

মহাসড়ক থেকে অনেক ভিতরে সে কবর। রিকশা চড়ে গিয়েছিলাম সেখানে হতশ্রি এক সড়ক দিয়ে। যখন পৌঁছলাম তখন দুপুর বারটার মতো হবে। বেশ পরিপাটি করে সাজানো কবরটি। বড় কবরটি গিয়াসউদ্দিন আজম শাহর। পাশে একটি টিনের প্লেটে আজম শাহর সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে। চারপাশে আরো কতগুলো কবর রয়েছে। এদের কোন পরিচয় সেখানে নেই। থাকলে ভালো হতো। এর আগে যখন এখানে এসেছিলাম কবরগুলো এমন সুশ্রি অবস্থায় ছিলনা। বিশেষ করে আজম শাহর কবরটি ছিল কয়েক জাগায় ভাঙ্গা। কারুকাজ করা পাথর আলগা হয়ে পড়েছিল। বর্তমানে সংস্কারকৃত কবরটিতে সেই পাথরের অস্তিত্ব খুঁজে পেলাম না। মূল পাথরগুলো কোথায়। সংস্কারের জন্য প্রত্নতত্ত্ব বিভাগকে ধন্যবাদ। তবে কর্তৃপক্ষের বুঝা উচিত কেবল একটি টিনের নোটিশ টাংগিয়ে দিলেই সব দায়িত্ব শেষ হয় না। আগ্রহী দর্শনার্থীদের জানার তৃষ্ণা তাতে মিটে না। তাই এখানে প্রয়োজন প্রদর্শক। যিনি আগন্তুকদের প্রশ্নের উত্তর দেবেন। ইতিহাস বিবৃত করবেন। প্রয়োজনে দর্শনীয়ের বিনিময়ে এটা হতে পারে। সব দেশই এমনটা করে থাকে। দেশের আয়ের একটা উৎসও খুলবে এখান থেকে। যেমন আহসান মঞ্জিলে করা হয়েছে।

www.pathagar.com

আজম শাহর কবরের কয়েক গজ দূরেই একটি প্রাচীন মসজিদ। কোন কোন গবেষকের ধারণা এই মসজিদের পিছনেই ছিল সরফুদ্দিন আবু তাওয়ামার সেই ইতিহাসখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। কয়েক বছর আগেও নাকি প্রতিষ্ঠানটির ধ্বংসাবশেষের অস্তিত্ব ছিল। মাটি খুঁড়তেই ইট পাথর বেরিয়ে আসত। অসচেতনতার কারণে এসব এলাকায় এখন বসতি গড়ে উঠেছে। বিলীন হয়ে গেছে ইতিহাস। পাহাড়পুর আর ময়নামতিতে মাটি খুঁড়ে উদ্ধার করা হয়েছে বৌদ্ধ বিহার, ইতিহাসের এক স্বর্ণ খনি। অন্যদিকে আবু তাওয়ামার বিশ্ববিদ্যালয়ের খবর কেবল কাগজেই লেখা। আবিষ্কারের কোন উদ্যোগ নেই।

আমাদের সব আয়োজনই এখন ইতিহাস চাপা দেবার ব্যাকুলতা। মীরজুমলার কামানটিকে বারঘাটের পানি পান করানো শেষে এখন এমন এক জায়গায় লুকানো হয়েছে, যেখানে চোর-বদমাশদের বাজার। তাছাড়া কামানটির চারপাশ ঘিরে মল-মূত্র আর হেরোইনখোরদের উৎসব-আড্ডা। তত্ত্বতলাসির অভাবে এই ঐতিহাসিক কামানটির একখানা কড়া নাকি ইতিমধ্যে লোপাট হয়ে গেছে। আস্ত কামানটিই লোপাট হয়ে যাওয়াট তেমন কোন অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়, এ দেশে। এমন ঘটলে কর্তৃপক্ষ হয়তো ব্যাখ্যা দিয়ে বসবেন কোন কামান-টামান সেখানে ছিল, সে খবরতো আমাদের জানার বাইরে। তাছাড়া এই কামান দিয়ে যখন গোলাছোড়া সম্ভব নয় তা থাকা না থাকায় কি আসে যায়! ইতিহাসের খাতিরে এ কামানটিকে বাঁচানো প্রয়োজন। তাই ধ্বংসের আগে এখান থেকে এটি স্থানান্তর জরুরি। উসমানী হলের গেটে কামানটি অনায়াসে স্থাপন করা যায়। এখন প্রশ্ন হলো উদ্যোগ নেবে কে। ইতিহাস গবেষকরা এ বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকায় আসলে ব্যাপারটি সহজতর হবে বলে মনে হয়। এছাড়া কামানটি জীবিত রাখা দুঃসাধ্য হবে বৈকি। আর একটি দুঃসংবাদ হলো যে জায়গাটিতে কামানটি রাখা আছে সে জায়গার মালিকানা নিয়েও নাকি নানান ঘাপলা। জায়গার সাথে কামানটিকেও যদি কেউ মালিক বলে দাবি করে বসে তখন তো আর উপায় থাকবে না। কোর্ট-কাচারী করতে হবে। তাই সময় থাকতেই হুঁশে আসা ভালো।

দূর্গ হোক আর ঐতিহাসিক নগরী সোনারগাঁওই হোক, এসবের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারে কেবল সরকারী দফতরগুলোর উপর ভরসা করে থাকাটা সুবিবেচনার পরিচায়ক হবে না, ইতিহাস গবেষকদের দায়িত্ববোধ এবং ঐতিহ্যজ্ঞানকে জাগরুক রাখাটাও অতীব জরুরি এবং প্রয়োজন। আর তা না হলে হাজীগঞ্জ দুর্গের মতো ইতিহাসের মাথায় হাতুড়ী ব্যতীত অন্য কিছু অবশিষ্ট থাকবে না।

০৪-০৫-০৫

www.pathagar.com

শপ্তকের সাতকাহন

ইতিহাস সচেতন হওয়া ভালো। তবে সীমা অতিক্রম করলে তো মুশকিল। বক্তৃতা-ভাষণে ইতিহাস। লেখা-লেখিতে ইতিহাস। চীনারা নাকি অন্যের ইতিহাস জানার আগে নিজের ইতিহাসটা জেনে নেয় ভালোভাবেই। আমরা যে ইতিহাসের সিরিয়াস পাঠক হয়েছি আজকাল সেটাই বড় খবর এখন। প্রতিদিনকার খবরের কাগজে চোখ রাখলেও ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়। লক্ষণ যে ভালোর দিকে তা হয়তো বলাই বাহুল্য। প্রীতিলতা সংক্রান্ত একটি লেখা পাঠ কের এমন ধারণা আরো দৃঢ় হয়েছে।

প্রীতিলতার প্রতি প্রীত হয়ে তার নামে একটি ছাত্রীবাসের নামকরণ করেছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যারয় কর্তৃপক্ষ। এই নামকরণের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে ইতিমধ্যে। প্রশ্ন তুলেছেন দেশের স্বাধীনতাপ্রিয় মানুষ। ইতিহাস জ্ঞান-সম্পন্ন নাগরিকবৃন্দ। অবশ্য সঠিক ইতিহাস আর বেঠিক ইতিহাস নিয়ে তর্ক-বিতর্ক চলছে দেশে অনেক দিন থেকেই। সভা-সেমিনারে বক্তৃতা ভাষণে নানান কাহিনী শুনে গোলক ধাঁধায় পড়ছে আমজনতা। কোনটা যে স্বীকৃত আর কোনটা যে বিকৃত বুঝতে কষ্ট হচ্ছে প্রায়শই। কষ্ট হবে না কেন পাঠ্যপুস্তক থেকে তো ইতিহাসকে নির্বাসন দিয়েছি সেই কবেই। ইতিহাসের নামে যা রাখা হয়েছে তাতো ইতিহাসের কংকাল। কংকাল দেখে তো আর সঠিক মানুষটা আবিষ্কার করা যায় না। তাই যে যা বলছে সেটাকে কেউ কেউ সঠিক ভাবছে, ইতিহাস ভাবছে। সূর্যসেন-প্রীতিলতাদের বিষয়টিও গোলক ধাঁধাঁ রূপেই উপস্থাপিত হচ্ছে দেশবাসীর সামনে। সূর্য সেন-প্রীতিলতাদের বাংলাদেশের স্বাধিকার আন্দোলনের বীর সেনানী বানাবার কসরত করে আসছে একটা শ্রেণী। এই কসরতেরই ফল সূর্যসেন আর প্রীতিলতার নামে নামকরণের বিতর্কিত সিদ্ধান্তগুলো। প্রীতিলতার নাম ইতিহাসে আছে সন্দেহ নেই। প্রীতিলতা দেশের জন্য যুদ্ধ করেছে সে খবরও মিথ্যা নয়। কিন্তু প্রশ্ন হলো, তাদের সংগ্রাম-আত্মবলীর প্রেক্ষিতটা কি। তারা কাদের স্বার্থে এবং কোন দেশের স্বাধীনতা চেয়েছিল?

প্রীতিলতা ঐতিহাসিক চরিত্র একথা কেউ অস্বীকার করে না। প্রীতিলতা দেশের জন্য যুদ্ধ করেছে সেই তথ্যও সঠিক্। প্রীতিলতা-সূর্যসেনদের স্বপ্নের দেশ কি আমাদের বাংলাদেশ? তারা তো আন্দোলন করেছিল বৃহৎ ভারতের স্বাধীনতার লক্ষ্যে। সেই বৃহৎ ভারতে বাংলাদেশের স্থানটা কোথায় থাকতো? সদয় অবগতির জন্য বলছি সূর্যসেন চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুট করে সেস্থানে যে পতাকা উত্তোলন করেছল সে পতাকা ছিল সর্বভারতীয় কংগ্রেসের। স্বাধীন বাংলার নয়। তাদের শ্লোগান ছিল 'বন্দেমাতরম।'

www.pathagar.com

স্মরণযোগ্য, সূর্যসেন ছিল সর্বভারতীয় কংগ্রেসের চট্টগ্রাম শাখার সভাপতি। প্রীতলতা তাদেরই একজন। চট্টগ্রাম শহরের নন্দনকানন উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রী প্রীতিলতার পিতা জগদ্বন্ধু স্থানীয় পৌরসভার একজন কর্মচারী ছিলেন। ইতিহাস বলে প্রীতিলতা নেত্রীত্ব পেয়েছিল চট্টগ্রামের ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণের। সেই ক্লাবে ইংরেজ অফিসার আমোদ-ফূর্তিরত অবস্থায় আক্রান্ত হয়েছিল। বিপ্লবীদের বোমা হামলাকে তারা প্রতিরোধ করেছিল কাপ-পিরিচ আর বাসন-পত্র প্রীতিলতাদের প্রতি নিক্ষেপ করে। সেখানে নিহত হয়েছিল তেরজন আর আহত হয়েছিল আঠারজন। অভিযান পরিচালিত হয় ২৪শে সেপ্টেম্বর রাত দশটায়। প্রীতিলতারা গিয়েছিল মুসলমান শ্রমিকের বেশ ধরে। বলাবাহুল্য প্রীতিলতার সফল আক্রমণের পর তার সহযোদ্ধাদের স্থান ত্যাগ করতে আদেশ দিয়ে নিজে পটাসিয়াম সায়ানাইড খেয়ে আত্মহত্যা করে, পালানোর সবরকম সুযোগ থাকা সত্ত্বেও। প্রীতিলতার এই অপ্রত্যাশিত আত্মহত্যার কারণ এখনো রহস্যঘেরা। ইতিহাসে আরো অনেক কিছুই আছে। সূর্যসেন-প্রীতিলতারা কালীমূর্তিকে সাক্ষী রেখে শপথ নিত। অন্য সম্প্রদায়ের লোকদের বিশ্বাস করতো না। তাদের স্বপ্ন ছিল শিবাজীর হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন। বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে চিন্তা করলে তো প্রীতিলতাদের আন্দোলন ছিল বাংলাদেশ বিরোধী আন্দোলন। তারা বর্তমান বাংলাদেশের সীমানা স্বাধীনতায় ছিল অবিশ্বাসী-বিপক্ষে। সঠিক ইতিহাস মানলে যথার্থই বলতে হয়, সূর্যসেন-প্রীতিলতা বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমের বিরোধী শক্তি।

স্বীকৃতই হোক আর বিকৃতই হোক ইতিহাসের চর্চা হওয়া ভালো। তাতে আসল ইতিহাস মানুষ জেনে যায়। আশার কথা বাংলাদেশে ইতিহাস চর্চা বেশ জোরেশোরেই চলছে ইদানীং। লেখালেখি দেখে তেমনি মনে হয়। তবে প্রীতিলতার ডাক নাম রানী ছিল না বানী ছিল সেটা কোন তথ্য নয়। প্রীতিলতা স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেছিল সেটাও কোন জানার বিষয় নয়। জানার বিষয় হলো প্রীতিলতার সংগ্রাম বাংলাদেশের মানুষের স্বার্থবিরোধী না পক্ষে ছিল।

২৯. ১০. ৯৬

www.pathagar.com

'লাল শাড়ী'র জামেদ আলী

কথাশিল্পী জামেদ আলী তাঁর অসমাপ্ত গল্পটি শেষ করার সময় পেয়েছিলেন কি না জানি না। শিরোনামহীন গল্পটি পাঠ করে শুনিয়ে ছিলেন বাংলা সাহিত্য পরিষদের প্রীতি সম্মিলনীতে। তাঁর কৈফিয়ত ছিল ইদানীং সময়ের প্রচন্ড অভাব। তাই গল্পটি শেষ করতে পারিনি, শিরোনামও ঠিক করিনি। অসমাপ্ত গল্পটি আমরা প্রচুর আগ্রহ নিয়ে উপভোগ করেছিলাম। বলার ভংগি জামেদ আলীর বরাবরই চমৎকার। সেদিনও বিষয় উপস্থাপনের কৌশল আর ভাষার চমৎকারিত্ব আমাদেরকে মুগ্ধ করেছিল। গল্পের কুশিলবরা এতটাই জীবন ঘনিষ্ঠ ছিল যে, পাঠের সময় মনে হচ্ছিল এরা প্রত্যেকেই আমাদের চিরচেনা, আমারই গ্রামের লোকজন প্রতিবেশী। একজন লেখকের সার্থকতা এখানেই। পাঠককে আপন চিন্তার বশ্যতায় রাখা। জামেদ আলীর সে ক্ষমতা ছিল পুরোপুরি। সে দিন সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি একসাথে ছিলাম, গল্পে আড্ডায়। এক সঙ্গেই ফিরেছিলাম অফিস পর্যন্ত। তারপর দু'জনার দুটি পথ। আমি সংগ্রামে আর তিনি তার গন্তব্যে। এই ছিল শেষ সাক্ষাত। ভাবতে পারিনি এটিই চিরজীবনের ছাড়াছাড়ি, জামেদ ভাই আর আমার।

পত্রিকায় জামেদ ভাইয়ের ইন্তেকালের খবর দেখলাম ছবি সমেত। অবিশ্বাস্য মনে হয়েছিল। পা থেকে মাথা পর্যন্ত বার কয়েক কেঁপে উঠল। প্রথমে ধারণা হয়েছিল কোন পুরস্কারের খবর হয়তো, জামেদ আলীর সাহিত্য স্বীকৃতির। কিন্তু না, এ খবর তাঁর জীবনের স্বীকৃতির। পাঠক নন্দিত, হাস্য উজ্জ্বল জামেদ আলী নির্বাক, স্পন্দনহীন এমন কথা ভাবতেই যেন অবাক লাগে। মাঝেমধ্যেই তিনি আমাদের দফতরে আসতেন। হাসি-তামাসায় কাটত তখন। আড্ডা জমতো, সমকালীন সাহিত্য, রাজনীতি, ধর্ম কোনটাই বাদ পড়তো না আলাপচারিতার বিষয় থেকে। তাঁর সাথে আমার প্রথম পরিচয় একাশি সনের গোড়ার দিকে। তিনি এতটাই সজ্জন ছিলেন যে, প্রথম সাক্ষাতেই আমাকে আপন করে নিয়েছিলেন। যদিও আমার আর জামেদ ভাইয়ের বয়সের ব্যবধান অনেক। কিন্তু সে বয়স কোন ফ্যাক্টর হয়নি আমাদের বন্ধুত্বে, আনন্দে-উল্লাসে। সৃষ্টিশীল ব্যক্তিরা বুঝি এমনি হয়। সারল্যে ভরপুর থাকে তাদের জীবন। কথাশিল্পী জামেদ আলী যে তাদেরই একজন এ উচ্চারণ দ্বিধাহীনচিত্তেই করা যায় বৈ কি। তাঁর এই ধপ করে নিভে যাওয়া একটি ফলবান বৃক্ষের অকালে ভূপাতিত হবার মতোই মনে হচ্ছে।

জামেদ আলীর উল্লেখযোগ্য প্রকাশিত উপন্যাস 'লাল শাড়ী'। সম্ভবত দীপ্তিময় প্রকাশনাও। এই উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ পেয়েছিল সংগ্রামের সাহিত্য পাতায়। তখন থেকেই আমার আর তাঁর ঘনিষ্ঠতা। কম করে হলেও সপ্তায় আমরা দু'দিন মুখোমুখি হয়েছি। এক বছরেরও বেশী সময়ব্যাপী লাল শাড়ী উপন্যাসটি সংগ্রাম

www.pathagar.com

সাহিত্যকে উজ্জ্বল কের রেখেছিল। উপন্যাসটির কারণে প্রচুর পাঠকপ্রিয়তাও পেয়েছিল পৃষ্ঠাটি। তখনই লক্ষ্য করেছি তিনি তার পাঠকদের কতটা ভালবাসতেন। কোন কারণবশত লাল শাড়ী প্রকাশ না পেলে পাঠকরা পত্র লিখত, কৈফিয়ত তলব করতো। তখন দেখতাম সংগ্রামে এসে কি আগ্রহে চিঠিগুলো পাঠ করতেন। তাঁর উপন্যাস লোকে পড়ছে, উদ্দীপ্ত হচ্ছে এই খবর জেনে আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠতেন। স্মরণযোগ্য যে, এই লালশাড়ী উপন্যাসটিই জামেদ আলীকে বাংলা সাহিত্যের আঙ্গিনায় জীবন্ত করে রাখবে। বলা প্রয়োজন, এই উপন্যাসটিই তাঁর খ্যাতির সীমাকে বিস্তৃত করেছে অনেক। লেখক নিজেও এ সত্যটি স্বীকার করতেন। আদতে লালশাড়ি উপন্যাসটি আমাদের ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতারই স্মারক। নজিবর রহমান সাহিত্যরত্নরা যে ধারা এবং সত্যকে লালন করতেন কথাশিল্প জামেদ আলী সেই ধারাকেই বহন করেছেন তাঁর সাহিত্য সাধনায়, মননে-মেধায়। তবে জামেদ আলীর বিষয় উপস্থাপন আর ভাষার লালিত্য ছিল ভিন্ন। আধুনিকতায় উদ্দীপ্ত, সমৃদ্ধ। তাঁর পরবর্তী লেখাগুলো এ সত্যকেই ঘোষণা দেয়।

আমি তখন গুলবাগে থাকি। জামেদ ভাই দু' একদিন পর পর আমার বাসায় আসেন। দীর্ঘ সময় ধরে চলে লাল শাড়ী উপন্যাসের পান্ডুলিপি পাঠ আর মাঝেমধ্যে বিভিন্ন পরিচ্ছদের সংযোজন-বিয়োজন। সে সময়ই প্রথম উপলব্ধি করলাম কত উদার আর চমৎকার মানুষ জামেদ ভাই। যেদিন লাল শাড়ীর প্রথম কিস্তি প্রকাশ পেয়েছিল সেদিন বিকেলে বাসায় এসে হাজির। হাতে ঢাউস এক মিষ্টির পোটলা। জামেদ ভাইকে প্রশ্ন করলাম ব্যাপার কি এত মিষ্ট? হাসতে হাসতে বললাম কার বিয়ে? জামেদ ভাইও ঝট করে উত্তর করলেন। আমার। জীবনের এই প্রথম উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ পাচ্ছে পত্রিকায়–বিয়ের চেয়ে কম কিসে। বলেই হেসে ফেলেছিলেন। পরে জেনেছিলাম এ খুশীতে নাকি তিনি বন্ধু-বান্ধবদের মিষ্টিমুখ করিয়েছিলেন। আকণ্ঠ সাহিত্য পাগল না হলে এমনটা অসম্ভব। লালশাড়ী উপন্যাসটি তিনি আমাকে উৎসর্গ করেছেন। এটি আমার জন্য দুর্লভ সম্মান। জামেদ ভাইয়ের এই স্নেহ, এই প্রীতি তার হৃদয়ের প্রশস্ততাকেই চিহ্নিত করে।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন একজন হোমিওপ্যাথ ডাক্তার। তিনি পেশায় ডাক্তার হলে নেশায় ছিলেন আপাদমস্তক সাহিত্যিক। বহুবার দেখেছি; রোগী দেখার ফাঁকে ফাঁকে তিনি তার সৃষ্টির পরিমার্জন করছেন। ইদানীং তিনি কম লিখতেন। কারণ এই পোড়া দেশে শুধু লিখে ভাত জোগাড় হয় না। তাই তিনি তাঁর পেশায় মোনযোগী হয়েছিলেন। অবশ্য আলগা হয়ে থাকেননি পুরাপুরি সাহিত্য আড্ডা থেকে। প্রায় সাহিত্য সভায়ই জামেদ ভাইয়ের উপস্থিতি ছিল আলোড়নযোগ্য। যেখানেই জামেদ আলী সেখানেই একটা আনন্দ-উল্লাসের প্রস্রবণ উন্মোচিত হতো। জামেদ আলীর মত বাংলা সাহিত্যের আর এক দিকপাল লুৎফর রহমান পেশায় ছিলেন হোমিওপ্যাত ডাক্তার। শুনেছি মোতাহার হোসেন চৌধুরীও নাকি ডাক্তারী করতেন। পেশায় ছিলেন হোমিওপ্যাথ।

তিনি চলে যাবেন সেদিন কিন্তু তাঁর চেহারায়, কথায় বা চোখের তারায় কোথাও আগাম খবর ঝুলে থাকেনি। তবু তিনি চলে গেলেন হঠাৎ। সত্য সন্ধানী লোকদের শেষ যাত্রার দৃশ্যটা নাকি এমনই হয়।

২৪. ১০. ৯৫

www.pathagar.com

আমাদের সৃষ্টিশীলতা ও প্রকাশ সংকট

কদিন আগে এক তরুণ কবি এসেছিলেন দফতরে। দু-একখানা কাব্য প্রকাশ পেয়েছে তার। মোটামুটি লিখেন। লেখালেখির সেই সুবাদেই কবির সাথে পরিচয়। কুশল বিনিময়ের পর তার হাতের সুন্দর বই এর প্রতি আমার নজর গেল। চাইতেই তিনি আমাকে দিলেন। কিন্তু না, এটি কোন বই নয়, একখানি সাহিত্যপত্র। অফসেট কাগজে ছাপা সূচিপত্রের শিরোনাম পাঠ করে মনে হলো লেখাগুলোও গুরুত্বপূর্ণ। সাহিত্যপত্রটি বেশ স্বাস্থ্যবানও বটে। ঢাকা থেকে প্রকাশিত এমন সুন্দর পত্র-পত্রিকা ইদানীং দেখা যায় না। কাগজের অভাব। পাওয়া গেলেও তা থাকে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। ছাপা খরচও এমন এক পর্যায়ে গিয়ে ঠেকেছে যা রীতিমত ভীতিপ্রদ। সাহস থাকলেও সাধ্যে কুলায় না। আসলে বাংলাদেশের গোটা প্রকাশনা জগতই অস্বস্তিময় অবস্থাকে অতিক্রম করছে।

কদিন আগেও বাংলাদেশের প্রকাশনা জগতের মুমূর্ষু দশা নিয়ে কথা বলেছেন, লিখেছেন অনেকে। ইদানীং তাও নেই। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় প্রকাশনা জগত এখন হালভাংগা ডিঙ্গির মত যেন পানিতে ঘুরছে– তীর পাচ্ছে না। আর তীরের সন্ধান দেবে এমন সুহৃদও নেই। প্রকাশনার উপায়-উপকরণের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি মূলত সৃজনশীলতাকে হত্যা করারই শামিল। কিন্তু এই সহজ বোধটুকুও আমাদের মুরুব্বি তথা দেশ কর্তাদের নেই। একজন লেখক যদি তার সৃজনীশক্তিকে বা সৃষ্টিশীলতাকে প্রকাশ না করতে পারেন, কাগজের অভাবে, প্রকাশনার দূরবস্থার কারণে তবে একটি স্বাধীন দেশের স্বাধীন মানুষের বেদনার আর কি বাকি থাকে। এদেশে সৃষ্টিশীল লেখক নেই তা নয়, আছে, প্রচুর পরিমাণেই আছে। আমরা তাদের পরিচর্যা করতে যেমন ব্যর্থ পাশাপাশি পরিচর্যায়ও অপারগতার চিহ্ন রেখে যাচ্ছি প্রতি পদে। যে কোন মহত কাজের চাই উপযুক্ত পরিবেশ। আমরা সেই পরিবেশ তৈরী করতে পারছি না। আর পারছি না বলেই হীনমন্যতা আমাদের গ্রাস করছে পলে পলে। ঘর রেখে পরের প্রতি অহেতুক মমতা এর একটি উজ্জ্বল উদাহরণ। যে কারণে বাংলাদেশের প্রকাশনা বাজার বিদেশের দখলে। এজন্য আমাদের লজ্জাবোধও নেই। কর্তৃপক্ষের যেমন নেই শিক্ষিতজনদেরও লজ্জা নামক অনুভূতিটি নিষ্ক্রিয় এখন। এই নিষ্ক্রিয়তা ভবিষ্যৎকে বিশেষ করে শিল্প-সাহিত্যের ভবিষ্যৎকে বন্ধ্যাত্বের হাতে তুলে দেবার প্রতিই ইংগিত করে। লক্ষণ অবশ্য শুরু হয়ে গেছে। যতই উচ্চ বাক্য উক্ত হোক না কেন গত দুই

www.pathagar.com

যুগেও এমন কোন সাহিত্য-শিল্প সৃষ্টি করতে পারিনি আমরা যা কি না উল্লেখের দাবী রাখে। এটি অতিকথন নয়, স্বাভাবিক উচ্চারণ, সত্যভাষণ। যে কয়জন দৃষ্টিনন্দন শিল্পী-সাহিত্যিক সক্রিয় আজ অবধি, তাদের প্রায় সবার এই ভিত সাবেক আমলে তৈরী। স্বাধীনতা উত্তর সময়ের কর্মকান্ডের অধিকাংশই দ্বিধাদ্বন্দ্বের চোরাবালিতে হোঁচট খাচ্ছে। কারণ এরা উদ্দেশ্যহীনতার খাঁচায় আটকা। এই উদ্দেশ্যহীনতার সাথে যুক্ত হয়েছে বর্তমান অশৈল্পিক পরিবেশ।

পত্রিকা যে প্রকাশ পায় না তা নয়। প্রচুর সাময়িকী আছে বাজারে। আসলে এগুলো নিছকই বাজারি। সৃজনী সত্তার পরিচয় এগুলোতে থাকে না। সস্তা রাজনীতিই এই পত্রিকাগুলোর প্রাণ। রাজনীতি খেলা খেলতে গিয়েই আমরা আমাদের সৃষ্টিশীল মেধার অপচয় করছি। আজকাল যে কোন সাময়িকী প্রকাশ পেলেই সেখানে রাজনীতি চর্চা শুরু হয়ে যায়। সৃজনশল লেখা পত্রস্থ হয় না। বিপুলসংখ্যক পাঠকও তা চায় না। চায় না কারণ চাওয়ার মত পরিবেশ তৈরী করতে পারিনি আমরা। কি করে হবে! অনেক সৃষ্টিশীল লেখককে দেখি এসব সাময়িকীতে রাজনৈতিক কলাম লেখেন, অর্থের বিনিময়ে। যে মেধা তিনি ব্যয় করছেন রাজনৈতিক কড়চা লিখে সেই একই মেধা একই সময় ব্যয় করে একটি সুন্দর শিল্পীত সৃষ্টিশীল রচনা তৈরী করতে পারতেন। ইদানীং যা লেখা বলে উঠে আসছে, তার সিংহভাগই ব্যবসায়িক নিবন্ধ পাদবাচ্য। সাময়িক পত্রগুলোও ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য সঞ্জাত। কথায় বলে ফাঁদ পাতা পদে পদে। সাময়িক পত্র নামক পত্রিকাগুলোও যে সেই জাতীয় কোন ফাঁদ নয় এ দেশের মেধা ধ্বংসের, তা কি করে বিশ্বাস করি? পাঠকের রুচি তৈরী করে লেখক-পত্রিকা। আমাদের লেখক-পত্রিকাগুলো পাঠককুলের সুরুচির পরিবর্তে কুরুচিকেই উচ্চকিত করছে আজকাল। তাই প্রকাশনার সংকট সাহিত্য জগতে প্রকট হলেও এখানে অনুপস্থিত। ষড়যন্ত্রের আশংকাটা এ কারণেই। তখনো পত্রিকাটি হাতে ধরা ছিল। কবির চোখে চোখ রেখেই পাতা উল্টাচ্ছিলাম। শেষ প্রান্তে এসে হোঁচট খেলাম। পাঁচখানা স্কেচ। এর সবগুলোই বিবসনা রমণীর। বিভিন্ন ভংগিতে উপস্থাপিত হয়েছে সে সব রমণীয় শরীর। নামকরা সব আঁকিয়েরা এসব এঁকেছেন। আমার মন্তব্যের আগেই কবিটি বল, কি অদ্ভুত শিল্প। আমি বললাম, ছবিগুলো অদ্ভুত তো বটেই। তবে সব সৌন্দর্যই সর্বাবস্থায় প্রকাশযোগ্য কি না তা অবশ্য ভাবার বিষয়। অন্ধকারে যা সুন্দর তা আলোতে আনলে সেই সুন্দর অসুন্দরকেই যে স্পর্শ করবে না তার নিশ্চয়তা কি আমরা দিতে পারি? এই যেমন স্কেচগুলো যত শিল্পিতই হোক না কেন যে কোন রুচিবান ব্যক্তির শালীনতাবোধে আঘাত করতে বাধ্য। সে পুরুষ-কি নারী। রুচিবোধে পার্থক্য থাকা স্বাভাবিক। তবে চিরন্তন অর্থাৎ শালীন মনোভঙ্গি বলে একটা মাত্রা আছে।

সাহিত্যেও এমন ঘটনার অভাব নেই। নারীর শরীরকে নানা ভঙ্গিতে উপস্থাপন করে বলা হয় এটি শিল্প। যৌনকাতরতা আর নারীর সৌন্দর্য যে এক নয় এ কথা এ গোত্রের সাহিত্যিকরা বুঝতে চান না। তাদের ধারণা বদলেয়ার বা লেজবিয়ান স্টাইলে

www.pathagar.com

সাহিত্যে নারীকে টেনে এনে তারা ভিন্ন একটি দর্শনের জন্ম দিচ্ছেন। দর্শনের পরিবর্তে এসব যে আদতে কুদর্শনের সাড়িতে চলে যাচ্ছে এ বোধটুকু তাদেরকে কে দেবে। কোন মহৎ শিল্প-সাহিত্যই অশালীন অবয়বকে ধারণ করে উঠে আসেনি। আগামীতেও উঠে আসবে এমন ভরসাও নেই। যদি সভ্যতা ভব্যতা বলে কিছু অবশিষ্ট পৃথিবীতে থাকে। রবীন্দ্র-নজরুল সাহিত্যের দিকে দৃষ্টি দিলেও দেখা যায় সেখানে নারীর অভাব নেই। কিন্তু সে নারী শালীন। শোভন। তথাকথিত বড় সাহিত্যিকদের উপস্থাপিত বিবসনা বেআব্রু নয়। আসলে তো সাহিত্য মানুষের সুরুচিকে জাগ্রত করার জন্যই। কুরুচির চারা রোপণের জন্য নয়। তরুণ কবিটি কথাগুলো গিলছিল। কোন উত্তর করলো না। এক প্রকার নিঃশব্দেই পত্রিকাটি আমার হাত থেকে নিয়ে স্থান ত্যাগ করলো।

২৫. ৭. ৯৫

www.pathagar.com

সিরাজ-উদ্-দৌলা এবং বিভ্রান্ত ইতিহাস

কলকাতার দেশ পত্রিকা তাদের সম্পাদকীয়র এক জায়গায় লিখছে 'সিরাজকে গৌরবান্বিত করার জন্য ইতিহাসের এমন বিকৃতি ঘটানো হচ্ছে যা কহতব্য নয়। এখন আমরা অনেক দিন স্বাধীন হয়েছি, এখন নিরপেক্ষভাবে ইতিহাস চর্চা করাই সঙ্গত এবং তা করতে গেলে ওই বুদ্ধিহীন, দুশ্চরিত্র তরুণ নবাবটির নাম যত আড়াল রাখা যায় ততই মঙ্গল (২৭ আগস্ট '৯৪)। সিরাজকে আড়াল থেকে আলোতে আনতে গেলে অমঙ্গল আশংকা স্বাভাবিক। কারণ এতে করে কেঁচো খুঁজতে অজগর বেরিয়ে পড়তে পারে। জগৎশেঠ গংদের চক্রান্তের দলিল খোলাসা হয়ে যাবারই সম্ভাবনা বেশী। বলাবাহুল্য কলকাতার দেশ পত্রিকা মূলত ঐ চক্রান্তকারীদেরই সার্থক উত্তরসূরী। যে জন্য সিরাজ-পলাশী ইত্যাকার নামগুলো আড়াল রাখা নিজেদের মঙ্গলের জন্যই প্রয়োজন। হয়তো এই প্রয়োজনের খাতিরেই পরবর্তী আর এক সংখ্যায় ফরমায়েশী দুটি চিঠি ছাপিয়ে আপন মতামতকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছে দেশ। এ কর্মটিও তাদের পুরনো অভ্যাস, স্বভাবও বলা যায়। প্রথম চিঠিটি লেখানো হয়েছে কলকাতার দিলীপ কুমার বিশ্বাসকে দিয়ে। আর দ্বিতীয়টির মোসাফিদা করেন কলকাতার উৎপল চৌধুরী। দিলীপ বাবু তার দীর্ঘ চিঠিতে সিরাজের গুণ কীর্তন গাইতে গাইতে এক জায়গায় লিখছেন, 'সে যুগের সিরাজ-উদ-দৌলা নাটকের সিরাজ আর ইতিহাসের সিরাজ এক নন। ইতিহাসের সিরাজ এতই অপরিণত অপদার্থ ও অযোগ্য এক ব্যক্তিত্ব যে, তিনি আমাদের মনে কোনবিধ প্রেরণা জাগাতে অক্ষম।'

দ্বিতীয় পত্রটিতেও ইতিহাস জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে উৎপল চৌধুরী বলছেন, 'সিরাজ-উদ-দৌলা যে একজন অত্যাচারী অস্থিরচিত্ত দুর্বিনীত, নারী লোভী ও প্রজাপীড়ক নবাব ছিলেন এ কথা ঐতিহাসিকেরা বলেছেন। উভয় চিঠিই ছাপা হয়েছে একই সনের নভেম্বর সংখ্যায়।

আসলে সিরাজ সংক্রান্ত ব্যাপারে দিলীপ বাবুদের ইতিহাস বরাবরই এ ধরনের। তাই দেশ পত্রিকায় সম্পাদকীয় বা চিঠিপত্র নতুন কোন বিস্ময় সৃষ্টি করেনি। যে ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্রাসাগরের উদার চেতা মানুষ হিসেবে পরিচিতি ব্যাপক, নবাব সিরাজ সম্পর্কে তার উক্তিও উচ্চরণ যোগ্য নয়। তাই বাবুদের নিরপেক্ষ ইতিহাস প্রসঙ্গ আলোচনা অবান্তর। কারণ নবাব সিরাজের উত্থান-পতন পলাশীর যুদ্ধ, আর জগৎশেঠদের চক্রান্ত এতই বহুল আলোচিত বিষয় যে, এসবের পুনরোল্লেখ বা পুনর্বিবেচনা সময়ের অপচয় মাত্র। সত্যকে মিথ্যা আর মিথ্যাকে সত্য বানানোর ট্রেডিশন 'দেশ' ওয়ালাদের নতুন

www.pathagar.com

নয়। 'অশ্বত্থনামা হত, ইতিগজঃ' এ জাতীয় সত্য বলার কৌশল দিলীপ বাবুদের শাস্ত্রীয় উদাহরণ। যা কিনা সভ্য সমাজে প্রতারণা বলেই চিহ্নিত। তাই তাদের লিখিত ইতিহাস ঐ শাস্ত্রীয় গুণেই গুণান্বিত হবে বৈ কি।

যেমন পলাশীর পতনের একশ বছর পর অর্থাৎ আটারশ সাতান্ন সালে সিপাহী বিপ্লব সংঘটিত হয় আর এই বিপ্লবের অগ্রসেনানী ছিল সিরাজেরই উত্তরসূরীরা। এটি ইংরেজ বিতাড়নের প্রথম বৃহত্তম প্রচেষ্টা। বাহাদুর শাহ জাফর ছিলেন এই বিপ্লবের নেতৃত্বে। কিন্তু বাবু ঐতিহাসিকরা এখন বলছেন কোথাকার কোন মঙ্গল পান্ডে নাকি প্রথম ওলী নিক্ষেপ করে এই বিপ্লবের সূচনা করে। ভাবখানা এমন এদেশ থেকে ইংরেজ তাড়ানোর 'মহানায়ক' সেতো মঙ্গল পান্ডেরাই। আর আমাদের সন্তানদেরকেও সেই ইতিহাসেই পড়ানো হচ্ছে যাচাই বাছাই ব্যতিরেকেই। একদিকে বলা হচ্ছে মঙ্গল পান্ডের শৌর্যবীর্যের কথা আর অন্যদিকে কবি ঈশ্বর গুপ্ত তার সংবাদ প্রভাকরে লিখছেন 'আমরা বাঙালীরা ভাত মাছ খাই, অস্ত্র ধারণ করা দূরের কথা নাম শুনলেই আমাদের গাত্র কম্পিত হয়। এ সকল দুষ্কৃতকারী যবনদের কাজ।'

কবি ঈশ্বর গুপ্ত সিপাহী বিপ্লবের সময় কলকাতায়ই অবস্থান করছিলেন। তিনি সম্পাদকীয় লিখেই ক্ষান্ত হননি, কবিতায় বললেন, 'ভারতের প্রিয় পুত্র হিন্দু সমুদয়/ মুক্তমুখে বল সবে বৃটিশের জয়।' অবশ্য শেষাবধি বৃটিশেরই জয় হয়েছিল। আর ঈশ্বর গুপ্ত তথা দেশওয়ালারা ইংরেজ ভক্তির কারণে সুখে দিনাতিপাত করেছলেন। বিপরীতে সিরাজের বংশ নির্বংশ হয়েছিল অত্যাচারে-অবিচারে। এই অত্যাচার অবিচার ছিল সম্মিলিত হিন্দু-ইংগ শক্তির। এই সত্য উদ্ধারে ইতিহাস ঘাটার প্রয়োজন পড়ে না। প্রয়োজন কেবল বিবেকের প্রসারতা। যাদের এই বস্তুটির অবশিষ্ট নেই তাদের পক্ষেই সম্ভব সিরাজকে আড়াল রাখার আহ্বান জানিয়ে সম্পাদকীয় ফাঁদা। তেইশে জুন আসে, তেইশে জুন যায়। কিন্তু নবাব সিরাজ আর পলাশী স্থিত হয়ে আছে এ জনপদের মানুষ জনদের মনে, মননে। হয়তো থাকবেও বহু কাল, বহু যুগ। কারণ স্বাধীনতা আকাঙ্ক্ষী মানুষের কাছে নবাব সিরাজ প্রতিবারই উঠে আসে নতুন ব্যঞ্জনায় নতুন বৈভবে। কলকাতার দেশ পত্রিকা বা বাবু ঐতিহাসিকরা যাই বলুক না কেন পলাশীর চক্রান্ত সম্পাদকীয় আর ফরমাসী পত্র লিখিয়ে আড়াল করা যায় না, যায়ওনি আজ অবধি। আসলে ইতিহাস পাঠ সীমিত বলেই অন্যের বিকৃতিকেও আমরা সত্য হিসেবে ধরে নেই। শুধুমাত্র নবাব সিরাজের বেলাই এমন ঘটছে না, এ জাতীয় উপমা আরো অনেক। মঙ্গলপন্ডের নাম জানলেও সিপাহী বিপ্লবের আরেক মহানায়ক হাবিলদার রজব আলীর নাম অনেকের কাছেই অজানা। অবশ্য এ জন্য দায়ী আমাদের 'কুলাঙ্গার' শ্রেণীর সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীরা। তারা সূর্যসেনকে নিয়ে যতটা সোচ্চার পলাশীর ব্যাপারে ততটাই শীতল। রজব আলী তো তাদের অনুভবেরই বাইরে। আর বাইরে বলেই মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীর বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনকেও উচ্চারণে তেমন করে আনার ব্যবস্থা নেই। যিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য অস্ত্রের চালান আনতে গিয়ে আফগান সীমান্তে গ্রেফতার হয়েছিলেন। কিন্তু এখন আমাদের শোনানোর চেষ্টা হচ্ছে সূর্যসেন আর ক্ষুদিরামরাই নাকি ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ

www.pathagar.com

করেছিল। এ নিয়ে সিনেমা হয়েছে, গানহয়েছে বই-পত্রও লিখা হয়েছে প্রচুর। প্রচারে কি না হয়। অর্ধ সত্যও একসময় পূর্ণ সত্য হয়ে ধরা দেয় মগজে। বর্তমানে এ লক্ষণই যেন প্রকট। মনিরুজ্জামানরা তলিয়ে যায়, খয়রাবাদীরা সাহায্যকারীর অভাবে ইতিহাসের আবর্জনার তলা থেকে উঠতে গিয়ে হোঁচট খান বার বার। ইতিহাস জানার অনীহা এবং ইতিহাস না জানানোর চক্রান্তই বলি আর নির্বুদ্ধিতাই বলি মূলত এর কারণ। স্কুল-কলেজে বর্তমানে ইতিহাসের নামে যা পড়ানো হয় তা ইতিহাস নয়–ইতিহাসের কংকাল। এই কংকালের ওপর বিশ্বাস রেখেই বেড়ে উঠে আমাদের সন্তানরা। যে জন্যে পরবর্তী সময় সূর্যসেনকেই আপনভাবে তিতুমীরের পরিবর্তে। পলাশীকে মনে করে লজ্জাকর অধ্যায় আর নবাব সিরাজ আসলেই অপদার্থ। ইত্যাকার বিভ্রান্তি সঠিক ইতিহাস জ্ঞানের অভাব থেকেই উৎসারিত।

মীর জুমলার কামানের কথাই ধরা যাক। একসময় এ ঐতিহাসিক কামানটি চকবাজারে ছিল, সদরঘাটে ছিল, শেষে গুলিস্তানে রাখা হয়েছিল। তাই নাম হয়ে গিয়েছিল গুলিস্তানের কামান। এই বিভ্রান্ত মূলত ইতিহাস অজ্ঞতা থেকে। অবশ্য এ বিভ্রান্তি অপসারিত করার দায়িত্ব যাদের তাদের দায়িত্বহীনতাও এখানে কম দায়ী নয়। এ থেকেই প্রমাণিত হয় ইতিহাসের প্রতি আমাদের অনীহা কত প্রচন্ড। অধুনা এই কামান উসমানী উদ্যানে স্থানান্তর করা হযেছে। টোকাই আর ক্লান্ত হকাররাই এই কামানের পরম আত্মীয় বর্তমানে।

এই ঐতিহাসিক কামানটি জঙ্গলে ফেলে না রেখে উসমানী মিলনায়তের চত্বরে সংস্থাপিত করে পাশে এর বিস্তারিত পরিচিতি টাঙ্গিয়ে দিলে অসুবিধার কোন কারণ ছিল কি? এতে করে মিলনায়তনটির মর্যাদাও বাড়তো বৈ কি। না সিরাজকে আড়ালে রাখার যে মানসিকতা কলকাত্তাইয়া বাবুদের, এখানেও কি সেই মানসিকতাই ক্রিয়াশীল। কারণ মীর জুমলা তো সিরাজদেরই পূর্ব পুরুষ।

তেইশে জুন শুধুমাত্র রাজায় রাজায় যুদ্ধ বা নবাব সিরাজের পতনকেই চিহ্নিত করে না। বিশ্বাসঘাতকতা আর চক্রান্তের উৎসমুখকেও তুলে আনে। তাই তেইশে জুন ইতিহাসের এক নব অধ্যায়ের আঁধারও বটে। আসলে এ অধ্যায় চক্রান্তকারী আর বিশ্বাস হন্তাদের চিহ্নিত করার অধ্যায়। যে চক্রান্ত এবং বিশ্বাস ভঙ্গের শিকার ছিলেন নবাব সিরাজ। ইতিহাস ঘোষণা দেয় এই চক্রান্তের নায়করা আজকের বাবুদেরই পূর্ব-পুরুষ। এ কারণেই কি কলকাতার দেশ পত্রিকার সিরাজ ভীতি এত প্রবল?

২৩. ৬. ৯৫

www.pathagar.com

গ্রন্থকেন্দ্রের বইমেলা

চমৎকার একটি বইমেলা উপহার দিলেন জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র। উচ্ছৃংখলতা নাই, নষ্টামী নাই। বড় কথা রাজনীতির খিস্তি খেউড়ে আকীর্ন ক্যাসেটের আওয়াজ বইপ্রেমীদের অতিষ্ঠ করেনি। বইমেলার জন্য যে পরিবেশ প্রয়োজন মোটামুটি তা ছিল অবাধ। তবে বড্ড বেশী ফাঁকা মনে হয়েছে। আরো অনেক বইয়ের দোকান খোলা যেতো। প্রকাশকদের আমভাবে আমন্ত্রণ জানালে মন্দ হতো না। বরং জমজমাট হতো। বিপুল দর্শক আর বই বিক্রয়ের যে পরিমাণ– এ সত্যটিকে উচ্চকিত করে বারবার। গ্রন্থকেন্দ্রের কর্তৃপক্ষের প্রশংসা করতে হয় আরো একটি কারণে, তাহলো মেলার স্থান নির্বাচন। এবারের স্থানটি সার্বিক বিবেচনায় উপযুক্ততো বটেই, বিশাল পরিসর আর প্রাকৃতিক মনোরম দৃশ্যটিও ছিল হৃদয়গ্রাহী। বইমেলার মতো মেলবন্ধনের সাথে সম্পৃক্ততা যার ষোল আনা। বিজয় সরণী এলাকাটিও রাজধানী ঢাকার অনেকটা মাঝামাঝি স্থানে অবস্থিত বিধায় মেলামুখী মানুষ স্বস্তিবোধ করেছে। স্বস্তির কারণ যাতায়াত ব্যবস্থা সহজ এবং সুবিন্যস্ত। ঢাকার প্রতি প্রান্তের গ্রাহক-দর্শক অতি আয়েশে বইমেলাকে স্পর্শ করতে পেরেছে। উপভোগ করেছে। এ প্রসঙ্গে পরিবেশের বিষয়টিও উল্লেখ করতে হয়। পরিবেশ ছিল মেলার অনুকূলে। উচ্ছৃংখল এবং বিশৃংখল অবস্থা চোখে পড়েনি তেমন। বিশেষ করে বইমেলার জন্য এমনটিই প্রয়োজন। আসলে যে আয়োজনে রাজনীতির কণামাত্রও তলানি থাকে, সে আয়োজনেরই সর্বনাশ অনিবার্য। বিগত কয়বছরে দেশের মানুষ এরকম তিক্ত অভিজ্ঞতাই সঞ্চয় করেছে। গ্রন্থকেন্দ্রের বইমেলায় এমন কোন কিছুর গন্ধ অনুভূত হয়নি।

মুশকিল হলো বইমেলার মতো ব্যাপারটিও রাজনীতির রাহুমুক্ত থাকছে না। যে জন্যে অনেক সুচিন্তা এবং সুবিবেচনা অন্ধগলিতে হারিয়ে যাচ্ছে বারবার। যদিও যথার্থ বইপ্রেমীদের প্রত্যাশা অন্তত পক্ষে বইমেলার মত পরিশীলিত বিষয়টিকে মালিন্য থেকে উদ্ধারের ব্যবস্থা নেওয়া হোক। কিন্তু তা সম্ভব হচ্ছে কি? বিশালতায় আর ব্যাপকতায় বাংলা একাডেমীর বইমেলা অনন্য। ভাষা শহীদদের স্মরণ করে যে মেলার যাত্রা। বাংলা একাডেমী কর্তৃপক্ষের অক্লান্ত পরিশ্রম আর সহৃদয়তা যে মেলাকে সুসজ্জিত করে ফি বছর। কিন্তু শেষাবধি দেখা যায়, তাদের পরিশ্রম আর হৃদয়ের উষ্ণতা একশ্রেণীর মানুষের রাজনৈতিক মনোভঙ্গির কারণে প্রশ্নহীনভাবে উঠে আসছে না। তা ছাড়া একুশের বইমেলায় নষ্টামী-ভ্রষ্টামীর যে কান্ডগুলো ঘটে তাও সাম্প্রতিক রাজনীতিরই বহিঃপ্রকাশ মাত্র। বইপ্রেমীদের এই রাহু থেকে উদ্ধারের জন্য বাংলা একাডেমী

www.pathagar.com

প্রতিবারই চিন্তা-ভাবনা করে। প্রতিবারই তা চরমভাবে ব্যর্থ হয়। এবারও চিন্তাভাবনা হয়েছিল বইমেলাকে যথার্থ বইমেলার আদলে সজ্জিত করার। বরাবরের মতো তা কার্যকরি করা সম্ভব হয়নি। তাও রাজনৈতিক চাপে। ভয় ও ভীতির কারণে।

বইমেলাকে নিরুপদ্রব রাখার মানসেই বোধহয় বাংলা একাডেমী তাদের সীমা অতিক্রম করতে দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। কারণ এতে মূল মেলার সৌন্দর্যহানী ঘটে। সাথে চলাচলে বাধাগ্রস্থ হয় বই মেলায় আগত দর্শক-ক্রেতা। একুশের বইমেলাকে উপলক্ষ্য করে একশ্রেণীর লোক প্রতিবছর অহেতুক হৈ চৈ করে। সংকোচন-সম্প্রসারণ আর স্থানান্তর নিয়ে নানান উদ্ভট প্রশ্নের অবতারণা করে। অবশ্য তারা যে পরিচয়েই ময়দানে আসুক না কেন, এরা কেউই রাজনীতির ভেদ-বুদ্ধির বাইরে নয়।আর নয় বলেই বাংলা একাডেমীর বইমেলা সর্বজনগ্রাহ্য হয়ে উঠছে না কোন ক্রমেই। প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। এবারও ব্যতিক্রম ঘটেনি। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় মিছিল হয়েছে। বিবৃতি এসেছে পত্রিকায়, লবিং হয়েছে এখানে-সেখানে। বইয়ের প্রতি আকর্ষণ থাকা ভাল। কিন্তু দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে কি এমন কোন সত্য আঁচ করা যায়? শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর দেওয়ালে যেসব লেখা উৎকীর্ণ থাকে সেগুলোর একশভাগের একভাগও কি 'বই' নামক বস্তুটির দূরতম সম্পর্ক থাকে বা আছে! আদতে বই হলো এদের উপলক্ষ আর 'লক্ষ্য' ভিন্ন প্রান্তে। যার প্রকাশ ঘটে একুশের বইমেলায় প্রতিবছর।

একুশের বই মেলা সম্প্রসারিত হয়ে একাডেমীর আশপাশের রাস্তা দখল করেছে। তবে রাস্তায় যেসব দোকান বসে তার অধিকাংশই বই নয় বাঁশী-খেলনা আর তৈজষপত্রের। মূলতঃ এগুলো পথঘাটে প্রতিবন্ধকতার সাথে সাথে বই মেলার সৌন্দর্য এবং গাম্ভীর্যতাকে ম্লান করে দেয়। সম্পসারণের নামে বই মেলাকে রাস্তায় টেনে আনতে হবে এমন জিদ ধরার পশ্চাতে কি কারণ থাকতে পারে। গত কয় বছর যাবতই লক্ষ্য করা যাচ্ছে একশ্রেণীর রাজনীতিমনস্ক এবং বাণিজ্যমনস্ক লোক একুশের বই মেলাকে পুঁজি করে মাঠে নামে। তারাই এবারও সক্রিয়। তবে এবারের বইমেলাকে সর্বাঙ্গীন সুন্দর করার লক্ষ্যে বেশ কিছু সিদ্ধান্ত হয়েছে। কিন্তু এমন সিদ্ধান্ততো প্রতি মেলার আগ মুহূর্তেই গ্রহণ করা হয়। এরপরও দেখা যায় বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরোর মতই সিদ্ধান্তের অনেক কিছুই উহ্য থেকে যায়। নিয়মবহির্ভূত নানান কর্মকান্ড মেলার পরিবেশকে উত্তপ্ত করে তোলে। মতের বেমিলের কারণে স্টলে আগুন লাগানোর মত ঘটনাও ঘটেছে বার কয়েক। কিন্তু এসবের যথার্থ কোন বিচার বা মীমাংসা করতে ব্যর্থ হয়েছে মেলার উদ্যোক্তাগণ। সদিচ্ছার অভাব ছিল উদ্যোক্তাদের তা হয়তো নয়। কিন্তু তারাও অবস্থার শিকার। এবারও যে এর ব্যত্যয় ঘটবে না তা কি করে বলা যায়। প্রতিবারের মত এবারের সিদ্ধান্তগুলোও খুবই স্বস্তিপ্রদ। মেলার সৌন্দর্যবর্ধয়কতো বটেই। কিন্তু মেলার অবস্থানগত কারণে কতটা গ্রাহ্য হবে সে বিষয়ে অনেকেরই প্রশ্ন। এরকম জিজ্ঞাসু চোখ আসলে বিগত বছরগুলো থেকে আহরিত অভিজ্ঞতার কারণে। বাংলা একাডেমী বই মেলায় বিদেশী গান নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু বিদেশী বই সম্পর্কে শীতলতার কারণ বোধগম্য নয়। বলাবাহুল্য একুশের বই মেলায় বিদেশী

www.pathagar.com

বাংলা বই বিক্রি নিষিদ্ধ ছিল। তবে কি এ বছর নিষেধাজ্ঞা ওঠে গেল? যদি এমন ধারণাই সত্য বলে প্রমাণিত হয় তবে নিরাবেগে বলা যায় এটি একটি রাজনৈতিক বিজয়। তাদের, যারা প্রতি বছর অন্যের ইশারায় একুশের বই মেলাকে রাজনৈতিক ইস্যুতে রূপান্তরিত করে।

একুশের বই মেলার সম্প্রসারণ কে না চায়। এ সম্প্রসারণের অর্থ তা নয় যে, রাস্তাঘাট দখল করে জনগণের চলাচলের ব্যাঘাত সৃষ্টি করা। সারাজীবন বইমেলাকে বাংলা একাডেমীর অভ্যন্তরেই বন্দী রাখতে হবে আসলে এমন চিন্তা যারা করে তারা হয় মানসিক ব্যাধি আক্রান্ত নতুবা স্বার্থ শিকারী। মায়ের কোল আঁকড়ে থাকা শিশুর পক্ষেই শোভা পায়, সমীচীনও বটে। কিন্তু একজন কিশোর বা যুবকের পক্ষে তা লজ্জাকর অশোভনীয়ও। একুশের বই মেলা এখন বলবান যুবক। বাংলা একাডেমীর এ ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনার সময় অতিক্রান্ত হচ্ছে। বিশাল পরিসরের জায়গাও যে হাতের নাগালে আছে, আর সেখানে সুন্দর সুস্থির এবং বিপুল দর্শক-ক্রেতা আকর্ষণে সক্ষম মেলা জমানোও সম্ভব, তার উজ্জ্বল প্রমাণ স্থাপন করেছে গ্রন্থ কেন্দ্র। কেবল তাই নয়, টিকেট কেটে বই প্রেমিক মেলায় প্রবেশ করেছে। বাংলা একাডেমীর বাইরে বই মেলা জমবে না এমন কু ধারণার অচলায়তন ভেঙ্গেছে বিজয় সরণীর বই মেলা।

বাংলা একাডেমীর একুশ আশ্রিত বই মেলাও সম্প্রসারিত হোক, সুবিন্যস্ত হোক, সর্বজন গ্রাহ্য হোক, রাজনীতি মুক্ত হোক, দীর্ঘজীবী হোক এই কামনা প্রতিটি মানুষের, আমাদেরও।

২৯. ১. ৯৫

www.pathagar.com

কালী বিভ্রান্তি ও কবি নজরুল

বিষয়টা আরো খোলাসা করলেন ডক্টর বাগচি। ডক্টর অশোক বাগচি ভারতের একজন বিশিষ্ট নিউরো সার্জন। ক'দিন আগে ঢাকায় এসেছিলেন তিনি। বাংলাদেশ টেলিভিশন তার একটি সাক্ষাতকার প্রচার করেছে গত ২৬শে মে। সাক্ষাতকারটি ছিল জাতীয় কবির জন্মবার্ষিকী স্মরণে। উল্লেখ্য, জনাব বাগচি কবি নজরুলের একজন চিকিৎসক ছিলেন। তাই কবি নজরুলের চিকিৎসা, ব্যাধি এবং ব্যাধির কারণ এসব বিষয়ই ছিল আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু। অবশ্য এর আগেই ডক্টর বাগচির এ সংক্রান্ত বক্তব্য পত্রিকায় এসেছিল। কবি নজরুল ভুল চিকিৎসার শিকার হয়েছিলেন। ডক্টর বিধান চন্দ্র রায়রা কবির রোগ ঠিক ধরতে পারেননি। তাই সময়মতো সঠিক চিকিৎসার অভাবে রোগ আরো জটিল হয়ে পড়ে। যে কারণে বিদেশ নিয়েও কবিকে আর সুস্থ করে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়নি। টিভিতে রোগের কারণ সম্পর্কে যা বলেছেন তা আরো মারাত্মক, আরো ভয়াবহ। ডক্টর বাগচির মতে, 'যে দিন থেকে নজরুল কালী পূজার দিকে ঝুঁকে পড়লেন সে দিন থেকেই তাঁর সর্বনাশ শুরু। একজন মুসলমানের ধর্মান্তর বিশেষ করে হিন্দু ধর্মে জড়িয়ে পড়া তা কোনভাবেই ভাল লক্ষণ নয়। বিষয়টা মাসীমার বুঝা উচিত ছিল।' এ কথাগুলো তিনি জোরের সাথেই উচ্চারণ করলেন।

কবি নজরুল বরাবরই বিভ্রান্তির শিকার হয়েছেন। কি ব্যক্তি জীবনে, কি সামাজিক জীবনে, কি সাহিত্যিক জীবনে। এমন কি পারিবারিক জীবনেও নজরুল ছিলেন চরম বিভ্রান্তির শিকার। যে বিভ্রান্তি তাঁকে আমরণ ধাওয়া করে ফিরেছে। এক সময়ের মসজিদের ইমাম নজরুলকে কালী পূজা পর্যন্ত নিয়ে পৌঁছিয়েছিল। কত বড় ভ্রান্তির শিকার হলে এমন অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে তা হয়তো বলার আর অপেক্ষা রাখে না। আর রাখে না বলেই ব্যাপারটি নজরুল জীবনের একটি বিরাট প্রশ্নবোধক চিহ্ন। কিন্তু এ প্রশ্নবোধক চিহ্নটির প্রতি অনেকেই তেমন নজর দিতে চান না। ডক্টর অশোক বাগচিকে ধন্যবাদ। সম্ভবত তিনিই নজরুলের কালী সাধনার বিষয়টির প্রতি এমন তীক্ষ্ণ আলো ফেললেন। অবশ্য কালী বন্দনাই শুরু নয়, এ পর্যন্ত পৌছতে অনেক ষড়যন্ত্রের জালে নজরুলকে বন্দীত্ববরণ করতে হয়েছে। চরম বিকার ছিল এটি। প্রশ্ন আসতে পারে ষড়যন্ত্র নিয়ে। এই যেমন কলকাতার পন্ডিত ডক্টর অসিত কুমার বলেছেন, নজরুল নাকি আনুষ্ঠানিক মুসলমান ছিলেন। মূলত হিন্দু-মুসলমান-খ্রিস্টান কিছুই ছিলেন না নজরুল। কথাটা কেবল বিভ্রান্তিকরই নয়, নজরুলের সৃষ্টিকেও অস্বীকার করার শামিল। নজরুল কোথায় বলেছেন, তিনি ধর্মে বিশেষ করে স্বধর্মে অবিশ্বাসী। আসলে অসীত বাবুরা

www.pathagar.com

এসব বলে বলেই নজরুলকে ষড়যন্ত্রের জালে আটকিয়ে কালী পূজা করতে বাধ্য করেছিলেন। ঘরে বাইরে তাকে মানসিক অস্থিরতায় রেখেছিলেন। যে মানসিক দ্বন্দ্ব নজরুলকে চরম বিপর্যয়ের দোরগোড়ায় নিয়ে ঠেকিয়েছিল। নার্গিসের সাথে নজরুলের বিয়ে ভেঙ্গে দিয়ে তাঁর কাছে দুলিকে গছিয়ে দেয়ার পেছনে যে অসীত বাবুদের কোন ষড়যন্ত্র খেলা করেনি তা কি করে বলি? প্রমীলা নজরুলকে না হয় বাদ দিলাম। কিন্তু তার শাশুড়ী? এ মহিলা নজরুলের সংসারে সংযুক্ত হবার কি প্রয়োজন ছিল! এ মহিলা যে নজরুলের সাংসারিক জীবনে একটি দুষ্ট গ্রহের মতো বিরাজ করতো তাতো সবাই স্পষ্টভাবেই উচ্চারণ করেছেন। এ মহিলাই নজরুলকে মানসিক অস্থিরতায় রাখতেন। তার কারণেই নজরুল আপনজনদের সাথে সম্পর্কহীন হয়ে পড়েছিলেন। এমনকি এ বিয়ের পর থেকে মার সাথে পর্যন্ত নজরুল দেখা করেননি। জেলে দেখা করতে এসে নজরুলের মা বারবার ফিরে গেছেন। নজরুল দেখা করেননি। বিরজবালার হাতে সরবত পান করে অনশন ভেঙ্গেছিলেন। আদতে নজরুল গোলক ধাঁধায় আটকা পড়েছিলেন (আটকানো হয়েছিল) যে ধাঁধা তার মাকে-ভাইকে পর্যন্ত অপরিচিত করে তুলেছিল। নজরুলের শাশুড়ী সব সময়ই তাঁর সাথে দুর্ব্যবহার করতো। বড় কথা নজরুলের মুসলমানিত্ব তাঁর কাছে ছিল অসহ্য। এ নিয়ে নজরুল আর তাঁর শাশুড়ী গিরীবালা দেবীর ঝগড়া ছিল নিত্যদিনের। এ ঝগড়া সময় সময় চরমে উঠত। সংসারের এ মানসিক অশান্তিতে প্রায়শই তিনি বাড়ি থেকে অন্য কোথাও চলে যেতেন। এ সব কাহিনী প্রায় সব নজরুল জীবনীকারই কম বেশী বর্ণনা করেছেন। কদিন আগে কলকাতার সানন্দায় প্রতিভাবসুর 'জীবনের জল ছবি' নামের একটি ধারাবাহিক লেখা পড়েছিলাম। সে লেখাতেও প্রতিভাবসু নজরুলের প্রতি তার শাশুড়ীর তাচ্ছিল্য এবং দুর্ব্যবহারের বর্ণনা দিয়েছেন। মেহমানের সামনে গিরীবালার এমন আচরণ নজরুলকে কতটা মানসিক যন্ত্রণায় কাতর করে তুলেছিল তাও তিনি সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। একেতো স্বজন হারার (রক্ত সম্পর্কীয়) বেদনা তার উপর সংসারের অশান্তি মানসিকভাবে নজরুলকে কাবু করে ফেলেছিল। যার পরিণতি তন্ত্রমন্ত্রের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে উঠা। অবশ্য এটিই যে একমাত্র কারণ তা হয়তো না; তবে ঘরের ষড়যন্ত্রই যে উৎস তা জোরের সাথেই বলা যায়।

অসুস্থ হওয়ার প্রাক্কালে নজরুল বঙ্গদাকান্ত মজুমদারের শিষ্য হয়েছিলেন। বরদাকান্ত ছিলেন এক যোগী-তান্ত্রিক। এ 'বরদাকান্ত মজুমদারই' নজরুলকে কালী সাধনায় টেনে এনেছিলেন। এভাবেই নজরুল ঘরে বাইরে ষড়যন্ত্রের জালে আটকা পড়েন। যে ষড়যন্ত্র শেষাবধি নজরুলকে স্থবির করে ছেড়েছিল। ডক্টর অশোক বাগচির মতো আরো একজন নজরুলের অসুখের কারণ হিসেবে তার মানসিক অস্থিরতা অর্থাৎ তন্ত্রমন্ত্রের জালে জড়িয়ে পড়াকে দায়ী করেছিলেন। তাঁর নাম আলহাজ এস এম হামিদ। তিনি একজন রেডিও ইঞ্জিনিয়ার। তার আর এক পরিচয় তিনি নবযুগে নজরুলের সহকর্মী ছিলেন বেশ কদিন। তিনি নজরুলের অসুখের শুরুর বর্ণনাটা দিয়েছেন এভাবে- "প্রধান সম্পাদক জনাব কবি নজরুল ইসলাম সাহেবের অনুমতি লইয়া নবযুগের অস্থায়ী নিউজ এডিটরের কাজ গ্রহণ করি ও লোয়ার সার্কুলার রোডের

www.pathagar.com

আমজাদীয়া হোটেলের একটা কামরা ভাড়া করিয়া সেখানে থাকি।

কয়েকদিন কাজ করার পর একদিন হাতে কাজ না থাকায় প্রায় একটার সময় ছুটি লওয়ার জন্য কবি সাহেবের কামরায় গেলে তিনি আমাকে বসিতে বলিয়া নিম্নরূপে আলাপ শুরু করেন ঃ

কবি। আমি আপনার সাথে ধর্ম নিয়ে বাহাছ (তর্ক) করতে চাই।

আমি। আপনার মত এত বড় কবির সাথে আমি বাহাছ করতে চাই না। তবে আপনি প্রশ্ন করেন, আমার জানা থাকলে উত্তর দিব।

কবি। ধর্ম সম্বন্ধে আপনার মতামত কি?

আমি। বিষয়টা পরিষ্কার করে বলেন। আপনি কি বিষয় জানতে চান?

কবি। আপনি কি মনে করেন যে, শুধু মুসলমানেরাই নাজাত (মুক্তি) পাবে?--

আমি। হাঁ, কুরআন শরীফ ও হাদীস শরীফ মতে এইরূপই বুঝি।

কবি। না, সব ধর্মের লোকই মুক্তি পাবে। তবে ইসলাম ধর্ম সবচেয়ে সোজা পথ। কাজেই মুসলমানেরা তাড়াতাড়ি তাঁদের লক্ষ্যে পৌঁছবে।

আমি। না, তা নয়। কুরআন শরীফ নাযিল হওয়ার পর আগের সব রকমের ধর্ম অচল বা বাতিল হয়ে গিয়েছে। যেমন বলা হয়েছে ঃ "ইন্নাদ্দীনা এন্‌দাল্লাহিল ইসলাম" (কুরআন) অর্থাৎ খোদার কাছে ইসলামই একমাত্র ধর্ম।...

কবি। তবে যে বলা হয় "যত মত ততপথ।"

আমি। সে কথা তো ঠিকই। যার যেদিকে ইচ্ছা সে সেদিকে যাবে। কিন্তু খোদা পর্যন্ত পৌঁছতে একটাই পথ। আর তা হলো ইসলাম।

তখন তিনি একটা সাদা কাগজে প্রায় দশ ইঞ্চি ব্যবধানে দুইটি বিন্দু আঁকিয়া 'ক' ও 'খ' চিহ্ন দিয়া বলিলেন 'মনে করুন 'ক' হচ্ছে মানুষ আর 'খ' হচ্ছে খোদা। এখন 'ক' ও 'খ'-এর মধ্যে একটা সরল রেখা টানছি। এটা হলো ইসলাম। তারপর 'ক' ও 'খ' কে সংযোগকারী আরও কয়েকটা বাঁকা লাইন টানিয়া বলিলেন, এগুলি হলো অন্য সব মতবাদ বা ধর্ম। বিলম্বে হলেও তারা সবাই 'ক' থেকে 'খ'- এতেগিয়ে পৌঁছবে।

আমি। আপনি একটা Fundamental mistake (গোড়ায় গলদ) করেছেন। আপনি টর্চ লাইট ফোকাস করে দেখেছেন? দেখবেন সেটার আলো সব সময় সোজা পথে চলে। বাঁকা পথে কখনও যায় না।... তেমনি পবিত্র কোরআন ও হাদীস শরীফে ধর্মকে নূর বা আলো বলা হয়েছে। কাজেই এখন খোদা পর্যন্ত যেতে হলে ইসলামের সোজা পথই সকলকে গ্রহণ করতে হবে।

এই কথায় তিনি খুব চিন্তিত হইয়া বলিলেন ঃ এ-কথাতো আজ নতুন শুনছি। কোন আলেম তো এর আগে আমাকে বলেননি!... আচ্ছা আমি যে হিন্দু মতে সন্ন্যাসীদের সাথে জপ করে শ্মশানে অনেক অদ্ভুত জিনিস দেখেছি, সেগুলোর কি অর্থ হতে পারে?...

আমি। সেগুলো সব শয়তানের বা ভূতের খেলা। আসল সত্যের সাথে সে সবের কোনই সম্পর্ক নাই। যদি আমার মতো একজন মোল্লাও আপনার পাশে সে সময় থাকতো, তবে কোন শয়তান বা ভূত কাছে আসতে পারতো না। আর আপনিও ওসব

www.pathagar.com

কিছুই দেখতেন না।

কবি। আচ্ছা, আমি যে মোরাকাবা (বিশেষ ধ্যান) করলে দেখে থাকি, তার মানে কি হয়?

আমি। আপনি কি দ্যাখেন, তা একবার আমার সামনে মোরাকাবা করে দেখেন দেখি। যা দেখেন, তা আমাকে বলবেন। তখন তিনি বেশ শান্তভাবে চক্ষু বন্ধ করিয়া ধ্যান করিতে লাগিলেন। কয়েক মিনিট পরে বলিলেন, এই যে বেশ একটা নীল আলো দেখছি।...

আমি। আরও চেষ্টা করেন, এরপর কি দেখেন তা বলেন।

কবি। (কয়েক মিনিট পর) এবারে লাল আলো দেখছি।

আমি। আরও চেষ্টা করেন।

কবি। (কিছুক্ষণ পর চোখ খুলিয়া) নাঃ, আর কিছুই দেখা যায় না। হঠাৎ সব অন্ধকার হয়ে গেল। মনে হচ্ছে যেন গোটা আসমানটা কালো কালি বা আলকাতরা দিয়ে লেপে দেওয়া হয়েছে।

আমি। হাঁ, হিন্দু মতে সন্ন্যাসীরা এখানে এসেই (আমার মতে) ক্ষান্ত হয়ে যায়। আর এই অন্ধকারকেই (হয়তো) কালীরূপ দিয়ে তারা পূজা করেন।... কিন্তু আপনি তো মুসলমান। আপনার মধ্যে ইসলামের আলো আছে। কাজেই এবারে আপনি আপনার কলেমার অর্থের দিকে খেয়াল রেখে ধ্যান বা মোরাকাবা করে দেখুন। যদি ঐ কালো পর্দা ভেদ করে কিছুটা উপরে উঠতে পারেন, তবেই আশা করি সত্যের আলোর একটু ঝলক হয়তো দেখতে পাবেন।

এই কথায় তিনি তাঁহার সমস্ত শক্তি দিয়া একাগ্রচিত্তে মোরাকাবা করিতে বসিলেন। প্রায় দশ মিনিট নিঃশব্দে কাটিয়া গেল। আমিও একদৃষ্টে তাহার মুখের দিকে দেখিতে লাগিলাম। দেখিলামঃ তাঁহার সদা হাস্যভাব দূর হইয়া গভীর চিন্তা ও দুঃখের ভাব ফুটিয়া উঠিল ও মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল। হঠাৎ তিনি ভীষণ শব্দ করিয়া চীৎকার করিয়া হা-হা-হা করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন ও বলিলেন ঃ আমার সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে, হায় পরকালে আমার কি গতি হবে?...

তাঁহার সেই চীৎকারের অফিসের দারোয়ান ও কর্মচারীরা ছুটিয়া আসিলেন। সবাই হতবাক হইয়া আমার দিকে দেখিতে লাগিলেন। আমিও ব্যাপারটা এতদূর গড়াইবে বলিয়া ভাবি নাই। কাজেই খুব মুশকিলে পড়িলাম।... তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন– আপনারা সব ঘর থেকে বেরিয়ে যান। এটা প্রাইভেট ব্যাপার। যান, সব এক্ষুণি যান, যান বলছি।...

আমিও বলিলাম ঃ তিনি বিশেষ কোন কারণে হঠাৎ খুব শক্ পেয়েছেন। একটু পরেই সব ঠিক হয়ে যাবে। আপনারা দয়া করে বেরিয়ে যান। তারপর তাহারা বাহিরে গেলে তিনি দারোয়ানকে দোর বন্ধ করিয়া পাহারা দিতে বলিলেন, যেন আর কেহ সেই কামরায় না আসেন।

আমি তারপর তাহার হাত ধরিয়া তৌবা করাইয়া কলেমা পড়াইলাম ও বলিলাম ঃ আর কাঁদবেন না। এখনতো আপনি নিষ্পাপ হলেন। এরপর বরাবর ইসলামের বিধান

www.pathagar.com

মতে চলবেন। ইনশাআল্লাহ্ তবেই বেহেশতে যেতে পারবেন। (যুগস্রষ্টা নজরুল ঃ খান মোহাম্মদ মুঈনুদ্দীন, পৃ. ২৩৬-৩৮)" এ ঘটনার দু'একদিন পরই নজরুল কালব্যাধির হাতে বন্দী হয়ে পড়েছিলেন। তিনি আর সুস্থ জীবনে ফিরে আসেননি। লক্ষ্য করার বিষয় অসুস্থ হবার আগ মুহূর্তে নজরুল তওবা করেছিলেন আর এজন্যই হয়তো বা তার শেষ আশ্রয় একটি স্বাধীন দেশের মাটিতে হয়েছে; তার ইচ্ছা মাফিক মসজিদের পাশে।

এরপরও অসীত বাবুরা বলেন, নজরুলের কোন ধর্ম ছিল না। তখন তাদের প্রতি করুণার চোখে তাকানো ছাড়া আর কোন গত্যন্তর থাকে কি? ভারতীয় বাংলায় নজরুল নিষিদ্ধ ছিল। সে এলাকায় নজরুল চর্চা এক প্রকার নেই বললেই চলে। পত্র-পত্রিকাগুলো তো নজরুলের ব্যাপারে একেবারেই নীরব। কলকাতার 'দেশ' পত্রিকাসহ কোন পত্রিকায়ই ১১ই জ্যৈষ্ঠ বা ১২ই ভাদ্র কোন তারিখ আছে তা যেন তাদের স্মরণেই আসে না। বাবুদের ঘরে নজরুলের এই যখন হালত তখনতো কোন অসীত বাবু টু শব্দটি করেন না? আসলে এটাই হলো অসীত কুমারদের ষড়যন্ত্রের কৌশল। কোন মুসলিম প্রতিভাকে ছল-চাতুরীতে কালী বন্দনায় আটকে ফেলে মুরুব্বীআনা সুরে বলা, তাকেতো কোন বিশেষ ধর্মে আটকানো যায় না কারণ সে মানব ধর্মে বিশ্বাসী। সে উদার অসাম্প্রদায়িক। আহ! বলিহারি পান্ডিত্যের। আসলে কাজ যা করার তাতো বাবুরা করেই ফেলেছেন। সর্বনাশ যা হবার তা তো হয়েছেই। এখন আর নজরুলকে স্মরণ করার কি প্রয়োজন, ষড়যন্ত্রতো ষোলআনাই সফল। হয়তো এ জন্যেই কলকাতার অসীত বাবুরা নজরুলকে স্মরণ করার প্রয়োজন বোধ করেন না আর।

৩০. ৫. ৯০

www.pathagar.com

আমার গহিন গাঙের নাইয়া

'কলের গান' এখন প্রায় বিলুপ্তির পথে। তিরিশ-চল্লিশ এমনকি পঞ্চাশ দশকেও কলের গানের দাপট ছিলো। সৌখিনতা আর আভিজাত্যের প্রতীক ছিল কলের গানওয়ালা বাড়ি সে সময়। শুরুতে কাঠের বাক্সে ধুতরা ফুলের মতো চুঙ্গা বসানো থাকতো কলেরগানে। পরে তা সুটকেসের মতো হলো। সে সুটকেসের কোণায় লাগানো থাকতো পিন রাখার ছোট কৌটা। যা আঙ্গুলে ধাক্কা দিলে বেরিয়ে আসত। পিনের বাক্সটিও চমৎকার। একটি অচল পিন আর খালি পিনের বাক্স জোগাড়ের কি দারুণ লোভ ছিলো সেই শৈশবে।

বাড়িতে একটি কলের গান ছিলো। বড়রা বাজাত। আর আমরা ছোটরা গোল হয়ে বসে ঔৎসুক্যের সাথে শুনতাম। রেকর্ডের মাঝখানে কাগজে ধুতরা ফুল চুঙ্গার সামনে একটি কুকুর বসা ছবি ছাপ মারা থাকতো। কুকুর মার্কা ছবিটিও কৌতূহলী করে তুলতো আমাদের। দুটি উলঙ্গ শিশুর ছবি ছাপমারা রেকর্ডও দেখতাম। এ রেকর্ড কলোম্বিয়া কোম্পানীর। আর কুকুর মার্কা রেকর্ডগুলো হিজমাস্টার্স ভয়েজ কোম্পানীর। এসব পরবর্তী সময়ে জেনেছি। বেশ ক'খানা রেকর্ডই বাজতো। তবে এর অধিকাংশই একজন গায়কের। যার গান বারবার শুনেও আবার শুনতে ইচ্ছা করতো। গানের 'কথা' ভালো কি মন্দ সে মাথা ব্যথা ছিলো না। বুঝতামও না অতসব। গায়কের হৃদয়কাড়া গলা আর সুর আবেশিত করে রাখতো। কোন্‌টা যে বাঁশী আর কোন্‌টা গলার কারুকাজ এর পার্থক্য নির্ণয়ে প্রায়শই মুশকিলে পড়তাম। যখন হেলে-দুলে কলের গানে ডিস্‌ক ঘুরতো আর সেখান থেকে বেরিয়ে আসতো "আমার গহিন গাঙের নাইয়া" শব্দগুলো তখন মনে হতো গায়কের গলার পাশাপাশি যে বাঁশীটি বাজছে, সে বাঁশীর টানকেও ছাপিয়ে যেনো কণ্ঠটিই মূর্ত হয়ে উঠছে। অন্তরের গভীরে আঁচড় কাটছে। এ মোহনীয় গলার অধিকারী মাত্র একজনই। যার নাম আব্বাস উদ্দিন আহমদ। এক সময় তামাম বাংলার ঘরে ঘরে যে আব্বাস উদ্দিনের নাম সম্ভ্রমর সাথে উচ্চারিত হতো, লোকগীতি সম্রাট বলে যার পরিচয়, বর্তমান প্রজন্ম তাঁর সম্পর্কে কতটুকু জানে? জরিপ করলে না জানার পাল্লাটিই ভারী হবে নিঃসন্দেহে। এর কারণ কি কমুনিক্যাশন গ্যাপ? না জেনারেশন গ্যাপ? সম্ভবত দু'টিই।

গেল তিরিশে ডিসেম্বর তিরিশতম মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হলো কণ্ঠশিল্পী আব্বাস উদ্দিনের। পল্লীর মানুষের হৃদয় থেকে উৎসারিত যে গান সে গানটিই আব্বাস উদ্দিন তাঁর কণ্ঠে ধারণ করেছিলেন। তাই আব্বাস উদ্দিনকে স্মরণ করার অর্থ আমাদের

www.pathagar.com

ঐতিহ্যকে স্মরণ করা, ইতিহাসকে স্মরণ করা। তিনি গান করতে এসেছিলেন তিরিশের দশকে। তখন এ এলাকায় বাবুরাই একচ্ছত্র অধিপতি।

'কোন বিরহীর নয়ন জলে বাদল ঝরে গো'। শৈলন রায়ের লেখা এ গানটিই ছিলো তার প্রথম রেকর্ড ডিস্ক। পরে পল্লী গানেই তিনি মাত করেছিলেন। অবশ্য ইসলামী গান তাঁকে জনপ্রিয়তার শীর্ষে নিয়ে গিয়েছিল। কবি নজরুলের লেখা "ওমন রমজানের/রোজার শেষে এলো খুশির ঈদ", এ গান দিয়ে এ ধারার শুরু। এ সব ইসলামী হামদ-নাত আর উদ্দীপনামূলক গান এত জনপ্রিয় হয়েছিল যে, কোন কোনটির ডিস্ক সরবরাহ করতে গিয়ে নাকি রেকর্ড কোম্পানীকে মুসিবতে পড়তে হয়েছিল। ইসলামী গানের এ জনপ্রিয়তার বেশ ক'জন হিন্দু গায়ক-গায়িকা নাম পালটিয়ে ইসলামী গান রেকর্ড করেছিলেন। ধীরেন দাস গাইলেন গনি মিয়া নামে, চিত্ত রায় গাইলেন দেলওয়ার হোসেন নামে, গিরিন চক্রবর্তী গাইলেন সোনা মিয়া নামে আর গায়িকাদের মাঝে সকিনা বেগম হলেন আশ্চর্যময়ী, হরিমতী গেয়েছিলেন আমিনা বেগম নামে। এ থেকেই বুঝা যায় সে সময় ইসলামী গান কতটা আকর্ষণ করেছিলো শ্রোতাকে। এ জন্য প্রশংসা প্রাপ্য যে আব্বাস উদ্দিনের তা হয়তো বলাই বাহুল্য। কারণ তিনিই এ গান বাংলার প্রতিটি ঘরে পৌঁছে দিয়েছিলেন। শ্রোতার নজর কেড়ে ছিলেন।

আজকের প্রজন্ম আব্বাস উদ্দিনকে জানে না। এ জন্য বোধহয় জেনারেশন গ্যাপ থেকে কম্যুনিকেশন গ্যাপটিই অধিক দায়ী। কারণ তাঁকে যে ভাবে উপস্থাপিত করার প্রয়োজন ঠিক সেভাবে করার ব্যবস্থা নেই। কিন্তু তাকে আমাদের দরকার। দরকার প্রচন্ডভাবেই। আমাদের লোকজ-ঐতিহ্যকে উদ্ধারের সহায়ক শক্তি আব্বাস উদ্দিনের গান। অপসংস্কৃতির মোকাবিলায়ও তার গান একটি শক্ত ঢালের মতো। কিন্তু সে আয়োজন নেই। আয়োজনের অভাব অপসংস্কৃতি অনুপ্রবেশের পথকেই প্রশস্ত করছে দিন দিন।

এই যেমন সেদিন টিভির রজত জয়ন্তীর অনুষ্ঠান দেখছিলাম। একটি ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান। উপস্থাপক ছিলেন অভিনেতা আফজাল হোসেন। অংশ গ্রহণে গোটা দশেক লাস্যময়ী কিশোরী-তরুণী। অনুষ্ঠান শুরু হলো। উপস্থাপক আফজাল তরুণীদের উদ্দেশে বললেন, আমি একটি গান বাজাচ্ছি বলতে হবে কার গান এবং কোন ছবির বোধহয় ছবির পরিচালকের নামও জানতে চেয়েছিলেন। পর পর গোটা তিনেক গান বাজালেন সাথে ছবির দৃশ্যটিও দেখানো হলো। তরুণীরা প্রায়ই সঠিক উত্তর দিয়ে উপস্থাপক এবং দর্শকদেরকেও অবাক করে দিলেন। বলা বাহুল্য সবগুলো গানই ছিলো বিদেশী তথা ইংরেজী সিনেমার। এর পর অংশগ্রহণকারিণীদের দু-দলে ভাগ করা হলো। বলা হলো তাদের একজন গুনগুন করে একটি গানের কলি ভাজবে অন্যদল বলবে এ কোন গানের সুর এবং কার গান। তার তেমনি করল এখানেও প্রায় কাছাকাছি জবাব উঠে এলো। আশ্চর্য! গুনগুন করে যে গানের কলি ইথারে ভাসিয়ে দিলো বাংলাদেশের তথা টিভির তরুণীরা তাও বিদেশী অর্থাৎ ইংরেজী গানের সুর।

www.pathagar.com

সাধুবাদ উপস্থাপককে, অংশ-গ্রহণকারী তরুণীদেরকে সাথে টিভি কর্তৃপক্ষকেও। সাধুবাদ কারণ তারা বাপের পরিচয় না জানলেও অন্যকে বাপ ডাকতে লজ্জাবোধ করে না মোটেও। অসংখ্য এই রজত জয়ন্তীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানেই প্রেসিডেন্ট অপসংস্কৃতির কথা তুলেছিলেন। আমাদের টিভি যে কি সংস্কৃতি 'প্রসব' করছেন তা তারাই ভাল বুঝেন। অবশ্য আজকাল অনেকের প্রশ্ন এ বাংলাদেশ টেলিভিশন না বাংলাদেশ 'বিভীষণ'।

আয়োজন নেই আব্বাস উদ্দিনকে নতুন প্রজন্মের কাছে সঠিকভাবে উপস্থাপনের। টিভির সদিচ্ছা থাকলে আব্বাস উদ্দিনের রেকর্ড বাজাতে পারতো। তরুণীরা বলতো এ কার গান, গীতিকার কে। এভাবে কম্যুনিকেশন গ্যাপ কমানো যায় পূর্বসূরীর সাথে উত্তরসূরীর। কিন্তু হা-হতোস্মি। এর কোন ব্যবস্থা নেই। সে পূর্বসূরী যদি মুসলমান হয় তবে তো মাশাল্লা, এ পৃষ্ঠা আর উলটানো যাবে না। আব্বাস উদ্দিনের ব্যাপারটাও অনেকটা সে রকম। তিনি পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়তেন, এমনকি তাহাজ্জুদ পর্যন্ত। তাঁর কণ্ঠ যেমন ছিলো তুলনারহিত, তেমনি ব্যক্তিগত চরিত্রও ছিলো কলুষমুক্ত। বর্তমান সময়ে এসব এলাকায় এমন চরিত্র প্রায় শূন্যের কোঠায়। মোস্তফা জামান আব্বাসী লিখছেন 'জায়নামাযে তিনি দীর্ঘক্ষণ থাকতেন না। অবশ্য এশার নামায তার প্রায়ই দীর্ঘ হতো। মাঝরাতে ঘুম ভেঙ্গেও তাকে জায়নামাযে দেখেছি। অবশ্য এই গোপন নামাযটি তিনি অতি সন্তর্পণে পড়তেন। অনেক সময় মাও টের পেতেন না।' এমন একজন শিল্পীকে আমরা ভুলতে বসেছি। আমাদের সন্তানরা তাঁকে জানে না। তাঁর গান শুনে না। যে জন্যে তাদের সাথে দূরত্ব বাড়ছে।

মুশকিল হলো কলের গানের প্রচলন না থাকায় ডিসক এখন কমে গেছে। তবে টেপ রেকর্ডারের বদৌলতে অনেক গায়কই ঘরে ঘরে যাচ্ছেন। আব্বাস উদ্দিনের দু'একখানা টেপও বাজারে পাওয়া যায়। তাঁর সবগুলো পুরানো গান কি রেকর্ড করে বাজারে ছাড়ার ব্যবস্থা করা যায় না, আলাদা আলাদাভাবে? যেমন মুর্শিদী, মারফতী, ভাওয়াইয়া, পল্লীগীতি, নজরুল সংগীত (ইসলামী) ভিন্ন স্বাদের গান ভিন্ন ভিন্ন ক্যাসেটে। এ দায়িত্ব সরকারীভাবে নেয়া উচিত। সরকারের সংস্কৃতি বিভাগ এ দায়িত্ব নিতে পারেন। জাতীয় স্বার্থেই তা করা উচিত। আব্বাস উদ্দিনের পরিবারও এ কাজের আঞ্জাম দিতে পারেন। কারণ আমাদের লোকজ-ঐতিহ্য এবং আমাদের ইতিহাসের অনেক অলিখিত অধ্যায় সেসব গানে লেগে আছে। এ প্রজন্মের সাথে কম্যুনিকেশন গ্যাপ কমানোর আর এক পথ আব্বাস উদ্দিনের বর্ণাঢ্য জীবন পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা। এ আব্বাস উদ্দিনের স্বার্থে নয়, তা প্রয়োজন জাতির স্বার্থেই।

৩. ১. ৯০

www.pathagar.com

প্রয়োজন ইতিহাসের বিশুদ্ধ পাঠ

গুপ্ত কবি তার সুপ্ত বাসনা ব্যক্ত করেছিলেন এভাবে– "চিরকাল হয় যেন ব্রিটিশের জয়/ব্রিটিশের রাজলক্ষ্মী, স্থির যেন রয়/এমন সুখের রাজ্য, আর নাহি হয়/ শাস্ত্রমতে এই রাজ্য রাম রাজ্য কয়।"

কেবল পদ্যে নয় গদ্যেও ঈশ্বরগুপ্ত ছিলেন ব্রিটিশ বন্দনায় পঞ্চমুখ। তার সংবাদ প্রভাকরের সম্পাদকীয় নিবন্ধের এক জায়গায় তিনি লিখেছেন– "বাঙ্গালী জাতি কাঙ্গালি অপেক্ষাও দুর্বল, অত্যন্ত ভীত, সাহসহীন, ভাত মাছ খাইয়া শরীর ধারণ করে, অস্ত্রের নাম শুনিলেই কাপিতে থাকে, যাহারা আপনারা আপনারদিগের শরীর রক্ষা করিতে পারে না তাহার কি আবার কস্মিনকালে অরির ভাব ধারণ করিয়া প্রবলতা প্রকাশ করিতে পারে? যে পর্যন্ত এদেশে ইংরেজের প্রভুত্ব হইয়াছে, সেই পর্যন্ত তোমরা প্রভুভক্ত রূপে বিখ্যাত হইয়া আসিতেছে এই মহৎগুণের প্রভাবে উপযুক্ত মত রাজানুগ্রহ ও প্রাসাদ লাভ করিতেছে---।"

বলা বাহুল্য, কবি ঈশ্বরগুপ্ত বাঙালী বলতে তার স্বসমাজকেই বুঝিয়েছেন। তাই ঈশরগুপ্তরা বরাবরই 'প্রভুভক্তির মহৎগুণে' গুণান্বিত। বিশেষ ভাবে ইংরেজের। যে কারণে 'রাজানুগ্রহ' আর 'প্রাসাদ' থেকে তারা বঞ্চিত হয়নি কখনো। যতদিন ব্রিটিশ ছিল এদেশে।

প্রবাদ আছে, সব শেয়ালের একরা। আরেক 'ঈশ্বর', যিনি বিদ্যার সাগর রূপে পরিচিত তার ভক্তির নমুনা– "ক্লাইভ অকতোভয় ও অত্যন্ত সাহসী ছিলেন; সঙ্কটে পড়িলে তাহার ভয় না জমিয়া বরং সাহস ও উৎসাহের বৃদ্ধি পাইত।– তৎকালে ক্লাইভ বাঙালীতে সকলেরই বিশ্বাসভাজন ছিলেন। এই বিশ্বাস অপাত্রে বিন্যাস্ত হয় নাই।" হ্যাঁ, একথা ঠিক যে, ক্লাইভ অর্থাৎ ইংরেজ "পাত্র" চিনতে ভুল করেনি। তাই ঈশ্বর বাবুরা 'বিশ্বাসভাজনের' তালিকায় শির্ষে ছিলেন। যে জন্যে বিদ্যাসাগরের চোখে নবাব সিরাজ 'অর্বাচীন' 'নির্বোধ' আর 'ভীতু' বলেই বিবেচিত। যদিও ইতিহাসের সাক্ষী ভিন্নতর। কিন্তু মুশকিল হল, এই ইতিহাস পাঠেই আমাদের অনীহা প্রবল। এ অনীহা প্রায়শই আমাদেরকে বিভ্রান্ত করে। বিশেষ করে 'মিত্র' চিহ্নিত করার ব্যাপারে। তাই সূর্যসেন আর ক্ষুদিরামরা স্বাধীনতার প্রতীক রূপে উঠে আসে। অনেকে এ অসজকে সত্য বলে লুফে নিতে দ্বিধা করেনা। এ দ্বিধা না করার কারণ ইতিহাস অজ্ঞতা। সঠিক ইতিহাস আমরা জানি না। জানানোর চেষ্টা কি আছে? বরং উল্টাই লক্ষ্যগোচর হয় বেশী। এইতো কদিন আগেও ইতিহাসের একটা আলাদা বই ছিল। প্রতিটি শ্রেণীতে

www.pathagar.com

ইতিহাসে পড়ানো হতো একটি একক পাঠ্য বিষয় রূপে। ইদানীং এর যবনিকাপাত ঘটেছে। ইতিহাস এখন সমাজ বিজ্ঞানের একটি অংশ মাত্র। ভাল কথা। ইতিহাসকে আমরা বিজ্ঞানের আসনে আসীন করেছি। কিন্তু এ বিজ্ঞানে যে অজ্ঞান করার জোগাড় হয়েছে! প্রশ্ন আসতে পারে কি ভাবে? প্রথমতো ইতিহাস তার আসল চেহারা হারিয়েছে। এক বইয়ে একাধিক বিষয়ের সমাবেশ ঘটায় ইতিহাসের পরিধি সঙ্কুচিত হয়েছে। সার সংক্ষেপ করতে গিয়ে বাদ পড়ছে বহু উল্লেখ করার মতো ঘটনা। আসলে ঘটনার বিস্তার না থাকলে ইতিহাস জমে না। কারণ ঘটনার ঘনঘটা দিয়েই ইতিহাসের বেড়ে ওঠা। আজকাল আর তা নেই বলেই মনে হয়। আমাদের পাঠ্য পুস্তকগুলোর কথা বলছি। বিশেষ করে স্কুল পাঠ্য বইগুলো। আরো একটি বিষয় লক্ষ্য করার মতো। আজকাল ইতিহাস বইয়ে কোন ছবি– টবির বালাই নাই। আগে ইতিহাস বইগুলোতে ছবি থাকতো। যে ছবি পাঠকের মনে পুলকের উদ্রেক করতো, উৎসাহিত করতো। ছবি আর যে কাজটির আনজাম দিত তা হলো আত্মিক যোগাযোগ। এখন সে যোগাযোগে মারাত্মক খরা। কে না জানে ভারত উপমহাদেশের হাজার বছরের ইতিহাস বলতে মুসলমানেরই উত্থানপতনের ইতিহাস? বখতিয়ার খিলজী থেকে নবাব সিরাজ পর্যন্ত স্রোতধারা ছিল একটাই। বাবর হুমায়ুন বা আওরঙ্গজেবকে এখনকার তরুণরা চিনে না। শেরশাহ বা ঈশাখাঁর চেহারাও তাদের কাছে অপরিচিত। কিছুদিন আগেও এমনটা ছিল না। মুগল বাদশাহ থেকে শুরু করে নবাব সিরাজ পর্যন্ত সবার ছবিই ছাত্র-ছাত্রীদের মানস হৃদয়ে আটকা থাকতো। চিনতে ভুল হতো না। এতে আত্মীয়তার বন্ধন আরো দৃঢ় হতো। এখন ঈশাখাঁ আর শিবাজী গুলিয়ে যায়। অশোক স্তম্ভ আর কুতুব মিনারের ফারাক বুঝতে গবেষক ডাকতে হয়। ইতিহাস বইয়ে ছবি ছাপতে অসুবিধাটা কোথায় বুঝা গেল না। না এটি জগৎশেঠীয় কোন ষড়যন্ত্রের অংশ?

ইতিহাস ব্যাপক বিষয়, তা ঠিক। স্কুলে এ জন্যই এর একটা সাধারণ ধারণার ব্যবস্থা হয়তো বা। মুসিবত হলো স্কুলের পর ইতিহাস আর অবশ্য পাঠ্য তালিকায় থাকে না। ঐচ্ছিক বিষয়ে চলে আসে। তাছাড়া বিজ্ঞানে ইতিহাসের কোন পাঠ নেই। এ কারণেই স্কুলেই ইতিহাসের জ্ঞান ভালভাবে পাওয়া উচিত। কলেজে সে সুযোগের সমূহ অভাব। এ অভাবই স্বভাবে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে শেষাবধি। এ স্বভাব সৃষ্টি করছে ইতিহাস পাঠে অনীহার মত একটি রোগ। ভাসা ভাসা জ্ঞান আদপেই বিপদের। বিভ্রান্তির শত দুয়ার সেখানে খোলা। বিভ্রান্ত হচ্ছিও বারবার। তাই কলেজেও ইতিহাস অবশ্য পাঠ্য তালিকায় আনা প্রয়োজন। উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণী পর্যন্ত অন্ততপক্ষে। কি মানবিক কি বিজ্ঞানে। বিজ্ঞান পাঠকের কি ইতিহাস জানায় বারণ আছে? ইতিহাস অজ্ঞতাতো এক ধরনের অন্ধতারশামিল।

স্বাধীনতার পর পর নাম পাল্টানোর হিড়িক পড়েছিল। মূলত এসব ছিল ইতিহাসের বিকৃতি ঘটানোর প্রক্রিয়া। যেমন রাতারাতি জিন্নাহ হল সূর্যসেন হল হয়ে গেল। কিন্তু বাংলার স্বাধীনতার প্রতীক নবাব সিরাজের নাম তখন কারো মনে আসেনি। মনে আসতে দেয়নি হয়তো বা। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, নবাব সিরাজের নামে এমন কিছুই নেই যা তাঁর স্মৃতিকে ধারণ করতে পারে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে

www.pathagar.com

সিরাজের প্রবেশাধিকার এখন পর্যন্ত রহিত। সে এলাকার কোন কিছুর নামকরণেই নবাব সিরাজের স্পর্শ নেই। কেন নেই তা বোধের অগম্য।

কবি ঈশ্বর গুপ্তের মতে "বাঙালী কাঙ্গাল অপেক্ষাও দুর্বল, সাহসহীন ভীতু।" তার উপর আছে আর একটি মহত গুণ প্রভুভক্তি। মূলত ঈশ্বর বাবু তার যথার্থ ছবিই আমাদেরকে উপহার দিয়েছেন। কিন্তু হঠাৎ করে সূর্যসেনরা 'অরির' ভাব ধারণ করে বিপ্লবী সাজল কোন কারণে? এর সহজ জবাব 'স্বার্থ'। বাবুদের স্বার্থে টান পড়ায় 'ভক্ত' একেবারে 'শক্ত' হয়ে গেল। সূর্যসেনদের 'বিপ্লব' যে এ ভাটি অঞ্চলের সংখ্যাগুরু অর্থাৎ মুসলিম জনগোষ্ঠীর কপাল ফাটানোর বিপ্লব ছিল, সে নেপথ্য কাহিনী অনেকেরই জানা নেই। না জানানোর কোশে-শোরও কি কমতি আছে? আমাদের জাতীয় জাদুঘর স্মরণীয় বরণীয়দের স্মরণ করছে। সূর্যসেনকে স্মরণ করেছে তারা। কিন্তু সিরাজকে তারা স্মরণীয় ব্যক্তি বলে মনে করেনি। পলাশী দিবসও জাতীয় জাদুঘরের স্মরণে আসে না। স্মরণে আনার প্রয়োজন বোধ করে না। তাদের আচরণে তো তাই মনে হয়। পশ্চিম বাংলার ছাত্রদের পড়ানো হয় তিতুমীর একজন 'ডাকাত' ছিলেন, একজন অত্যাচারী এমন কি তিতুমীরকে ধর্ষণকারীরূপে চিহ্নিত করতেও তারা দ্বিধা করেনি, করেও না কোন সময়। অবশ্য এ তাদের স্বভাব। বিশেষ করে মুসলিম জনগোষ্ঠীর ইতিহাসকে কলংকিত করা, তাদের বীরদেরকে মিথ্যা অপবাদে অপমানিত করা। আশ্চর্যের বিষয় আমাদের এক শ্রেণীর ভাড়াটে বুদ্ধিজীবী তখন মুখে তালা দেন আর চোখে পড়েন ঠুলি। বিপরীতে বাবুদের কেউ ডাকাতরূপে চিহ্নিত করলেই এসব বুদ্ধি ব্যবসায়ীরা নর্তন-কুর্দন শুরু করেন। কবি বেনজিরও তো ছিলেন একজন বিপ্লবী, ইংরেজের ত্রাস। কই তাকে নিয়ে তো স্মরণীয় বরণীয়র আয়োজন হয় না। এতেই বুঝা যাচ্ছে আমরা এখনো জগৎশেঠীয় ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করতে পারিনি। জগৎশেঠ-মীরজাফরের এজেন্টরা এখনো সক্রিয়।

তাই, ইতিহাস পাঠ আবশ্যক। তা জীবনের শুরু থেকেই। এতে বিভ্রান্ত হবার ভয় কম থাকে। স্বাধীনতার পক্ষের আর বিপক্ষের লোক চিন্তেও ভুল হয় না তখন। যদি সে ইতিহাস নিরপেক্ষ এবং সঠিক হয়। তখন ঈশ্বর বাবুদের কার্যকলাপও উজ্জ্বল হয়ে উঠে আসে। কাদের কি মহত গুণ সে তথ্যও আর আড়ালে থাকে না। এ জন্যই প্রয়োজন ব্যাপক ইতিহাস চর্চা। এ চর্চা জাতীয় অস্তিত্বকেই কেবল ঘুচায় না, স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্বকেও করে সুদৃঢ়।

২. ৮. ৯৮

www.pathagar.com

'রসবোধ আর রচনাশক্তি সবার থাকে না...'

'আমার কৈফিয়ত' লিখেছিলেন নজরুল। মূলতঃ এ লেখার স্রষ্টা 'শনিবারের চিঠির' সজনী কান্তরা। পারস্যের কবি হাফিজ হয়তো এসব সজনীকান্দদের উদ্দেশ্য করেই লিখেছিলেন, 'অপটু কবিরা হাফিজকে দেখে / কেন ঈর্ষায় হচ্ছ কাতর / রসবোধ আর রচনা শক্তি / সবার থাকে না, দেন ঈশ্বর।'

কয়েকদিন আগে ফররুখ আহমদ সম্পর্কে জনৈক পণ্ডিত ব্যক্তির একটি লেখা পড়তে পড়তে এ কথাকয়টি বারবার মনে পড়ছিল। লেখাটা প্রকাশিত হয়েছে 'বই' নামক একটি মাসিকে। (বলাবাহুল্য, এ লেখার বেশ কিছু অংশ আজ থেকে দশবছর আগেই প্রকাশিত হয়েছিল। যা সংকলিত হয়েছে লেখকের আধুনিক বাংলা কবিতা ঃ শব্দের অনুষঙ্গে নামক পুস্তকে।) দশ বছরের পুরনো ধারণাকে পাণ্ডিত্যপূর্ণ শিরোনামে পুনঃ প্রকাশের পেছনে এমন কি সার্থকতা আছে? যখন সবাই ফররুখের কাব্যকর্ম নিয়ে নতুনভাবে চিন্তা-ভাবনা করছেন তখন বিগত দিনের ধারণাকে এভাবে উগলে দেয়ার অর্থ কি বুঝা গেল না। গত দশ বছরেও ফররুখ সম্পর্কে তার ধারণার কোন পরিবর্তন ঘটেনি বলেই হয়তো এমনটি করে থাকবেন। তার এ লেখায় 'ঈর্ষা' নামক শব্দটি প্রবলভাবে উপস্থিত; এটা হয়তো সত্যসন্ধ কোন পাঠকের চোখই এড়ানোর কথা নয়।

ঈর্ষা শব্দটি সব সময় অসত্য-অর্ধসত্য এবং বিভ্রান্তির বলয়ে আবর্তিত। তাই ঈর্ষা যাদেরকে তাড়িত করে, সত্য তাদেরকে স্পর্শ করে না, করতে পারে না। তাদের সমগ্র চিন্তা, ধ্যান-ধারণাকে আচ্ছন্ন করে অসত্য-অর্ধসত্য এবং বিভ্রান্তি। এ বিভ্রান্তিকে আশ্রয় করেই বেড়ে ওঠে তাদের সমগ্র কর্মকাণ্ড। সমগ্র ইচ্ছা-অনিচ্ছা।

আবার ফররুখ সম্পর্কিত সে লেখার কথায় ফিরে আসছি। সে লেখার লেখক একজন পণ্ডিত ব্যক্তি, সমালোচক এবং কবি। তার পাণ্ডিত্য সম্পর্কে কোন বিতর্কের অবকাশ নেই। নিঃসন্দেহেতিনি একজন গুণীজন। সর্বজন শ্রদ্ধেয়। তবু বলব, ফররুখ সম্পর্কিত তার এ আলোচনাটি বিভ্রান্তির অবকাশ রাখে। যারাই এ লেখাটি পড়েছেন তারাই এ সত্যটি গভীরভাবে উপলব্ধি করেছেন। আর দেখেছেন কিভাবে একটি মহৎ প্রয়াস সদিচ্ছার অভাবে ব্যর্থ হয়ে যায়। যারাই কোন বিশেষ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ফররুখের কাব্য মূল্যায়ন করতে প্রয়াসী হয়েছেন তারা প্রত্যেকেই আবর্তিত হয়েছেন একই বৃত্তে। একই বলয়ে। অর্থাৎ ফররুখ সম্পর্কে পাঠককে তারা একটা অন্ধকারময় ভুবনে নিক্ষেপ করেছেন যে ভুবনে কেবল বিভ্রান্তি আর অসত্যের রাজত্ব। সত্যনিষ্ঠ সমালোচক যে নেই তা বলছি না। তবে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে, ফররুখ

www.pathagar.com

ষড়যন্ত্রের শিকার। বিভ্রান্তির শিকার। এর কারণ ফররুখ নিজেই। তাঁর অবিনাশী কাব্য প্রতিভাই তাঁকে অনেকের ঈর্ষার পাত্র করে তুলেছে। তাঁর ঐশ্বর্যময় কাব্য ভুবন অনেকেরই মনঃপীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে কারণে একটা বিশেষ মহল তাঁকে একটা বিশেষ গণ্ডিতে বন্দী করে রাখার ব্যর্থ প্রয়াস চালিয়েছেন বার বার। কিন্তু তাদের এ প্রয়াস সব সময় বুমেরাং হয়েছে।

বলছি না যে ফররুখের সব কাব্য প্রয়াসই কালজয়ী। তবে তাঁর অধিকাংশ কবিতাই কালকে জয় করার স্পর্ধা রাখে। এ কথাকে যারা অস্বীকার করতে চান তাঁরা সত্যকে চাপা দিচ্ছেন। আর সেটা ইচ্ছাকৃতভাবেই।

ফররুখ সম্পর্কিত সে প্রবন্ধটিতেও এরকমই একটা আভাস দেয়ার চেষ্টা হয়েছে। লেখক কেবল মাত্র 'সাত সাগরের মাঝি'র কবিতাগুলো ছাড়া তার অন্য কবিতাগুলো শিল্পগুণে ততটা উন্নত নয় বলে মত প্রকাশ করেছেন। এটি সমালোচনার একটা গতানুগতিক ধারা। অনেক ফরুরুখ সমালোচকই এ-ভাবে কথা বলেছেন। তদের মতে 'সাত সাগরের মাঝি'কে ফররুখ অতিক্রম করতে পারেননি। এ বিভ্রান্তিকর কথাটার প্রচার একটা উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে। ফররুখের মহাকাব্য হাতেম তায়ী সম্পর্কে প্রবন্ধকার কথা বলেছেন এভাবে, 'প্রথম কাব্যগ্রন্থ বলে 'সাত সাগরের মাঝি'র বাণীভঙ্গি নতুন এবং মধুর ছিল, কিন্তু হাতেম তায়ী কাব্যগ্রন্থের একই বাণীভঙ্গি তাৎপর্যহীন পয়েটিক ডিকশনে পরিণত হয়েছে।' যেখানে সত্যনিষ্ঠ সমালোচকরা বলেছেন, মহাকাব্য হাতেম তায়ীতে ফররুখের কবিতা চরম উৎকর্ষতা লাভ করেছে। উপমা-উৎপ্রেক্ষা ছন্দ এবং শব্দ প্রয়োগের নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা আছে এ বইয়ে। ভাব এবং ভাষার দিক দিয়ে ও হাতেম তায়ী তার অন্যান্য কাব্যকর্ম থেকে অনেক বলিষ্ঠ এবং শিল্পিত।

হৃদয়ের সীমান্তকে প্রসারিত নাইবা করলেন, কিন্তু সত্য ভাষণে এত অনীহা কেন? ফররুখের শব্দ নিয়েও তিনি অনেক প্রশ্ন তুলেছেন। আর ফররুখের মুহূর্তের কবিতার অবিনাশী সনেটগুলোকে সযত্নে পাশ কাটিয়ে গেছেন। যেখানে ফররুখের কাব্যকর্মের একটা বিরাট অংশ তার সনেট। এর কারণ কি তিনিই ভাল জানেন। এ প্রশ্ন তুললাম, কারণ ফররুখের সমগ্র কাব্য প্রয়াস নিয়ে যখন আলোচনা হচ্ছে এ কাব্যটির অনুল্লেখ যে কোন অনুসন্ধিৎসু পাঠককে পীড়িত করবে। তবে এটা ঠিক যে ফররুখ সম্পর্কে তার কথাই শেষ কথা একথা হয়তো তিনিও স্বীকার করেন না। এ বক্তব্যটা ব্যক্ত করেছেন তিনি এভাবে, 'একটি সর্বচেতনার সত্যের কথা আমরা বলি; কিন্তু আমরা প্রত্যেকেই আপন আপন প্রক্রিয়ায় নিজস্ব বক্তব্যকেই উপস্থিত করছি।' আর এটাই চরম সত্য।

মুহূর্তের কবিতা সম্পর্কে মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজ উল্লাহর বক্তব্য 'ফররুখ আহমদের কাব্য গ্রন্থ 'মুহূর্তের কবিতা' পাঠে স্বাভাবিকভাবেই যে অনুভূতিটি আমাদের স্পর্শ করে তা হলো এই যে, আদর্শানুগত্য এবং ঐতিহ্যলগ্ন হয়ে থেকে ফররুখ আহমদ যে কবি-মানসটিকে গড়ে তুলেছেন মূহূর্তের জন্যেও তা চরিত্রভ্রষ্ট হয়নি। 'সাত সাগরের মাঝি' কাব্যগ্রন্থে ফররুখ আহমদের যে মানস-পরিচয় বিধৃত—আলোচ্য কাব্য-গ্রন্থ মুহূর্তের কবিতায়ও সেই মানস পরিচয় ভাস্বর বরং বলা চলে সনেটের সীমাবদ্ধ পরিসর ও

www.pathagar.com

সুনির্দিষ্ট আঙ্গিকের মধ্যেও তা যেন আরো প্রত্যক্ষতায় স্পষ্ট। ঐতিহ্য বোধের যে বিকাশ ফররুখ আহমদের সাত সাগরের মাঝিতে লক্ষণীয়, মুহূর্তের কবিতায় তা ব্যাপকতায় সমৃদ্ধমান।' ইয়েটস-ইলিয়ট এবং ইংরেজী কাব্য কৌশলের কথা প্রায়শঃই বলা হয়। ফররুখ আহমদ এসব থেকে অন্ধকারে ছিলেন না। তিনি সেসব আত্মস্থ করেছেন। আত্মগত হননি অনেকের মতো। শেলি-কিটস্ ফররুখ আহমদকে আন্দোলিত করেছেন। আলোড়িত করেছেন। আবেশিত করেননি। যে কারণে ফররুখ আহমদ একক এবং অনন্য। জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীর ভাষায় বলা যায় 'তিনি কোন কাব্য আন্দোলনের অংশ নন কিন্তু নিজেই একটি আন্দোলন।...

বিতর্কের উঁচু স্বর এখনই নিচু পর্যায় নেমে এসেছে, ভবিষ্যতে আরো আসবে। কারণ যত দিন যাবে ততই এটাপরিষ্কার হয়ে উঠবে যে, তার কবিতার প্রাণরস বাংলা কবিতার সরস মাটিতেই ছিল, অন্য কোথাও নয়।'

গত দশ তারিখ ছিল কবি ফররুখের জন্মদিন। অতিক্রান্ত হল নীরবে। সমগ্র বাঙলা সাহিত্যের যার অবস্থান সূর্যের মতো উজ্জল, তবু তিনি বার বার ষড়যন্ত্রের শিকার হচ্ছেন। ঈর্ষার শিকার হচ্ছেন। বিভ্রান্তির শিকার হচ্ছেন। এই যা দুঃখ। তাই আবার কবি হাফিজের কথা কয়টি স্মরণ করে লেখার ইতি টানছি—'অপটু কবিরা হাফিজকে দেখে/কেন ঈর্ষায় হচ্ছ কাতর?/রসবোধ আর রচনা শক্তি সবার থাকেনা/দেন ঈশ্বর।'

১৯. ৬. ৮৯

www.pathagar.com

'হাতিমি' আর 'হাসঝাড়ু'র দর্শন

বাংলা ভাষায় জগাখিচুড়ি বলে একটা শব্দ আছে। যদিও শব্দটা খাঁটি বাংলা কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ। কারণ, পণ্ডিতেরা 'খাঁটি' নামক লেবেলটি যে শব্দটির শরীরে লেপটে রেখেছেন সে ভাগ্যবান শব্দটি হল ঢেঁকি। অর্থাৎ ঢেঁকি শব্দটিই নাকি সমস্ত বাংলা শব্দ ভাণ্ডারের একমাত্র আদি ও অকৃত্রিম বাংলা। আর বাকিসব মিশাল। আবর্তন বিবর্তন আর ভিন্ন জনের সাথে দোস্তালি করে করে নাকি নিজেদের আসল সুরতটাই হাওয়া করে দিয়েছে। যে কারণে অনেকগুলো শব্দের মাঝখানটায়ই একটা ফাঁকা জায়গা থেকে যাচ্ছে। জগাখিচুড়ি শব্দটার আদলের দিকে লক্ষ্য করলেও দেখা যাবে দৃষ্টির সুক্ষ্ম রশ্মিগুলো জগা এবং খিচুড়ির খোড়ল দিয়ে ওপাড়ে চলে যাচ্ছে। অর্থাৎ খিচুড়ির সাথে জগা শব্দটার জোড়া তেমন জুতসইভাবে লাগেনি। আমাদের বেলায়ও একই কথা, সেই জগাখিচুড়ি। বাংগালীরা নাকি শংকর জাতি। নানা জাতির মিশ্রনে নাকি তারা তৈরী। যে কারণে চেহারা-সুরত, মেজাজ-মর্জি ভিন্ন জনে ভিন্ন রকম। এসব নৃতাত্ত্বিক ইতিহাসের স্পষ্ট উচ্চারণ। রবি ঠাকুরের ভাষায় বলা যায় 'শক-হুণ দ্রাবিড়-মোগল-পাঠান এক দেহে হল লীন।' তার লীন হওয়া যে বিলীন হওয়া না এই উপমহাদেশের ইতিহাসই শুধু নয় এই ভূখণ্ডও তার প্রমাণ।

নাহ! বাংলা ভাষার বিবর্তনের ইতিহাস বা বাংগালী জাতির নৃতাত্ত্বি বিশ্লেষণ এ লেখার বিষয়বস্তু নয়। তাই বিষয় স্থির করার আগে গত লেখার একটি ব্যাপার নিয়ে কিছু কথা বলতে চাই। সে ব্যাপারটা হলো বাংলার সুলতান হোসেন শাহ আর বিশ্বম্ভর মিশ্র অর্থাৎ শ্রী চৈতন্য দেবের সখ্যের কথা। যে সখ্য বাংলার মুসলমানের সাদা মগজকে কালো করে দিয়েছিল। যার জের এখনো বইছে সূক্ষ্ম স্রোতের মতো। হোসেন শাহের ভাগ্যও যে তেমন একটা ফর্সা হয়েছিল তাও কিন্তু নয়। এই পিরিতি তার সর্বনাশই ডেকে এনেছিল। ইতিহাসতো তাই বলে। হোসেন শাহ বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাণহীন দেহে প্রাণ দিয়েছেন, এককালে ব্রাহ্মণ রাজারা যাকে নিহত করেছিল। এজন্য তিনি অবশ্যই প্রশংসার যোগ্য। তিনি রামায়ণ মহাভারতের অনুবাদ করিয়েছেন। এটাও তার উদার হৃদয়ের পরিচায়ক। কিন্তু প্রশ্ন হল তিনি স্ব-সম্প্রদায়ের কথা ভুললেন কি করে? অনেকের অভিমত এটা চৈতন্যদেবের ষড়যন্ত্র। অর্থাৎ চৈতন্যদেবের চক্করে পরে তিনি বিভ্রান্ত হয়েছিলেন। যে বিভ্রান্তির গতিপথে সত্যপীরের আলখেল্লায় সত্যনারায়ণের প্রবেশ ঘটেছিল। সত্যপীরের কাঁধে ভর করে পৌত্তলিক বিশ্বাসের পরিধিকে দীর্ঘতর করা হয়েছিল। এর মদদ যুগিয়েছিলেন একজন মুসলিম শাসক। যে কারণে তার শাসন

www.pathagar.com

আমলকে বাবুরা চিহ্নিত করেছেন 'রামরাজত্বে'। হোসেন শাহকে বলা হয়েছে 'জগত ভূষণ' 'কৃষ্ণ অবতার' আরো কতো কি। কিন্তু যখনই হোসেন শাহ এই অতি ভক্তির আড়ালে আবিষ্কার করলেন ষড়যন্ত্রের কালো ফণা তখনই ভক্তদের কণ্ঠে ভিন্ন সুর। বলা হলো 'তথাপি যবন জাতি না করি প্রতিতি'। চৈতন্যদেবও সেদিন থেকে উধাও হয়ে গেলেন। যার সন্ধান একান্ত ভক্তরাও কোন দিন পায়নি।

চৈতন্যদেব প্রচার করতেন গৌড়িয়া বৈষ্ণব মত। যে মতের জন্ম পনরশ' ছয় সালে নদীয়ায়। এই মতের মূলমন্ত্র ছিল নাকি 'নামে রুচি, জীবে দয়া'। এই মূলমন্ত্রের নমুনাটা হল এরকম– 'নদীয়ার একান্তনগর সিমুলীয়া/নাচিতে নাচিতে প্রভু উত্তরিল আসিয়া/আসিয়া কাজীর দ্বারে প্রভু বিশ্বম্ভর/ক্রোধাবেশে হুঙ্কার করে বহুতর/ক্রোধে বলে প্রভু আরে কাজি বেটা কোথা/ঝুটি আন ধরিয়া, কাটিয়া ফেল মাথা/নির্যবন করো আজি সকল ভুবন/পূর্বে যেন বধ কৈলু সে কাল যবন/প্রাণ লভ! কোথা কাজি গেল দিয়া দ্বার/ঘর ভাঙ্গ ভাঙ্গ প্রভু বলে বারবার। ...মহামত্তম সর্ব্বলোকে চৈতন্যের রসে ঘরে উঠলেন সবে প্রভুর আদেশে/কেহ ঘর ভাঙ্গে কেহ ভাঙ্গে দুয়ার / কেহ লাথি মারে কেহ করে হুঙ্কার। ...সংকীর্তন আরম্ভে মোহোর অবতার / কীর্তন বিরোধী পাপী করিমু সংহার / তপস্বী-সন্নাসী জ্ঞানী যোগী যে যে জন / সংহারিব সব যদি না করে কীর্তন / অগ্নি দেহ ঘরে তোরা না করিহ ভয় / আজি সব যবনের করিমু প্রলয়।" চৈতন্য দেবের 'নামে রুচি জীবে দয়ার' নমুনাটা তো শ্রী চৈতন্য ভগবতে এভাবেই প্রকাশ করা হয়েছে। তবু একজন গতায়ু পণ্ডিত তাঁর মুসলিম বাংলা সাহিত্য বইয়ের এক জায়গায় বলছেন, "এই মতবাদ ইসলামকে মানিয়া লইয়া প্রগতিশীল হইয়া উঠায় দেশে স্থায়ী ও বিস্তৃত হইতে সমর্থ হয়।" যার অবতারের উদ্দেশ্যই ছিল পৃথিবীকে মুসলিম (যবন) শূন্য করা সেখানে 'ইসলামকে মানিয়া লওয়া' অর্থ কি? না, তার এই মতটা প্রগতিশীল তথা বৈষ্ণবীয় চিন্তার ফসল! যে চিন্তা-ভাবনা এখনো অনেক পণ্ডিতি মগজকেই মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে? আমাদের অনেক পণ্ডিত আছেন যারা চিন্তা-ভাবনায় একেবারে দিল দরিয়া। তারা দুর্গাপূজা আর নামাজ-রোজাকে এক করে ফেলার পক্ষপাতি। যদিও বিশ্বাসগুলো দুই বিপরীত মেরুর অধিবাসী। যার ব্যবধান দুস্তর। তারা সুকুমার রায়ের মত হাঁসের পিঠে সজারুর কাটা জুড়ে দিয়ে হাসঝাড়ু, আর হাতীর পিঠে তিমিকে চড়িয়ে দিয়ে হাতিমি বানানোর পক্ষপাতি। আদতে যা কল্পনারই বিষয়। বাস্তবে যার অস্তিত্ব বিরাট একটি রম্ভা। সুকুমার রায়ের ভাষায় যদি বলি তাহলে বলতে হয় এভাবে 'হাঁস ছিল সজারু (ব্যাকরণ মানি না)। হয়ে গেল 'হাঁসজারু' কেমনে তা জানি না। বক কহে কচ্ছপে—বাহবা কি ফুর্তি। অতি খাসা আমাদের বকচ্ছপ মূর্তি।' আমাদের তথাকথিত পণ্ডিতদের ধ্যান-ধারণার আদলটাও সুকুমার রায়েরই অনুগামী। এক কথায় যার নামকরণ করা যায় 'জগাখিচুড়ি'। যদিও সুকুমার রায় তার কল্পনার শিরোনাম দিয়েছেন খিচুরি। তবে যাইহোক, পণ্ডিতদের জন্য সুসংবাদ, হোসেন শাহ সত্য নারায়ণের পাঁকে পড়েও অবশেষে পাগল হননি। তাল তার ঠিকই ছিল। আমাদের তথাকথিত পণ্ডিতদের জন্যেও এই আশাবাদ। শ্রী চৈতন্যের চক্করে একেবারেই মক্কর না ধরলে চৈতন্য তাদের ফিরবেই।

জৈষ্ঠ / ৮৯

www.pathagar.com

কিতনা বদনসিব হে জাফর

আসলে এটাই নিয়ম। ইতিহাসের সত্য বারবার উঠে আসে। একে ধামাচাপা দেবার কোন জো নাই। চোরের মার গলা যতই উচ্চকণ্ঠ হোক না কেন। চোর ধরা পড়বেই শেষাবধি। আর সাধু ফিরে পাবে তার সম্মান। ইতিহাসের এই ধারাক্রম। অবশ্য সে ইতিহাস যদি অনুসন্ধানী আর বিবেচক হয়। তবে প্রতারক ইতিহাসের ইতি ঘটে বৈকি, হাজার বছর পর হলেও। যেমন বাহাদুরশাহ জাফর আবার ইতিহাসের বীর নায়ক। স্বাধীনতাকামী মানুষের নেতা। বৃটিশ বেনিয়ারা যাকে চিহ্নিত করেছিল দেশের শত্রু আর ধ্বংসকারীরূপে। কিন্তু ইতিহাস শত্রু চিনতে ভুল করে না। সম্প্রতি ভারতের প্রধানমন্ত্রী সে সাত্যটাই পুনরুল্লেখ করলেন তাঁর রেঙ্গুন সফর প্রাক্কালে এই বলে, "দোগজ জমিন তো/ না মিলে হিন্দুস্তান মে/পর তেরি কুরবানী সে/ উঠি আজাদী কি আওয়াজ/বদনসিব তো নেহি জাফর/ জোরাহে তেরা নাম ভারত কি শান আওর শওকত মে।"

বলা বাহুল্য, বাহাদুর শাহ জাফরের নেতৃত্বেই এদেশে আজাদীর আওয়াজ উত্থিত হয়েছিল ইংরেজ দুঃশাসনের বিপক্ষে, ১৮৫৭ সালে। যাকে ইংরেজরা নাম দিয়েছিল সিপাহী বিপ্লব বলে। আদতে এ ছিল উপমহাদেশের মানুষের স্বাধিকার আদায়ের প্রথম প্রচেষ্টা। যা কি না তারা হারিয়েছিল পলাশীতে, সিরাজের পতনের পর।

বাণিজ্য করতে এসেছিল ইংরেজ। বেনিয়া থেকে এক লাফে শাসক। এ শাসক পর্যন্ত পৌঁছার কৌশল ছিল ধুর্ততা আর ষড়যন্ত্র। ইতিহাসের পাতা ঘাঁটলেই ইংরেজদের এ চারিত্রিক অবস্থানটা উজ্জলভাবে উঠে আসে। প্রায় দু'শ' বছর আমরা ইংরেজের গোলাম ছিলাম। তাদের আমলে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার ছিল না। অত্যাচার আর নির্যাতন এই ছিল নিত্যদিনের সাথী। অবশ্য এ অবস্থা কেবল এ উপমহাদেশেই নয়, সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজরা বিশ্বের অনেক এলাকারই এমন চেহারায় নিজেদের প্রতিষ্ঠা করেছিল। কোন কোন এলাকায় এখনো তাদের পূর্ব চেহারা বিরাজমান। আয়ারল্যান্ডের কথা নাইবা উল্লেখ করলাম।

বাহাদুর শাহ পরাজিত হয়েছিলেন। তাঁকে এবং তাঁর পরিবারকে গ্রেফতারের পর একটি গরুর গাড়ীতে করে রাজধানীতে আনা হয়েছিল। যদিও ইংরেজরা তাঁকে আশ্বাস দিয়েছিল তাঁর বা তাঁর পরিবারের কোন অসম্মান করা হবে না। এ আশ্বাসে বাহাদুর শাহ আত্মসমর্পণ করেছিলেন। কিন্তু মিথ্যাবাদী ইংরেজ করল তার উল্টা ব্যবহার। বিনা কারণে সম্রাটের দুই পুত্র আর তার নাতিকে রাস্তায় উলঙ্গ করে গুলী করে মারল

www.pathagar.com

সেনাপতি হডসন। কেবল তাই নয় তিন দিন ধরে চলল মানুষ মারার মহড়া। শহরের প্রায় ছাব্বিশ হাজার নিরীহ মানুষ মারা পড়ল ইংরেজের গুলীতে। কিন্তু আজবতম ব্যাপার এজন্য হডসনকে কোন কৈফিয়ত পর্যন্ত দিতে হয়নি। বরং তার গলায় ঝুলল বীরের তগমা। মানবতার বন্ধুর কি সুন্দর চেহারা।

বাহাদুর শাহ নির্বাসিত হয়েছিলেন রেঙ্গুনে, ইংরেজের বিচারে দোষী সাব্যস্ত হয়ে। সেখানেই ইন্তেকাল করেন। তিনি একজন উঁচুদরের কবিও ছিলেন। তাই তিনি তার ভাগ্যের এ পরিসমাপ্তিতে আক্ষেপ করে লিখেছিলেন– "কিতনা বদনসিব হায় জাফর/ দাফন কে লিয়ে দোগজ যমীন ভি নামিলি।" যা তাঁর কবর গাহে লিখা রয়েছে। বলা বাহুল্য বাহাদুর শাহর এ আক্ষেপের প্রেক্ষিতেই ভারতের প্রধানমন্ত্রী তার পূর্বোক্ত কথাগুলো লিখে এসেছেন স্বাধীনতা প্রয়াসী বীর যোদ্ধার সম্মানে, মাজারে রক্ষিত বইয়ে।

বাহাদুর শাহর উত্থান আর পতনের ইতিকাহিনী ইতিহাস পাঠকের কমবেশী জানা। তবু এ কাহিনী পাঠকের কাছে পুনর্বাক্ত করছি। কারণ বাহাদুর শাহর বিপরীতে যাদের অবস্থান তাদের চেহারা অনেকের কাছেই পুরাপুরি খোলাসা নয়। চোরের মার সব সময় গলা থাকে বড়। এ গলাবাজির কারণে আসল চাপা পড়ে নকল ভেসে ওঠে। যদিও তা সাময়িক। তবু এ সাময়িক অবস্থাটাও সমূহ বিপদের কারণ হয়। হয়েছেও অনেক সময়। দেখা যায় সমাজে এমন অনেক মানুষ আছেন যারা অন্যকে সৎ উপদেশ দিতে খুবই উস্তাদ, কিন্তু নিজের কর্ম ঠিক তার বিপরীত। বৃটিশ বেনিয়াদের অবস্থাটাও তেমনি। স্বাধীনতার কথায়, গণতন্ত্রের কথায় মুখে ফেনা ওঠে, গলা বসে যায়। কিন্তু অন্যের স্বাধীনতা গ্রাসে তাদের জুড়ি নাই। যার প্রক্ষিতে আমাদের ভাগ্যে আসে পলাশীর বিপর্যয়। এর পরও চৈতন্যে অবসাদ কাটে না আমাদের।

বাহাদুর শাহকে বন্দী করে চোর ডাকাতের মত রাখল ইংরেজরা। একটি খাটিয়ায় এককালের মোগল সম্রাট মাথা নিচু করে শুয়ে থাকতেন। আর পাশে রাখা ছিল একটি হাতল ভাঙ্গা চেয়ার। তার পরিবারের অন্যদের ভাগ্যেও এর চেয়ে ভাল কোন ব্যবস্থা হয়নি। বৃটিশ বেনিয়ারা যে মানির মান দিতেও জানে না এ ছিল তার একটি উজ্জল উপমা। সে সময় ঢাকার দেশী সিপাইরাও স্বাধনিতার সপক্ষে আওয়াজ তুলেছিল। কিন্তু ইংরেজ সে আওয়াজকে বুলন্দ হতে দেয়নি। সে সব বীর সিপাইদের কণ্ঠকে স্তব্ধ করেদিয়েছিল ফাঁসিতে লটকিয়ে। এখন যার নাম বাহাদুর শাহ পার্ক আগে এ জায়গাটির নাম ছিল 'আন্টাঘর ময়দান'। সে ময়দানে ছিল বড় বড় গাছ, সেসব গাছের ডালে ডালে সিপাইদের লাশ দীর্ঘদিন ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল। ঝুলানোর উদ্দেশ্য ছিল ভীতিকে চারদিকে ছড়িয়ে দেওয়া। কাজ হয়েছিল এতে। এ পথে কেউ চলাফেরা করত না সহজে, ভয়ে। তারা তাদের আসল চেহারা এভাবেই মেলে ধরেছিল। আধমরা সেপাইদের তারা মাটি চাপা দিতেও দ্বিধা করেনি। এ ইতিহাসের তথ্য। লালবাগের দেশী সিপাইদের পরাজিত করে কিছু ফাঁসিতে ঝুলানোর পর ইংরেজরা অন্যদের মাটিচাপা দিয়ে মারে। এখন যেখানে জেলখানা সে এলাকায় ছিল শায়েস্তা খাঁর দুর্গ। এ দুর্গের ভেতরেই ছিল একটি শুকনো পুকুর। এ পুকুরেই মাটি চাপা দিয়ে রাখা হয়েছিল

www.pathagar.com

অনেক বীর সিপাইকে। গভীর রাতে নাকি আশেপাশের এলাকার মানুষেরা শুনত সেখান থেকে ভাই পানি ভাই পানি বলে শব্দ আসছে। শোনা যায় বর্বর ইংরেজ মৃত্যুকালে তাদেরকে পানিটুকু পর্যন্ত দেয়নি। যদিও সভ্য বলে যারা নিজেদের জাহির করে যত্রতত্র। স্বাধীনতাকামী মানুষের, গণতন্ত্রকামী মানুষের একান্ত বান্ধব বলে যাদের পরিচয়ের ব্যাপ্তি বিশ্বময়।

একথা হয়তো মিথ্যা প্রমাণ করা যাবে না, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ইংরেজ জাতির যে চেহারা এদেশে রেখে গেছে তা মোটেই সুখকর বা শোভন নয়। নিজের বাণিজ্যের স্বার্থে যারা অন্য দেশের তাঁতীর আঙ্গুল কেটে দিতে পারে তাদের চারিত্রিক অবস্থানটা কোথায় তা একজন অক্ষরজ্ঞান শূন্য মানুষের কাছেও পরিষ্কার। যে মসলিন কাপড়ের জন্য একদিন বাংলাদেশ ছিল বিশ্বের গৌরব সে শিল্পকে শিকড়সমেত উপড়ে দিয়েছিল বৃটিশ। মসলিন যারা বুনতো সেসব তাঁতীদের আঙ্গুলই তারা কেটেছিল। এ আচরণ বর্বর না অসভ্যতার প্রতীক? আদতে যাদের কর্মের আর মর্মের দূরত্ব এতটা দুস্তর তাদের উপদেশ-উচ্ছ্বাস যে মোটেই কণ্টকহীন নয় তাতে সন্দেহের অবকাশ থাকে বৈকি। ইদানীং আমরা অনেকেই পুলক অনুভব করি তাদের আচার-আচরণে। বান্ধবের আসনটা খালি করে দেই তাকে। কিন্তু একবারও ভাবি না বাহাদুর শাহ জাফরের পরিণতির কথা। কেবল বাহাদুর শাহ নয় এ দেশের মানুষ যে ইংরেজের পশুসুলভ আচরণের শিকার হয়েছিল একদিন, সে কাহিনী যেন আমরা ভুলতে বসেছি একেবারে। মনে হয় ভুলানোর কোশেশ হচ্ছে নানা কৌশলে। তবে ইতিহাসের সত্যি উঠে আসে বার বার। চোরের মার গলা যতই বড় হোক না কেন বাহাদুর শাহরা সব সময়ই বাহাদুরের মতই ইতিহাসে চিহ্নিত হন। আর মানুষের স্বাধীনতা হত্যাকারকরা ধিক্কৃত সর্বকালে। এটাই নিয়ম।

২৪. ১২. ৮৭

www.pathagar.com

সাহিত্য ও প্রকাশনা

আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতি হিন্দুস্থানী আধিপত্যবাদের শিকার। বিশেষ করে স্বাধীনতা উত্তরকাল থেকে আজ অবধি। একথাটা নানাভাবে সভা সেমিনারে বলাবলি হচ্ছে। কারা বলছেন? বলছেন তারাই যাদের স্বদেশের প্রতি সামান্যতম হলেও প্রীতিবোধ আছে। কাগজের পৃষ্ঠায়ও এ ব্যাপারে আলোচনা-সমালোচনা হয়। তবে মাঝে মধ্যে। কবুল করতে দ্বিধা নেই যে বাংলাদেশ এখন হিন্দুস্থানী বাই আর পত্র-পত্রিকার একটি উর্বর বাজার। বিশেষ করে পশ্চিম বঙ্গের বইপত্র এখানে 'হট কেক'। এ সুবাদে কতিপয় লোভী ব্যবসায়ী ফুলে ফেঁপে ঢোল হবার যোগাড়, স্বদেশী সাহিত্য সংস্কৃতির মাথায় কুড়াল মেরে। আসলে ব্যবসায়ীরাই এ সাহিত্য সাংস্কৃতিক আধিপত্যবাদকে লালন করছে। অবশ্য এ ব্যবসায় প্রকারভেদ আছে। প্রকারভেদটা হলো দুরকম। এক. বইপত্র বৈধ-অবৈধভাবে বেচাবিক্রিতে অর্থ সময় আর মেধাকে কজে লাগিয়ে। দুই. নগদ অর্থ কিংবা প্রতিষ্ঠার লোভে হিন্দুস্থানী এ আধিপত্যবাদকে প্রতিরোধের পরিবর্তে বুদ্ধিবৃত্তিক সকল প্রকার সহায়তা এবং সহায়তার প্রতিশ্রুতি। সাহায্য-সহযোগিতা ভাল। কিন্তু তাই বলে নিজের গলা কেটে নয়। তিক্ত হলেও সত্য যে আমরা সেই নির্বোধের ভূমিকায়ই অভিনয়ে ব্যস্ত। এ অভিনয় কেউ সজ্ঞনে আর কেউ অজ্ঞানে করি। যে জন্যে এ আধিপত্যের হাত কেবল প্রসারিতই হচ্ছে।

ঢাকার বাজারে কলকাতার বইপত্রের দেদার কাটতি। কেবল অভিজাত দোকানই নয় মায় ফুটপাতেও। প্রায়শই শোনা যায় এ দেশে পাঠকের বড় বেশী অভাব। যদি কথাটা সত্যি হয় তাহলে এসব বইপত্র কারা কিনে? আদতে এমন ধারণা সঠিক নয়। অভাব পাঠকের নয়—লেখক আর লেখাকে শোভনভাবে পরিবেশকের। দেশে শক্তিশালী লেখক-চিন্তাবিদের অভাব নেই। কিন্তু তাদের চিন্তা-ভাবনাকে প্রকাশের ত্রুটি আর পরিবেশনার অপরিপক্কতার কারণে পাঠকের আগ্রহ সৃষ্টিতে তারা ব্যর্থ হয়।

দেশে কি পত্র-পত্রিকার কমতি আছে? প্রায় প্রতিদিনই নতুন নতুন পত্রিকার জন্ম হচ্ছে। এরপরও কলকাতার পত্রিকার প্রতি পাঠকের নজর। আমরা যেন রাজনীতি ছাড়া আর কিছু বুঝি না। শুরুতেই ললাটে রাজনীতির জয়টিকা মেখে বাজারে নামে পত্রিকাগুলো। কেবল তাই নয় অপরিপক্ক আর অশালীন ভাষা ব্যবহার তো আছেই। যে জন্যে সচেতন আর পরিশীলিত পাঠক দু'এক সংখ্যার পর সেদিকে চোখের দৃষ্টিকে নোয়ায় না। এসব পত্র-পত্রিকা জন্ম থেকেই বিকারগ্রস্ত থাকে। তাদের ধর্মইই যেন কোন ব্যক্তিত্বের, প্রতিষ্ঠানের বা কোন রাজনৈতিক দলের চরিত্র হনন করা। এটাই যেন

www.pathagar.com

তাদের ব্যবসা। কয়েকশ' ম্যাগাজিন টাইপ পত্রিকা আছে বাজারে, সব কটির চরিত্রই প্রায় একই রকম। এদের ব্যবসা হলো সত্য মিথ্যা জড়িয়ে কোন ব্যক্তি চরিত্র অথবা দলীয় চরিত্রকে বেহুদা আক্রমণ করা অশালীন ভাষা আর সাংবাদিকতার সব নীতিমালাকে পরিহার করে। ফুটপাতে এখন পত্রিকার ছড়াছড়ি। এত পত্রিকা যে হকাররাও সবগুলোর নাম জানে না! এগুলোর প্রায় সবকটার চেহারাই কমবেশী এক রকম। তারা জোট বেঁধে যেন চরিত্র হননের ব্যবসায় নেমেছে।

পাঠক বিদেশী পত্র-পত্রিকা বেশী কিনে। কেন কিনবে না? ভাল জিনিসের প্রতি মানুষের সহজাত আকর্ষণ। বস্তাপচা রাজনীতির পাঁচালি সে সব পত্রিকায় থাকে না। ভাষার অপরিপক্কতা আর পরনিন্দার খিস্তি-খেউড় থেকে সে সব পত্র-পত্রিকা এক প্রকার মুক্ত। মুদ্রণ পরিপাটিতেও তারা অনেক উন্নত। এর পাশাপাশি ঢাকার পত্র-পত্রিকাগুলোর অবস্থান কোথায়? কোন রকমে একখানা পত্রিকা প্রকাশ করতে পারলেই আমরা যেনো এককজন রাজনীতির পণ্ডিত সেজে বসি। রম্যধর্মী প্রায় সবকটা পত্রিকাই অভিন্ন চরিত্রের। হয় রাজনীতি না হয় নোংরা যৌন সুড়সুড়িমূলক আবেদনে থাকে ভরা। যে জন্যে সচেতন এবং পরিশীলিত পাঠক তারা ধরতে ব্যর্থ হয়। পাঠক নাই তা নয়। পাঠক পড়তে চায়। বেশী মূল্য বইপত্র বিক্রির অন্তরায় নয়। আদতে এর আসল অন্তরায় পাঠের খোরাক আর পাঠ্য বস্তুর চেহারা-সুরত।

আমরা সাহিত্য-সংস্কৃতির অংগনে হিন্দুস্থানী আগ্রাসনের শিকার এ উচ্চারণে কোন ভুল নেই। কিন্তু এ আগ্রাসনের মোকাবিলা করার কোন প্রস্তুতি আমাদের নেই। এ প্রস্তুতির কোন লক্ষণও নজরে আসে না। যতদিন এখানে ভাল জিনিস ভালভাবে পরিবেশিত না হবে, ততদিন এ আগ্রাসন থেকে আমাদের নিস্তার নেই। ভাল জিনিস যে আমাদের নেই, তা নয়। সেই ভাল বস্তুকে ভালভাবে, সুন্দরভাবে উপস্থাপনের, পরিবেশনার যে সচেতনতা আর সদিচ্ছার প্রয়োজন, তা-ই আমাদের নেই। তবে সজ্ঞানে যাঁরা এ আগ্রাসনের পৃষ্ঠপোষকতা করে, তাদের কথা ভিন্ন। তাই এখন দরকার সদিচ্ছাকে জাগ্রত করা আর লেখার নামে প্রকাশনার নামে যে সব ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এদেশের সাহিত্য সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার পাঁয়তারা করছে তাদেরকে চিহ্নিত করা তাদের অপকর্মের শিকড়কে উপড়ে ফেলা।

৪. ১১. ৮৭

www.pathagar.com

পলাশীর পলাশ ফুল

তেইশে জুন পলাশীর বিপর্যয়। এবং ২৪শে জুন বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার রাজধানী মুর্শিদাবাদ ত্যাগ, পরাজয়ের গ্লানিকে সঙ্গী করে। যে বিপর্যয় বিদেশীর আধিপত্যকে বিস্তারে সহায়তা করেছিল। আর এ দেশবাসী হারিয়েছিল স্বাধীনতা। এটিই ইতিহাসের ভাষ্য। কিন্তু এ ইতিহাস যেন ইতির দিকেই হাটছে দিনকে দিন। তা না হলে পলাশী নিয়ে ব্যাপক আলোচনা নেই কেন? পলাশীর বিপর্যয়ের যে সকল কার্যকরণ এর উৎসে চোখ রাখতে এ অনীহা কেন? না পলাশী তথা তেইশে জুন তারিখটিও জুন ষড়যন্ত্রের শিকার। গত পঁচাশিতেও এ ধারণাকে পাঠকের সামনে হাজির করেছিলাম। তেইশে জুনকে অন্ধকার থেকে জোসনায় আনার ব্যর্থ চেষ্টা করেছিরাম। ব্যর্থ চেষ্টা বললাম এ কারণে যে, লেখালেখি বা বলারবলির পরও আমাদের চৈতন্যে তেমন কোন বাতাস খেলেনি। যে জন্যে তেইশে জুন নীরবে আসে নীরবে যায়। আর পলাশীর বাতাস শুধু গুমরেই কাঁদে। হয়তো হাসেও কখনো কখনো এ বোধহীন জাতির কাণ্ডকারখানা প্রত্যক্ষ করে। গত পঁচাশির লেখার ইতি টেনেছিলাম এভাবে– তেইশে জুন ঘটা করে পালিত না হবার পেছনে কি এই কারণ যে, এতে করে অনেক পেয়ারা বন্ধুর চেহারা থেকেই মুখোশ খসে পড়ার সমূহ সম্ভাবনা? আমি তো মনে করি অনেক কারণের মধ্যে এটাও একটা কারণ। বলা যায়, তেইশে জুন তারিখটিও এক ধরনের ষড়যন্ত্রের গ্যাড়াকলে আটকা। আর এ চক্রান্তের নায়কও তারাই, যারা পলাশীতে সিরাজের অস্তিত্বকে নিঃশেষ করে দিয়েছিল। ষড়যন্ত্র করে দেশের স্বাধীনতাকে সঁপে দিয়েছিল বিদেশী শক্তির করতলে। তাই তেইশে জুন যত উচ্চারিত হবে, যত উদ্ভাসিত হবে ষড়যন্ত্রের শিকল হবে ততই শিথিল। আমরাও আগামী কোন অজানা বিপর্যয় থেকে পাব রেহাই সার্বিক ভাবে। তবে কথা হলো যদি আমরা তেইশে জুন থেকে তেমন কোন শিক্ষা আহরণ করতে পারি সচেতনভাবে। আসলে চেতনাহীনতাই সব বিপর্যয়ের মূল। যেমনটা পলাশীতে ঘটেছিল।

এই সাতাশিতে এসেও দেখছি সেই গত ধারণার অবস্থানগত বা পরিবেশগত তেমন কোন হেরফের ঘটেনি। যে জন্য পলাশী দিবস বা পলাশী সংক্রান্ত বিষয়াদি নিয়ে কোন উচ্চারণ উচ্চকিত হয় না। হতে দেখি না। ষড়যন্ত্রকারী জগৎশেঠ, রায়দুর্লভ এবং বিশ্বাসঘাতক মীর জাফর-ইয়ার লতিফদের কার্যকলপের ব্যাপারেসচেতন হবার জন্যেই প্রয়োজন ঘটা করে পলাশী দিবসকে উদ্‌যাপন করা। কিন্তু করছি কি? করব কি করে? পলাশীর যুদ্ধ কবে হয়েছিল তা আমরা ক'জনে বলতে পারব? স্কুল কেন কলেজ-

www.pathagar.com

বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের কত অংশ এ ব্যাপারে জ্ঞাত? শতকরা দশ শতাংশ হবে কি না সে নিয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে বৈকি। এ সন্দেহের কারণ আমাদের শিক্ষাক্রমে ইতিহাস পাঠের অবস্থান দেখে। স্কুল জীবনের পর ইতিহাস যেন গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। ইতিহাস পড়ায় তেমন বাধ্যবাধকতা থাকে না তখন। তাই বখতিয়ার খিলজীর বাবা যদি তিতুমীরকেই কেউ সাব্যস্ত করে বসে তাহলেও তাকে তেমন কোন দোষ দেয়া যায় না। তাই পলাশী তথা তেইশে জুন সম্পর্কেও ঐ একই কথা।

অবশ্য এ হলো অচেতনদের কথা। যারা বোধহীন তাদের কথা। কিন্তু যারা সচেতন বা বোদ্ধা তারা? তাদের আচার-আচরণেও তো তেমন কোন অদল-বদলের নিশানা ফোটে না কোন তেইশে জুনেই! কত বিষয়ইতো তাদেরকে উদ্বেলিত করে, আবেশিত করে। শহীদ মিনার কিম্বা বায়তুল মোকাররমের চত্বরে শপথে দৃঢ় করে তাদের বাহু। কিন্তু কই কোন কালেই তো তারা শহীদ মিনারে এসে তেইশে জুন তথা এ পলাশী দিবসের পৃষ্ঠাকে মেলে ধরতে দেখিনি। শপথ নিতে দেখিনি তাদের বিপক্ষে যারা বিদেশীর স্বার্থে দেশের স্বাধীনতার বিপক্ষে, জনগণের ইচ্ছার বিপক্ষে ষড়যন্ত্র করে তাদের বিরুদ্ধে। পলাশীর বিপর্যয়ের কারণ এ চরিত্রের মানুষেরাই। তাদের সম্পর্কে সাবধান হওয়া দরকার। কারণ এখনো এরা অস্তিত্বহীন হয়নি। এ ধরনের ভাষ্য আজো উচ্চারিত হয়নি আমাদের সেইসব 'সচেতন' মানুষজনদের কণ্ঠ থেকে। যারা প্রায়শই বিবৃতি দেন। কাগজে নিজেদেরকে বুদ্ধিজীবী চিহ্নিত করে। তারা বরাবরই তেইশে জুনে শীতল থাকেন। শান্ত থাকেন। যদিও অনেক অনুল্লেখ্য ব্যাপারে তারা শহীদ মিনারের সিঁড়িতে ঝড় তোলেন। তবে এর পশ্চাতে কি কারণ তা অবশ্য জানা নাই। এখানেও কোন স্বার্থ ক্রিয়াশীল কি না কে জানে।

আসলে পলাশী দিবস ঘটা করে উদযাপন করতে হবে এমন কোন কথা নেই। তবে পলাশী যে আমাদের জীবনের অনেক স্বপ্নকেই উলটপালট করে দিয়েছে, তা হয়তো বলার অপেক্ষা রাখে না। তাছাড়া পলাশী দিবসে এর কারণগুলো আলোচিত হলে ষড়যন্ত্রকারী তথা দেশের শত্রু-মিত্রের চেহারা যেমন স্পষ্ট হয়, ঠিক তেমনি অনেক ভুল-ভ্রান্তির ব্যাপারেও সজাগ হওয়া যায়। সজাগ হওয়া যায় জগৎশেঠ আর রায়দুর্লভদের উত্তরসূরী সম্পর্কেও। তাই পলাশী দিবস প্রতিবছরই ভালোভাবে উদযাপন করা প্রয়োজন। প্রয়োজন এ দিবসের ভালোমন্দকে পাঠকের নজরে তুলে এনে প্রতিটি পত্রিকার বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা। এতে আমাদের দুঃখের ওজন হয়তো কিছুটা বাড়বে। তবে আগামী কোন অজানা বিপর্যয়কে রোধ করতে পারবে এই আয়োজন। এতে করে হয়তো কোন সিরাজকে আর মুর্শিদাবাদ ত্যাগ করতে হবে না, বিফলতার বোঝা সাথে করে।

২৪. ৭. ৮৭

www.pathagar.com

নজরুল এবং টুপি বিতর্ক

নজরুল আমাদের জাতীয় কবি। জাতীয় কবি কারণ তাঁর কবিতা আমাদের চিন্তা চেতনার প্রস্ফুটন ঘটায়। আমাদের জাতিসত্তার প্রতিফলন ঘটায়। আমাদের ধ্যান-ধারণার প্রতিধ্বনি করে। এ জন্যেই জাতীয় কবির সিংহাসনে জনগণ তাদের প্রিয় কবি নজরুলকেই অভিষিক্ত করেছেন। যদিও এ বিষয়টি এখন বিতর্কেয়র বাইরে। মীমাংসিত সত্য। তবু বিতর্কের অবতারনা করে কেউ কেউ। নির্বোধের মতো। নির্লজ্জের মতো বললেও হয়তো তেমন দোষের হবে না। কারণ জনতার কাঙ্ক্ষিত বাসনাকে উপেক্ষা করার শামিল এ জাতীয় বিতর্ক। এমনি একটি বিতর্কের লেখ্যরূপ দেখেছিলাম গত মে মাসে। তা ছিল মতিঝিল থেকে প্রকাশিত একটি বাংলা দৈনিকের পৃষ্ঠায়। তাদের মতে বাংলাদেশের জাতীয় কবি নাকি দু'জন। তারা হলেন নজরুল আর রবীন্দ্রনাথ। যুক্তি হিসাবে দেখানো হয়েছে রবীন্দ্রনাথ আমাদের জাতীয় কবি কারণ তাঁর গান আমাদের জাতীয় সংগীত। নজরুল আমাদের জাতীয় কবি কারণ তার গান আমাদের সমর সঙ্গীত। যুক্তিটি অভিনব বটে। জাতীয় সংগীতের সাতে জাতীয় কবির কি সম্পর্ক থাকতে পারে জানা নাই। জাতীয় সঙ্গীতের লেখক তো যে কোন ব্যক্তি হতে পারেন। তাকে জাতীয় কবি হতে হবে এমন কোন শর্ত নেই। হাফিয জলন্ধরী পাকিস্তানের জাতীয় সংগীতের রচক। তাতে কি। তাদের জাতীয় কবি ইকবাল। মার্কিনীদের জাতীয় কবি হুইটম্যান। জাতীয় সংগীত কি তার লেখা? রাশিয়ার জাতীয় কবি তো মায়াকভস্কি, তাদের জাতীয় সংগীত কার রচনা? বৃটিশের জাতীয় কবি শেক্সপীয়র কিন্তু জাতীয় সংগীত তো তার লেখা নয়। তাহলে কি সেসব দেশে দুজন করে জাতীয় কবি আছেন?

রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ কবি। তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রশ্নাতীত। সৃষ্টির বিপুলত্ব আর বিষয় বৈচিত্র্যে তাঁর সমকক্ষ দ্বিতীয় কেউ নেই তাও ঠিক। (ব্যতিক্রম গান, গানের রাজা নজরুল। তাঁর সাথে উদাহরণ হিসাবে আর কাউকে খাড়া করা যায় না। এ এলাকায় নজরুল একক।) বাংলা ভাষায় একজন বড় কবি হিসেবে তাঁর যতটুকু কদর পাওয়া দরকার তিনি তা পাচ্ছেন, পাবেনও ভবিষ্যতে, এ বাংলাদেশে। কিন্তু নজরুল আমাদের হৃদয়ের কবি। তাঁর কবিতায় আছে বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষের জীবনের আস্বাদ। স্বপ্ন। এর কারণ জনতার বিশ্বাসের সাথে কবির হৃদয়ের বিশ্বাসের একাত্মতা। জাতিয় কবি হবার শর্তও এখানেই নিহিত। নাগরিকত্বের প্রশ্ন না হয় নাইবা তুললাম।

www.pathagar.com

এখন আসা যাক টুপির কথায়। এ টুপি অনেক প্রগতিওয়ালাদের গাত্রদাহের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ জ্বালার যে উপশম নেই। তাই তারা যত্রতত্র টুপি প্রসঙ্গ টেনে আনছে। গত মে মাসেই বংশালের সহযোগী লিখছেন "বিদ্রোহী কবি নজরুলকে নিয়ে আর এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী পাকিস্তান আমলে উঠে-পড়ে লেগেছিলেন। এখন তাঁর মৃত্যুর পর মাথায় টুপি দিয়ে তাঁকে সাজিয়ে কিছুটা পরিতৃপ্ত।" একই মাসে মতিজিলের সহযোগীর হাহুতাশ—নজরুলকে নিয়ে আবার শুরু হয় ঘৃণ্য সাম্প্রদায়িক উচ্ছ্বাস। নির্বাক রুগ্নকবির মাথায় টুপি পরিয়ে মুসলমান প্রতিপন্ন করার হীন প্রচেষ্টাও লক্ষ্য করা যায়।" একই বক্তব্যের প্রতিধ্বনি শুনলাম জনৈক বুদ্ধিজীবীর কণ্ঠেও সম্প্রতি এক নজরুর বিষয়ক সভায়, বলা বাহুল্য অধ্যাপক বুদ্দিজীবীটি প্রগতির ধারকরূপে সমধিক পরিচিত। তিনি বললেন, নজরুল নাকি কস্মিনকালেও টুপি মাথায় দেননি। অথচ তাকে আমরা কিস্তি টুপি পরালাম।

আসলে একেই বলে ফপর-দালালী। সত্যকে মিথ্যা দিয়ে ঢাকার অপকৌশল। নজরুল মুসলমানের সন্তান। তাঁর মাথায় টুপি থাকবে সেতো স্বাভাবিক। তাছাড়া নজরুলের জীবন সম্পর্কে যাদের সামান্য জ্ঞানও আছে তারাও তো জানেন নজরুল মাদ্রাসায় লেখাপড়া করছেন, পড়িয়েছেন, এমনকি ইমামতিও করেছেন। কিন্তু কি অবলীলায় বলা হলো নজরুল কখনো টুপি মাথায় দেননি। অবশ্য প্রগতির সত্য ভাষণের চেহারা এ রকমই হয়।

নজরুলের মাথায় টুপি দিয়ে সাম্প্রদায়িক উচ্ছ্বাস প্রকাশ করা হলো। তাকে মুসলমান করার 'হীনতা দীনতা' দেখানো হলো। সত্যি, ব্যাপারটা ভালো হয়নি। ভালো হয়নি, কারণ অনেকের গায়ে ফোসকা পড়ে গেছে যার জ্বালা এখনো শেষ হয়নি। আগামীতে এ ব্যাধির দাওয়াই পাওয়া যাবে কিনা তাতেও সন্দেহ। কাটা ঘায়ে আবার নুনের ছিটা! নজরুলের মরদেহ নিয়ে কিনা সাম্প্রদায়িক উচ্ছ্বাস দেখালো বাংলাদেশের মানুষ। মুসলমানের মতো করে তাঁর জানাযা পড়ল, মুসলমানী নিয়মে তাঁকে দাফন করলো। তাও ঠিক করেনি এ দেশের মানুষ। এ রকম 'হীন প্রচেষ্টা' থেকে তাদের বিরত থাকা উচিত ছিল। এতে করে অনেকের ঘায়ের পরিমাণ বেড়ে যাবার সমূহ সম্ভাবনা আছে বৈকি। কিন্তু এ জ্বালার কোন প্রকাশ কি লেখ্য কি মৌখিক এখনো দেখা যাচ্ছে না। এ ব্যাপারটা অবাক করেছে বৈকি।

২. ৯. ৮৬

www.pathagar.com

গোলাম মোস্তফা : অবহেলা অনাদর

স্বদেশের প্রতি আনুগত্য আর স্বজাতির প্রতি মমতা এই ছিলো তাঁর সাহিত্য কর্মের অন্তরের আর্তি। শুরু থেকে শেষ অবধি সব আয়োজনের কেন্দ্রবিন্দু। 'আদ্রিয়ানোপল' উদ্ধার কবিতা দিয়ে যাঁর যাত্রা শুরু, শেষ রসূলের জীবনায়নে। তিনি গোলাম মোস্তফা। কবি শব্দটি যার নামের একটা অংশ হিসেবেই যুক্তহয়ে আসছে আজতক। কবি গোলাম মোস্তফা এই যেনো তাঁর সঠিক এবং শুদ্ধ উচ্চারণ। তবু তিনি বিস্মৃতির পথে এগুচ্ছেন। কালেভদ্রে তাঁকে নিয়ে কথা হয়। কথা কন একান্ত আপনজনেরা। তা-ও ব্যক্তিগত প্রসঙ্গের সীমাকে অতিক্রম করে নয়। তাতে কবির সৃষ্টির সীমা থাকে অন্ধকারে। যাঁরা কবি গোলাম মোস্তফার কবি-কর্মের গভীর থেকে সোনা-দানা তুলে আনতে সক্ষম তারা বরাবরই থাকছেন নীরব। যেনো একটা অলিখিত অনীহা এর পেছনে ক্রিয়াশীল। সাথে সাথে অবহেলা শব্দটিকেও অনীহার কণ্ঠলগ্ন করার যথেষ্ট যুক্তি আছে বলে মনে হয়। কারণ পত্রিকার সাহিত্য বিভাগগুলো কবি গোলাম মোস্তফা প্রসঙ্গে একেবারেই শীতল। এ নামে কোন কালে কোন কবির অস্তিত্ব ছিলো এ খবর হয়তো সাহিত্য বিভাগের পরিচালকদের জানা নেই। অবস্থার প্রেক্ষিতেই এমন একটি বিতর্কিত বাক্য লিখতে হলো। ব্যতিক্রম হয়তো আছে। তবে তা উল্লেখের দাবী রাখে না। প্রয়োজনের তুলনায় যা শস্যকণা।

এই তো কিছুদিন আগে অতিক্রান্ত হলো কবির জন্মদিন। কই, কোথাও তো তেমন কোন উত্তাপ লক্ষ্য করা যায়নি? যা উল্লেখের অবকাশ রাখে। পত্র-পত্রিকা তাঁকে স্মরণ করেনি, স্মরণ করেনি সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংস্থাগুলোও।

বরাবরের মতো বাংলা একাডেমীও ছিল স্পন্দনহীন। বাঙলা সাহিত্যে গোলাম মোস্তফা নামে কোন কবির অস্তিত্ব সম্পর্কে বাংলা একাডেমী সন্দিহান কি না জানি না। একাডেমীর বটবৃক্ষের শীতল ছায়ায় আলোচনা-সমালোচনার আয়োজন হয়। জীবনচারণের ব্যবস্থা হয় খ্যাত-অখ্যাত অনেকেরই। কিন্তু গোলাম মোস্তফারা থাকেন অবহেলিত, অনাদৃত।

আবর্তন বিবর্তনে বাংলা সাহিত্যের চেহারায় চাকচিক্য এসেছে। কাব্য বৃক্ষে নতুন নতুন পত্র পল্লব, বিন্যাসে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার আঁচড়। আগামীতেও এ গতি রুদ্ধ হবে না জানি। কিন্তু তা কি অতীতের শ্রমকে অস্বীকার করে? যারা শব্দের পর শব্দ গেঁথে কাব্যের ভিত গড়ে ছিলেন এক সময়, তাদেরকে অবহেলা করে? অবশ্য 'অবহেলা' আর 'বিস্মৃতি'এখন একটা ব্যাধিতে রূপ নিয়েছে আমাদের জাতিসত্তায়।

www.pathagar.com

যদিও এ ব্যাধি মহামারী আকারে প্রকাশ পায়নি এখনো। তবে কারো কারো মন এবং মেধা যে এ ব্যাধিতে বিপর্যস্ত তা হয়তো বলাই বাহুল্য . যার কিছু কিছু আলামত নজরে আসে আজকাল। পূর্বসূরী এবং তার কাজকে ছাই চাপা দেয়ার ব্যর্থ প্রয়াস যুগে যুগেই হয়েছে, কিন্তু সাফল্যের বর্ণালী পুচ্ছ স্পর্শ করতে পারেনি কখনো। দেখা গেছে যারাই এমন বিবেক বিনাশী কর্মের আনজাম দিয়েছেন তিনিই ঢাকা পরেছেন কালের বিশাল পালকের তলায়। আর পূর্বসূরী উঠে এসেছেন তার সৃষ্টির উজ্জলতা নিয়ে। তবে তা যদি যথার্থ সৃষ্টি হয়, থাকে শৈল্পিক দ্যোতনা।

সমগ্র বাংলা সাহিত্যে কবি গোলাম মোস্তফার অবস্থান কোথায় সেটা অবশ্য সাহিত্য সমালোচকদের বিচার্য বিষয়। তবে তিনি যে একজন কবি ছিলেন এ ব্যাপারে হয়তো কারো মতপার্থক্য নেই। একজন মহৎ শিল্পী বা লেখক তাঁর জাতি বা গোত্রের প্রতিনিধি। তাঁরা তাদের সৃষ্টির দেহে নিজ গোত্রের সুখ-দুঃখ আশা-নিরাশা সংস্থাপিত করেন। যারা এ থেকে বিমুখ তাদের আয়ুষ্কালও অল্প। শিল্প সাহিত্যের ইতিহাস এ সত্যকেই ধারণ করে আসছে। কবি গোলাম মোস্তফাও ছিলেন জাতির প্রতিনিধি। তাঁর সমগ্র সাহিত্যকর্মই স্বজাতির উদ্দেশ্যে নিবেদিত। তিনি যে সম্প্রদায়ের মানুষ সে সম্প্রদায়ের আশা-আকাংখা আর উল্লাস তাঁর দৃষ্টিতে মূর্ত। কবি গোলাম মোস্তফার কলমকে সচল করার পেছনে একটা উদ্দেশ্য কাজ করেছিল। কবি কথাটা ব্যক্ত করেছেন এভাবে—"কোনো সত্যিকার কবি সাহিত্যিকই নিজের পরিচিত পরিবেশ, প্রকাশভঙ্গি বিষয়বস্তু ছেড়ে কাব্য-চর্চা করতে পারে না। কোনো মুসলিম কবি যদি আরবী-ফারসী শব্দ বা ভাবধারা ব্যবহার করে তবে তাতে কোনই অন্যায় হয় না বরং সেইটাই হয় স্বাভাবিক। হাফিজ, ওমর খৈয়াম, মিলটন, সেক্সপীয়ার, রবীন্দ্রনাথ প্রত্যেকেই আপন আপন আদর্শে কাব্য রচনা করেছেন। বাংলার মুসলিম কবিকেও ঠিক তাই করতে হবে। ...প্রত্যেক জাতির কবি সাহিত্যিকদের স্বভাবধর্ম হলো তাঁর জাতির প্রতিনিধিত্ব করা।"

কবি গোলাম মোস্তফা করেছেনও তাই। কিন্তু আমরা জাতি হিসাবে অকৃতজ্ঞ বলেই তাঁর অবদান এবং সদিচ্ছাকে অবহেলা আর অনাদরের থলিতে লুকিয়ে রেখেছি। কেবল কবিতাই নয় তার গদ্য রচনায়ও একই ইচ্ছার অনুরণন। তাঁর অমর সৃষ্টি 'বিশ্ব নবী'। যে বই তার খ্যাতির বাহুকে বিস্তৃত করেছে, সম্প্রসারিত করেছে আরো। তবু তিনি এখন অন্ধকারের যাত্রী। পরিবেশ-পরিস্থিতির শিকার।

৩. ১২. ৮৪

www.pathagar.com

অপেক্ষার রজনি কাটবে একদিন

সক্রেতিস তাঁর কালে ছিলেন উপেক্ষিত-ধিকৃত। পরিবেশ এবং পরিস্থিতির শিকার হয়েছিলেন তিনি। অবশেষে জীবনকেই সঁপে দিতে হয়েছিল মরণের করতলে। আর এখনকার দৃশ্য? মহাকবি সেক্সপিয়রের কথায়ই আসা যাক না। তিনি অর্থাৎ তার সৃষ্টি বহুকাল ছিল উপেক্ষিত, তাঁর স্বদেশেই। আসলে এটাই নিয়ম। তবে মিথ্যার পলিস করা জৌলুস আমাদেরকে কখনো কখনো বিভ্রান্তির চোরাগলিতে ফেলে দেয়। মিথ্যাকে ঘিরেই জিন্দাবাদ ধ্বনি উঠে। কিন্তু এর স্থিতি স্বল্পকালের। কুপির শিখা তেলের আধার ফুরালেই শেষ। এ তেলের আধারটাই সময়।

ভাওয়ালের কবি ছিলেন গোবিন্দ চন্দ্র দাস। বলা যায় আমাদের ঘরের কবি তিনি। চরম উপেক্ষা আর গরীবী হালত তার জীবন এবং তার সৃষ্টিকে কুরে কুরে নিঃশেষ করেছিল। যে কবির কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল—"দিন ফুরায়ে যায়রে আমার, দিন ফুরায়ে যায় / কেমন করে হিসাব দেব নিকেশ যদি চায়।" সেই কবিকে পরিবেশের লাগামহীন ঘোড়া তাড়িয়ে তাড়িয়ে ফিরেছে। একদণ্ড স্বস্তি তাকে দেয়নি। কিন্তু এখন? সময়ের ব্যবধানে কবির অবস্থান ভিন্ন মেরুতে। পরিবেশ-পরিস্থিতির শিকার ছিলেন আরো একজন কবি, নাম ফররুখ আহমদ। যার জীবনের এমন কিছু সময় গত হয়েছে যা ছিল সাঁঝ-সকালের মতো। কখনো খ্যাতির শীর্ষে, কখনো অবহেলিত আবার কখনো নিষিদ্ধের তালিকায়। অবশ্য এ উঠানামা স্বাভাবিক। কারণ জগতের সব মহৎ ব্যক্তিত্বকেই জীবনের কোন না কোন অংশে এমন কিছু কালো ঢেউকে অতিক্রম করতে হয়েছে। এ নিয়মেই ফররুখ আহমদ পরিস্থিতির বৃত্তে আবর্তিত হয়েছেন। সময়ের ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে অনেক চড়াই উৎরাই-এর মুখোমুখি হয়েছেন।

ফররুখ আহমদ যেমন নিন্দিত পাশাপাশি তেমন নন্দিতও। এ উভয়বিধ কারণই তাঁর ঈর্ষণীয় প্রতিভা। যে প্রতিভা কাউকে করেছে আপন আবার কাউকে করেছে ঈর্ষাকাতর। শেষোক্ত দলের অভিযোগ কবির কাব্য জগত নাকি পশ্চিমের ধূসর মরুপ্রান্তর। সে জগতে আবহমান বাংলার সবুজের সমারোহ অনুপস্থিত। বিতর্ক তাঁর কাব্য বিশ্বাস নিয়ে। যে বিশ্বাসে তিনি ছিলেন আজীবন স্থির। যা তার নিজস্ব সমাজের কণ্ঠ তথা অন্তরের প্রতিধ্বনি। এমন একটা ধারণাই তিনি লালন করতেন হৃদয়ে। মাইকেল মধুসূদন তো বাংলা সাহিত্যের একজন বড় কবি, মহাকবি। তাঁর সৃষ্টির প্রশংসায় সবার কলমই দরাজ। মাইকেলের কাব্য জগতে বা তাঁর মহাকাব্যে কোন্ বাংলাদেশের শ্যামল শোভা? এমন একটা প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই এসে পড়ে। রবীন্দ্রনাথ

www.pathagar.com

বিশ্বকবি। কবিতার জগতের এক অনন্য সম্রাট। তাঁর কাব্যের অন্তরের বিশ্বাসটা কি? এসব নিয়ে কোন বিতর্ক বা অভিযোগ তোলা হয়নি এবং হয়ও না। না হওয়াই তো উচিত। কিন্তু ফররুখ আহমদ নিয়ে বিতর্কের কারণ? মানসিক অসুস্থতা? না অন্য কিছু। কবি নজরুলকে নিবেদিত কিছু কবিতার একটি সংকলন প্রকাশ করেছেন বাংলা একাডেমী। সে বইয়ে প্রাচীন থেকে নবীনতম কবির কবিতাটিও সাগ্রহে বাংলা একাডেমী গ্রহণ করেছেন। উদ্যোগ এবং উদ্দেশ্য মহৎ নিঃসন্দেহে। অগ্রজ কবি নজরুলকে নিবেদন করে ফররুখ আহমদও তো দু'খানা সনেট লিখেছিলেন। বাংলা একাডেমী তাদের সংকলনে সে সনেট দু'টি স্থান দেননি। বুঝতে অসুবিধা হয় না কাজটি ইচ্ছাকৃত। কুপির শিখাতো তেলের আধার ফুরালেই শেষ হয়। এখন সে শেষ অবস্থায় এসে গেছে প্রায়। একটা সময় ছিল যখন ফররুখ আহমদকে কেউ কেউ ভাবতেন জাতির জীবনে হুমকী অথবা জঞ্জাল। এখন তেমন কোন ভাবনা ক্রিয়াশীল নাই। দু'-একটি ক্ষীণ শিখা ছাড়া। বরং এ ভাবনার অবস্থান অনেকটা বিপরীতে। কবির এ পুনরুত্থান কেবল তাঁর বিশ্বাসের উজ্জ্বলতাকেই প্রকাশ করে না, তাঁর সৃষ্টির সত্যটাকেও ঘোষণা করে সরবে। এটাই হলো সময়ের বিচার। অর্থাৎ সময় অদল-বদলের বাস্তব চিত্র।সময় এভাবেই আসল-নকলের পার্থক্য নির্ণয় করে, উপলব্ধির দেয়ালে ধাক্কা দেয়। বিবেককে সজাগ করে, সচেতন করে। সময়কে কেন্দ্র করে অনেক কথাই বলা হয়ে গেল। আসলে এসবই উপলক্ষ মাত্র। লক্ষ্য কিন্তু সময়ের প্রেক্ষাপট। যেমন বই মেলার ঘটনা। অর্থাৎ বাংলা একাডেমীর বই মেলায় কতিপয় নির্বোধ এবং অর্বাচীন তরুণ কোরআন-হাদিস পুড়িয়ে দিল। এজন্য দায়ী পরিবেশ, তরুণরা নয়। কারণ তাদের বোধের কুঁড়ি এখনো মুকুলিত হয়নি। সময়ের প্রয়োজন। অবশ্যই তারা সত্যের সানুদেশে করজোড়ে খাড়া হবে যখন বইবে সঠিক সময়ের বাতাস। ইতিহাসেও এর প্রমাণ ডজন নয় শতের কোঠায়। সময় নির্মম বিচারক। শত্রু-মিত্র চিনতে তার ভুল হয় না কখনো।

৫. ৩. ৮৪

www.pathagar.com

ভাষা আন্দোলন : তর্ক-বিতর্ক

বাংলা প্রচলনের উত্তেজনা বেশ স্তিমিত হয়ে এসেছে। কি উপর তলায় কি নীচ তলায়। অবসাদ আর ক্লান্তির প্রলেপ সবখানে। যেন যুদ্ধ শেষের নীরবতা। অবশ্য দৃশ্যটায় বিজয়ের আনন্দ না পরাজয়ের গ্লানির চিহ্ন তা বুঝা মুশকিল, মোনালিসার রহস্যময় হাসির মতো। সরকারী নির্দেশ আর বেসরকারী হুমকির ডামাডোলের পর বাংলা ভাষা এখন চৈত্রের বিশীর্ণ পাতা। যা হয় ফি বছর। পহেলা ফেব্রুয়ারী থেকে 'হায় বাংলা'র মাতম, তারপর একুশে ফেব্রুয়ারীর গভীর রাতে বাংলা প্রেমে শহীদ মিনারে 'বংশ' যুদ্ধ, এরপর প্রেমে ইস্তফা। এ 'একাঙ্কিকা' প্রতিবছরই মঞ্চস্থ হয়ে আসছে। পরিবর্তন কেবল কুশিলবের। দৃশ্যের তেমন কোন হেরফের নাই। যে কারণে আলাচনা-সমালোচনারও বড় বেশী অবকাশ নাই, কেবল অভিনয়ের অভাব-অভিযোগ ছাড়া।

একুশে ফেব্রুয়ারি গত। পৃথিবীর ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা ঘটেছিল আজকের বাংলাদেশে বত্রিশ বছর আগে। তা ছিল ভাষার লড়াই। বাংলা ভাষার লড়াই। অধিকারের লড়াই। মুখের ভাষায় কথা বলার আকাঙ্ক্ষার লড়াই। অবশ্য বায়ান্ন সালের একুশে ফেব্রুয়ারী ছিল চূড়ান্ত পর্যায়। এ লড়াইয়ের সূচনা হাজার বছরেরও পেছনে। যখন সেন রাজারা বাংলা ভাষার ছোট্ট ছানাটিকে উড়াল শেখার আগেই গলা টিপে হত্যা করার ষড়যন্ত্র এঁটেছিল। যখন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা ফতোয়া জারি করেছিল বাংলা পক্ষীর ভাষা, এ ভাষা চর্চাকারীদের অবস্থান হবে 'রৌরব' নরক, তখন থেকেই। 'চর্যাপদ' ছিল বাংলা ভাষার বিপক্ষে ষড়যন্ত্রের প্রথম প্রতিবাদ। এ আবিষ্কার নয়, ইতিহাসের ঘোষণা। এ ঘোষণাকে যারা অস্বীকার বা অন্ধকারে রাখার প্রয়াসী আদতে তারা সেই ষড়যন্ত্রকারীদেরই উত্তর পুরুষ।

গত হয়েছে বত্রিশ বছর। কিন্তু এত সময়ের ব্যবধানেও ভাষা আন্দোলনের উল্লেখ করার মতো কোন সঠিক ইতিহাস নাই। যা আছে তা বিভ্রান্তিকর এবং অতিকথন আর লেখকের স্বমহিমায় উজ্জ্বল। এ অভিযোগ প্রতিবছরই উত্থাপিত হয় এবং যথানিয়মে শীতল হয়ে আসে। নিভাঁজ ইতিহাস আর আলোতে ঝলমল করে না। এ অভিযোগের সত্যাসত্য কবুল করে নিতে হয় এজন্যে যে, অভিযোগকারীরা প্রায় সবাই ভাষার লড়াইয়ের একেক জন অগ্রসেনানী। যাদের মেধা-পরিশ্রম আর ভাষার প্রতি মমতায় একুশের সুরুঝ ইতিহাসের আকাশে উঁকি দিয়েছিল। দুনিয়া জোড়া মানুষের জন্য জন্ম দিয়েছিল নতুন কাহিনীর। কিন্তু এ কাহিনীর আদলে খোস-পাঁচড়া কেবল দুঃখেরই নয়

www.pathagar.com

জাতীয় অনুশোচনা এবং শরমেরও। এ খোস-পাঁচড়ার যারা জনক তাদের সম্পর্কে অভিযোগকারীদের ভাষা হলো—যারা আজ ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস লিখছেন তাদের পছন্দ মত মানুষজনদের নায়ক-প্রতিনায়ক বানাচ্ছেন। আবার কেউ নিজেদেরকেও সে আন্দোলনের এক-একজন জাঁদরেল নেতা রূপে আঁকতে ভুল করছেন না। তাদের অনেকেই নাকি আটচল্লিশ-বায়ান্নতে ভালভাবে কাপড় পরাই শেখেনি। অর্থাৎ তখনও বালক। আবার কেউ কেউ নাকি আছে, মিছিলের আশেপাশে ছিলেন বা উঁকিঝুঁকি দিয়েছেন তারাও আজ নায়কের ভূমিকায় এসেছেন কলমের জোরে। এ ভাষ্যের পাল্টা ভাষ্য বাতাসে ভাসেনি, কি আগে কি এখন। যে জন্য এ অভিযোগকে সত্য বলেই ধরে নিতে হয়। তাছাড়া, এসব ইতিহাস লেখকদের কারো কারো দিকে চোখ ফেরালে সাক্ষী প্রমাণের আর প্রয়োজন পড়ে না। অনায়াসেই সত্য-মিথ্যার সীমারেখা টানা যায়। তবে এখন প্রশ্ন, যারা অভিযোগকারীর কাতারে আছে তারা কি কেবল মৌখিক অভিযোগ করে করেই তাদের কর্তব্য এবং দায়িত্বের ইতি টানবেন? এ ব্যাপারে তাদের কি আর কোনই করণীয় নাই? আন্দোলনের ইতিহাস কি এভাবেই 'খোস-পাঁচড়া'র রূপহীন-বর্ণহীন হবে? এ ব্যাধি বিনাশে কি তারা তাদের মেধা এবং মননকে কাজে লাগাবেন না। তাদের কাছে প্রত্যাশা, ভাষা আন্দোলনের লক্ষ্য উপলক্ষ্য এবং সঠিক ইতিহাস। কারণ বিভ্রান্তির কালো শেওলায় ঢাকা পড়ে আছে ইতিহাসের ফরসা গতর। এ শেওলা একমাত্র তারাই সাফ করতে পরেন যারা আন্দোলনের আসল নায়ক।

ভাষা আন্দোলনের ঝলমলে ফসল বাংলা একাডেমী। কিন্তু এ ব্যাপারে বাংলা একাডেমীর ভূমিকাই সবচেয়ে বিতর্কিত। কোন কোন সুধীর মতে বাংলা একাডেমী এখন বিভীষণের ভূমিকায়। অর্থাৎ এদেশের ভাষাকে তার সঠিক স্রোতে প্রবাহিত করার সব আয়োজনকেই তচনচ করে দিচ্ছে। এ পর্যন্ত ভাষা আন্দোলন সম্পর্কিত যে কয়টি পুস্তিকা একাডেমী প্রকাশ করেছে তার প্রায় সব ক'টা পক্ষপাত দোষে দুষ্ট এবং বিভ্রান্তির বেড়াজালে আটকা। কোথাও কোথাও ইতিহাস 'চুরির' লক্ষণও সুস্পষ্ট। বিশেষ করে বাংলা একাডেমীর সাম্প্রতিককালের কার্যকলাপ অনেক সচেতন মানুষের মনেই বহু প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে এবং দিচ্ছে।

শহীদদের উদ্দেশে গণসঙ্গীতের আসর তারা বসিয়ে ছিলেন। কিন্তু যে গণসঙ্গীতের রাজা নজরুল তাকেই একাডেমী অন্ধকারে রেখেছিল সযতনে। নজরুলে তারা কি আবিষ্কার করেছেন জানি না। তবে নজরুলের সব গণসঙ্গীতেই 'পেঁয়াজের' ঝাঁঝটা একটু বেশী, এই যা। এই ঝাঁঝ কি একাডেমীর অসহ্য? তা না হলে কারণ?

পূর্ণেন্দু দস্তিদার কে? বাংলাদেশীদের সাথে তার সম্পর্ক? বুঝলাম তিনি একজন বড় বিপ্লবী। কিন্তু এদেশের মানুষরা কি তার উত্তরপুরুষ? তার ঐতিহ্যের ধারক? জবাব অবশ্যই না। তবু একাডেমী তদেরকে নিয়ে মায়াকান্নায় মত্ত হন। মঞ্চ সাজান। বিপরীতে তিতুমীর-শরিয়তউল্লারা প্রত্যাখ্যাত হন।

শিবনারায়ণ রায় এসেছিলেন ঢাকায় কয়দিন আগে। এসেছিলেন বাংলা একাডেমীর দাওয়াতেই। তিনি গুণী মানুষ জ্ঞানী মানুষ। তিনি তার প্রাপ্য সম্মান পাবেন,

www.pathagar.com

পেয়েছেনও। তাকে নিয়ে বাংলা একাডেমী লম্ফঝম্ফ করেছেন। সম্মানীও নাকি হাজার আটেক দিয়েছেন। দিয়েছেন ভাল কথা। কিন্তু কয়েক মাস আগেই তো আজহার উদ্দীন এসেছিলেন কলকাতা থেকে ঢাকায়। জ্ঞানে গুণে কোন দিক থেকে কম ছিলেন? বাংলা সাহিত্যের তিনিও তো একজন কীর্তি পুরুষ। নজরুল বিশেষজ্ঞরূপে তার অবদান গৌরবজনক অবস্থানে আসীন। কিন্তু কই, সেই আজহার উদ্দিনকে তো বাঙলা একাডেমীর মহাবিদগ্ধরা কুশল জিজ্ঞেস করতেও ফুরসত পাননি। লম্ফ-ঝম্ফতো দূরের কথা। তবে হ্যাঁ, আজহার উদ্দিন আর শিবনারায়ণ এ দুস্তর ব্যবধান আছে। সে ব্যবধানটা হলো শিবনারায়ণ নাস্তিক আর আজহার উদ্দিন আস্তিক। তবে কি আস্তিক্যই তার কাল?

২৭. ০২. ৮৪

www.pathagar.com

উদারতার সীমারেখা প্রয়োজন

কথা উঠেছে পশ্চিম বাংলার বই তথা সাহিত্য নিয়ে। সাম্প্রতিককালে যার অবাধ বিচরণ ক্ষেত্র বাংলাদেশ। কথা তুলেছেন প্রকাশক সম্প্রদায়, কথা তুলেছেন পাঠক সম্প্রদায়। এ ব্যাপারে কণ্ঠকে উচ্চকিত করেছেন এদেশের লেখককুলও। অবশ্য এ তর্ক-বিতর্ক পক্ষে ও বিপক্ষে। তবে শেষের পাল্লাটাই ভারী বলে মনে হয়।

বলতে দ্বিধা নেই, ওপারের বইয়ের একজন পাঠক আমি নিজেও। কিছু পত্র-পত্রিকার সাথেও যোগাযোগ আছে সেই পাক আমল থেকেই। যখন দেখি ওপারের লিখিয়ে ভায়েরা কলমের খোঁচায় রাতকে দিন আর দিনকে রাত বানিয়ে ফেলেছেন। লজ্জা-শরমকে বাক্সবন্দী করে টানা মিথ্যা বকে যাচ্ছেন তখন মুখ না খুলে উপায় থাকে কি? এই যমন সুকুমার রায়ের মতো পণ্ডিত তার এক গবেষণামূলক (?) প্রবন্ধে এক জায়গায় লিখছেন—"মুসলমান ধর্মে নারী বিলাস নিষিদ্ধ নয়, হিন্দুর পক্ষে স্বনারী ছাড়া নিষিদ্ধ।" প্রশ্ন তোলার প্রয়োজন ছিলনা। তবু তুললাম, কারণ ধর্ম শব্দটি। ধর্মবেত্তা নই, কিন্তু এ বিষয়ে যতটা জ্ঞান আছে তাতে মনে হয় 'মুসলমান ধর্মে' কথাটি রায় সাহেবের অপপ্রয়োগ। এবং তার মন্তব্যটি বিভ্রান্তিকর।

সুকুমার রায়ের মহদেবতা মহাদেব। এই মহাদেবকে শিব-পুরানেই চিহ্নিত করা হয়েছে 'স্ত্রী লম্পটম' বলে। বিশ্ব মিত্র সম্পর্কে মহাভারতের ভাষ্য 'তপ জপ প্রভৃতি সমস্ত ধর্ম-কর্মের জলাঞ্জলি প্রদানপূর্বক দিনযামিনী কেবল সেই কামিনীর সহিত ক্রীড়া করত পরম সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।' আরেক দেবতা বেদবাস সম্পর্কে মন্তব্য এ রকম, ঘৃতাচিকে দেখার পর তিনি বিশেষরূপ ধৈর্যাবলম্বনপূর্বক কাম নিবারণের চেষ্টায় অরনি মন্থন করিতে লাগিলেন কিন্তু কোনমতেই চঞ্চল চিত্তকে সুস্থির করাইতে পারেন নাই' ইত্যাদ ইত্যাদি। নারী বিলাস যে কাদের কণ্ঠলগ্ন সে কথা প্রমাণের জন্য এভাবে কোন মুসলমান লেখক নিজেদের মেধাকে ব্যয় করেছেন বলে জানা নেই। এ তাদের স্বভাবেরও বিপক্ষে, বিশ্বাসেরও।

বাংলা এমন একটা ভাষা যার আদশে পৃথিবীর কঠিনতম শব্দটিও স্বচেহারায় আত্মপ্রকাশে সক্ষম অনায়াসে। কিন্তু ব্রতিক্রম ওপার বাংলার বাংলায়। এই যেমন আহমদ রূপান্তরিত হয় আমেদ-এ। গাউস মিয়া রূপ নেয় গজ মিয়া, ফয়সল হয়ে যায় ফৈজল আর কলমের কেরামতিতে সোহরাওয়ার্দী চেহারা পাল্টিয়ে সুরাবর্দী হয়ে ধরা দেন আমাদের চোখে। দু'-একটি মাত্র উল্লেখ করলাম। কেবল আমার কাছেই নয় বিষয়টা অনেকের চোখকেই পীড়া দেয়। কেন এমন হয়? তারা তো প্রাচীন সংস্কৃতের

www.pathagar.com

কঠিনতম শব্দটিও আকার, ইকার আর য-ফলার সঠিক ব্যবহারে মূল উচ্চারণটি তুলে আনতে এতটুকু ভুল করেন না।

অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিহাস (?) শিখাচ্ছেন এভাবে, '২৪ পরগনায় তিতু নামে এক ধর্মান্ধ মুসলমান ইসলাম প্রচারের অভিপ্রায়ে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে অশিক্ষিত কৃষক শ্রেণীর মুসলমানদের নারিকেলবেড়ে নামক গ্রামে এক বাঁশের কেল্লার মধ্যে জড়ো করে ইংরেজ কর্মচারী ও হিন্দু জমিদারদের উপর অত্যাচার করতে থকে। তার আন্দোলন হিন্দু বিদ্বেষে পরিণত হল। তিতুর চেলা-চামণ্ডরা হিন্দু জমিদার ও শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীদের মেরে কোতল করল।... হিন্দুদের উপর অত্যাচার বেড়ে গেল। ধর্মান্তরকরণ ও নারী হরণ চলল প্রচণ্ডভাবে। ...ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সৈন্য পাঠিয়ে ধর্মান্ধ ওয়াহাবী সম্প্রদায়ভুক্ত অশিক্ষিত তিতুমীরকে গুলী করে মেরে ফেলল। ...তার না ছিল শিক্ষা, না ছিল বুদ্ধি। লাঠিয়াল তিতুকে যারা স্বদেশ প্রেমের উচ্চ মঞ্চে স্থাপন করে তাকে শহীদ ইত্যাদি ভূষণে অলংকৃত করতে চান তারা স্থানীয় প্রবাদ ও কাহিনী সম্বন্ধে অবহিত নয়।'

এই হলো ইতিহাস। তিতুমীরের আদি অন্ত সম্পর্কে অসিতকুমার যে ওয়াকিফহাল নন সে কথা কি করে বিশ্বাস করা যায়? তিনি একজন স্বনামধন্য অধ্যাপক, বাংলা সাহিত্যের নতুন ইতিহাস লিখেছেন। লিখেছেন আরো অনেক বই-পত্র। কিন্তু তিতুমীরের বেলায়ই এই উলট-পালট। এই উলট-পালট তথা মিথ্যা ইতিহাস আমরা গিলছি নির্বিবাদে। পড়ছে এ বই আমাদের সন্তানরা। কি শিখছে? প্রশ্নটি তাদের কাছে, যারা হৃদয়ের বৃত্তকে আরো প্রশস্ত করার পক্ষে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এই লাগামহীন উদারতার ফসল কি? আমাদের এই উদারতার জমিনে চৈত্রের খরাকে প্রত্যক্ষ করেই হয়তো কবি জসীমউদ্দীন তার দুঃখ এবং ক্ষোভকে প্রকাশ করেছিলেন বছর দশেক আগে এভাবে, 'পশ্চিমবঙ্গ হইতে আমরা প্রতি বৎসর ৬০/৭০ লাখ টাকা মূল্যের বই-পুস্তক আনিয়া থাকি কিন্তু আমাদের লিখিত বই-পুস্তক পশ্চিমবঙ্গে যাইতে পারে না। আমাদের এখানে যেমন কত টাকার বই-পুস্তক আনিতে পারিব তাহার অংক নির্দিষ্ট আছে। আমার বিশ্বাস পশ্চিমবঙ্গে তেমন অংক চিহ্নিত নাই। দান প্রতিদান না থাকিলে সেই সখ্য বেশীদিন টিকে না। একমুখী পথে যাওয়া-আসা চলে না। এদেশে-ওদেশে ভালবাসার বন্ধন যাঁহারা আরো অন্তরঙ্গ করিতে চান তাহারা যেন এই কথাটি ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখেন। সাহিত্য জনজীবনের বহিরঙ্গ এবং অন্তরঙ্গ লোকের আলেখ্য। পদ্মা, মেঘনা, ধলেশ্বরী নদীর তীরে তীরে, এদেশের উদার গগনতলে, অবারিত মাঠের কোলে যাহারা ঘরবসতি করিয়া জীবনের কাহিনী রচনা করে আমাদের সাহিত্য তাহাদেরই কথায় ভরপুর।... যুগে যুগে এই কাহিনীই শুধু আমাদের সাহিত্যকে রূপ দিয়াছে। তাহা না জানিলে ওদেশের বন্ধুরা যতই উদারমনা হউন আমাদের কিছুই জানিতে পারিবেন না। ...বই-পুস্তকের পাণ্ডুলিপি হস্তে লইয়া এদেশের লেখকেরা চোখের পানিতে বুক ভাসায়। এরূপ চলিতে দেওয়া আমাদের রাষ্ট্রের পক্ষে অমার্জনীয় অপরাধ। বিদেশের সাহিত্য ও জ্ঞান ভাণ্ডারের পথ আমরা রুদ্ধ করিতে চাহি না। সাহিত্য কলা আবহমান কাল হইতে ভৌগোলিক, ধর্মনৈতিক, রাজনৈতিক মতবাদের

www.pathagar.com

বেড়া ডিঙ্গাইয়া চিরদিনই সীমান্ত অতিক্রম করিয়াছে। কিন্তু আমাদের পায়ের তলার ভিত্তি ভূমি উৎখাত করিয়া অপরদেশের সাহিত্য কলা হজম করিতে পারিব না।"

উদাহরণটি দীর্ঘ হয়ে গেল। তবু উল্লেখ করলাম। করলাম এজন্য যে, এ দীর্ঘ দিনের ব্যবধানেও কবির বাক্যগুলোতে তেমন কোন জং পড়েছে বলে মনে হয় না। আত্মমর্যাদাবোধ এবং আত্মউপলব্ধি যাদের হৃদয়ে টংকার তুলে না তারা হয়তো এতে তেমন সুখ অনুভব না-ও করতে পারেন। তবে কবির উচ্চারিত বাক্যগুলোই কিন্তু এদেশের সব সচেতন মানুষের হৃদয়ের কথা।

পশ্চিম বাংলা থেকে বই আসছে পানির মতো কিন্তু তেমন যাচ্ছে না সেখানে। যার নাম অসম বিনিময়। যে কারণে আমরা আর্থিক ক্ষতিকে আলিঙ্গন করছি। এ অসম বাণিজ্যের কারণ কি?

ব্যবসায় লাভ-লোকসান থাকা স্বাভাবিক। তাই এ নিয়ে মাথাব্যথা তেমন প্রকট নয়। অস্বস্তির কারণ, মস্তিষ্কে বিভ্রান্তির পলি যেভাবে পুরো হচ্ছে তা নিয়ে। বিভ্রান্তি থেকেই একদিন জন্ম নেয় ভীমরতির এবং বৈকল্যের। শংকা এবং আশংকা এখানেই। এই যেমন বিমল মিত্র লিখছেন, 'নিজে চাকুরী করতেন দেশ পত্রিকায় কিন্তু একদিন অন্য একটি অখ্যাত পত্রিকায় তার (অদ্বৈত মল্ল বর্মন) একটি উপন্যাস ধারাবাহিক প্রকাশিত হতে দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলুম। সে উপন্যাসটির নাম 'তিতাস একটি নদীর নাম।'

বলাবাহুল্য বিমল মিত্রের 'অখ্যাত' পত্রিকাটি হলো মাসিক মোহাম্মদী। সেই চল্লিশ দশকে কি মোহাম্মদী অখ্যাতের তালিকায় ছিল? সাহিত্যের তথা সাময়িকীর ইতিহাস কি তা প্রমাণ করে? কিন্তু আমরা তো জানি তখন সাময়িকীর জগতে মাসিক মোহাম্মদী একটি উজ্জ্বল নাম। তবে বিমল মিত্রের 'অখ্যাত' শব্দটি হিংসা, দ্বেষ না মোহাম্মদীওয়ালাদের প্রতি অনীহা। না সবকটার যোগফল। তাই উদারতার একটা সীমারেখা টানা প্রয়োজন।

১৩. ১০. ৮৩

www.pathagar.com

কিছু অবিশ্বাস্য পরিণামের কাহিনী

সিরাজদ্দৌলাকে আমরা যতই মন্দলোক বা কাপুরুষ বলে গালাগাল দেই না কেন তার হন্তাদের কেউই কিন্তু পরিণামের নির্মমতা থেকে রক্ষা পায়নি। কারো কারো ধারণা এটা সিরাজুদ্দৌলার আত্মার অভিশাপের ফল। হয়তোবা ধারণাটা অসত্য না-ও হতে পারে। তবে মনে হয় এ ব্যাপারটা কেবল নবাব সিরাজের একার অভিশাপের ফসল নয়, তা সমগ্রজাতির অন্তরের অভিশাপের ফল। কারণ সিরাজুদ্দৌলার নবাবীর পতনের ফলে এ দেশ এবং দেশের জনগণের ভাগ্য একটা ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয়েছিল। অত্যাচার এবং অবিচার ছিল যে প্রবাহের চালিকা শক্তি। আর হুট করে না হলেও ধীরে ধীরে পরাধীনতার অমানিশা গ্রাস করেছি সমগ্র জাতির সত্তাকে। যে জগতশেঠের নিশাপুরের গদিতে ষড়যন্ত্রের বীজ অংকুরিত হয়েছিল, ভাগ্যের কি পরিহাস নিশিথের গর্ভেই বিলীন হয়েছিল ষড়যন্ত্রকারী আর বিশ্বাস ভঙ্গকারীদের সবাই, শেষ অবধি। জগতশেঠ-মীরজাফররা ইংরেজ তথা বিদেশী শক্তির সাথে কিভাবে স্বাধীনতার বিপক্ষে ষড়যন্ত্রের জাল বুনেছিল সে সব ইতিহাস কম-বেশী সবারই জানা।

মীর জাফর আলী খাঁ নবাব হলো। বাংলা বিহার উড়িষ্যার নবাব, ষড়যন্ত্রের চিকন সাঁকো বেয়ে। নবাব আলীবর্দী খাঁর এককালের গৃহভৃত্য ছিল এই মীর জাফর। নেক নজরে পরে ঘনিষ্ঠ আত্মীয় থেকে প্রধান সেনাপতির সিঁড়ি পর্যন্ত উঠেছিল। পরবর্তীকালে তারই আদরের নাতি সিরাজুদ্দৌলাকে উৎখাত এবং হত্যা করে এসব উপকারের প্রতিদান দিয়েছিল সে। তাতে পরিণাম শুভ হয়নি। ইংরাজের কাছেই বারবার অপদস্ত এবং নির্মমভাবে শোষণের শিকার হয়ে তাদের হাতেই গৃহবন্দী অবস্থায় শেষ জীবনের দুর্বিষহ দিনগুলো তাকে কাটাতে হয়েছিল। তাছাড়া জনগণের নিন্দা আর দুরারোগ্য ব্যাধি কুষ্ঠ তাকে কুরে কুরে খেয়েছিল। এমনকি মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে তাকে কীর্তিস্বরী দেবীর পা ধোয়া পানি খাওয়ানো হয়েছিল। শেষ সম্বল ঈমানটুকুও বুঝি আল্লাহ কেড়ে নিয়েছিলেন মরার আগেই এভাবে। এমনি করেই মীর জাফরের নবাবীর স্বপ্নিল ফানুসটি উড়াল দিয়েছিল।

তার ছেলে মীরন মরল বিনামেঘে বজ্রপাত হয়ে। সেদিন আকাশে কোন মেঘ ছিল না। তবু বজ্রপাত হলো অলৌকিকভাবে। তার আর এক ছেলে নিজামুদ্দৌলা মারা গেলো নিমোনিয়া জ্বরে। ছোট ছেলের মৃত্যু হলো বসন্তে। এভাবেই নির্বংশ হয়ে গেল বিশ্বাসঘাতক মীর জাফর।

www.pathagar.com

মোহাম্মদী বেগ ছিল সিরাজের সরাসরি হত্যাকারী। সে-ও ছিল নবাব পরিবারের একজন গৃহভৃত্য। একদিন তার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটল। সে আত্মহত্যা করল কুয়ায় ঝাঁপিয়ে পড়ে।

ব্যাপারটা ঘটল হঠাৎ। দেখা গেল সেনাপতি ইয়ার লতিফ নাই। তার কোন খোঁজ-খবর কেউ দিতে পারলো না। এ নিরুদ্দেশের কারণটি আজো রহস্যে ঘেরা।

রায়দুর্লভ মরল ইংরেজেরই জেলখানায়। অনাহার আর অর্ধাহার এই অভিশপ্ত আত্মকে তিল তিল করে জীবনের শেষ প্রান্তে নিয় গেল। সুদখোর উমিচাঁদ মরল নিঃসম্বল হয়ে। এক সময়কার কোটিপতি, ইংরেজের প্রিয়জন, কপর্দকহীন হয়ে অলিতে গলিতে ঘুরলো। তার মৃতদেহ পড়েছিল পথের পাশেই। কেউ খোঁজও নিল না। এ মৃতদেহ কার। রাজবল্লভ ছিল নবাবের নায়েব। ষড়যন্ত্রকারীদের একজন বড়সড় চাঁই। নবাবের টাকা-পয়সা চুরি করে করেই যার সিন্দুক গরম হয়েছিল তারই 'সুসন্তান' কৃষ্ণবল্লভ নবাবের ধনভাণ্ডার লুট করে ঢাকা থেকে নৌকা বোঝাই টাকা নিয়ে কলকাতায় ইংরাজের আশ্রয়ে পালিয়েছিল। নবাব এসব টাকা-পয়সার হিসাব চেয়েছিলেন। এই ছিল নবাব সিরাজের অপরাধ। নায়েব রাজবল্লভের শিরশ্ছেদ করা হয়েছিল প্রকাশ্য রাজপথে পরবর্তীকালে। রাজবল্লভের রাজনগরের প্রাসাদটির প্রতিটি ইটেই 'জমা আছে নবাব সিরাজের চুরি করা টাকা-পয়সার প্রলেপ। আর বিখ্যাত এগাররত্ন মন্দিরটিও সেই পাচার করা টাকা-পয়সায়ই তৈরী। এ তথ্যও ইতিহাসের। জগতশেঠ আর তার ভাই রূপচাঁদকে মুঙের দূর্গের চুড়া থেকে গংগার পানিতে নিক্ষেপ করেছিল নবাব মীর কাশেম। সিরাজের খালা ঘসেটি বেগমকে বুড়িগংগায় কারো মতে পদ্মায় ডুবিয়ে মারলো মীর জাফরের ছেলে মীরন। দানেশ শাহ মরল সাপের কামড়ে। যে দানেশ শাহর গোপন সংবাদের কারণে ভগবানগোলার কাছে ধরা পড়েছিলেন মীর কাশেমের হাতে নবাব সিরাজুদ্দৌলা।

মহারাজা নন্দ কুমার ফাঁসিতে ঝুলল এক মিথ্যা মামলায়। পাপ নাকি বাপকেও ছাড়ে না। হয়তো এ জন্যেই এ শাস্তি। ধূর্ত ক্লাইভ মরল টেমস নদীতে ঝাঁপ দিয়ে। স্বদেশে ধিকৃত এবং লাঞ্ছিত হয়েই ক্লাইভ আত্মহত্যার পথকে শান্তির পথরূপে বেছে নিয়েছিল। আর যে ওয়ারেন হেষ্টিংস এদেশের টাকা লুট করে করে টাকার কুমীর বনে গিয়েছিল, সে-ও তার নিজ দেশে বিভিন্ন মামলা-মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়ে নিঃস্ব হয়ে পড়েছিল। তাছাড়া জনগণের লাঞ্ছনা-গঞ্জনা তো ছিলই। অবশেষে ভিক্ষাই ছিল তার জীবনের শেষ কর্ম। এভাবেই সিরাজের ঘাতক তথা বিশ্বাসঘাতকরা অবিশ্বাস্য পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়েছিল।

সিরাজ হত্যা অর্থাৎ দেশের স্বাধীনতা হত্যার সাথে কোন না কোনভাবে যারা জাড়ত ছিল তারা কেউই অভিশাপের কালহাত থেকে রেহাই পায়নি। যদিও মীর কাশেম তার পূর্ব কর্মের জন্য সারা জীবন অনুশোচনা করেছেন, দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন তবু অভিশাপের কালো ছায়া তাকেও অনুসরণ করেছিল সন্তর্পণে। এককালের নবাব মীর কাশেমও শেষ জীবনে সহায় সম্বলহীন আত্মীয়-

www.pathagar.com

স্বজনহারা হয়ে জীবনকে সঁপে দিলেন মৃত্যুর কাছে। দিল্লীর শাহী মসজিদের সদর দরজায় নবাব মীর কাশেমের মৃতদেহ পড়েছিল। সাথে ছিল একটি মাত্র ছেড়া শাল। যার এক কোণায় সোনালী জড়ি দিয়ে লেখা ছিল 'নাসিরুল মুল্‌ক ইমতিয়ায-উদ্দৌলা নসরত জঙ্গ আলীজা মীর কাশিম আলী খাঁ বাহাদুর।' এ শালটি না থাকলে হয়তো কেউ জানতো না এ লাশ কার। ষড়যন্ত্রকারীদের একেকজন এভাবেই পরিণতির নির্মমতার কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল। এখানে যাদের উল্লেখ তারা ছিল প্রথম কাতারের আর যারা শেষ কাতারের তারাও কিন্তু পরিণতিকে এড়াতে পারেনি। খেশারত তাদেরকেও দিতে হয়েছিল কোন না কোন ভাবে। এমনকি যে জাফরগঞ্জ প্রাসাদে সিরাজুদ্দৌলাকে হত্যা করা হয়েছিল সে প্রাসাদও একদিন ধসে গেল বজ্রাঘাতে। এ দৃশ্যটা সিরাজের আত্মার অভিশাপের সরব প্রকাশ কিনা কে জানে।

আসলে দেশের সাথে দেশের জনগণের ইচ্ছা আকাংখার সাথে যারা বিশ্বাসঘাতকতা করে তাদের পরিণাম এমনি নির্মম হয়। হয়তো সব পরিণতির কথা ইতিহাসে উচ্চারিত হয় না। কিন্তু তা ঘটে যাচ্ছে। তার কিছু আলোতে আসে আর কিছু অন্ধকারেই রয়ে যায়। বিশ্বাসভঙ্গকারীরা নির্বংশ হয়, বেঘোরে মহামূল্যবান জীবনকে সঁপে দেয় মৃত্যুর হাতে যে দৃশ্য শব্দের শরীরে বন্দী হয়ে আসছে কাল থেকে কালে। এ সব কাহিনী আমাদের জানাশুনার বাইরে কি? কিন্তু আমরা ক'জনে এ দৃশ্যগুলো অনুভূতির দেয়ালে টাঙ্গাই?

১. ১০. ৮৩

www.pathagar.com

কবি জসীমউদ্‌দীন : আদর-অনাদর

নজরুল আর জসীমউদ্দীন বাংলা সাহিত্যের দুই দিকপাল। যদিও দু'জনার অধিবাস ভিন্ন ভিন্ন মেরুতে। তবে এ ভিন্নতা বিশ্বাসে নয় প্রকাশে এবং বিষয়ে। একজনের উচ্চারণ স্পর্শ করে সূর্যের হৃদয়কে আর অন্যজনের হাঁটাচলা চাঁদের জোস্‌নায়। তফাত কেবল এটুকুই। মূলতঃ দু'জনেই শিল্পের ধারক। কবিতার কারিগর।

একদিন বাদেই এগারই জ্যৈষ্ঠ। কবি নজরুলের জন্মদিন। আর গত মার্চের চৌদ্দ তারিখ ছিল কবি জসীমউদ্দীনের মৃত্যু দিবস। জসীমউদ্দীন কে? কি তাঁর পরিচয়? গত চৌদ্দই মার্চ ছিল যাঁর ৭ম মৃত্যুদিবস? হ্যাঁ! প্রগতিশীল আলট্রা মডার্ণ সমাজের এসব ফালতু ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবার ফুরসত কই? এ জন্যেই হয়তো তারা কোথাকার কোন জসীমউদ্দী-টসীমউদ্দীনের ব্যাপার নিয়ে মেধাকে খরচ করতে নারাজ। বুদ্ধির যারা বেসাতী করেন যারা ফরাগত হন নিজেদের প্রগতিশীল ভেবে তাদের অবস্থানতো সাধারণ মানুষের ধরা-ছোয়ার বাইরে। তাদের মাথায় এবং মগজে বসবাস করে সেক্সপিয়ার, দান্তে, এলিয়ট, টলষ্টয় আর মায়াকভস্কিরা, তাদের একজন তো কয়দিন আগে কণ্ঠকে উচ্চকিত করেছিলেন এই বলে যে, সেক্সপিয়ার আমাদের খুব কাছের মানুষ–সাথের মানুষ। ভালো কথা। কিন্তু পত্রিকার পৃষ্ঠায় জসীমউদ্দীন অনুপস্থিত কেন? তবে কি পত্রিকাওয়ালাদের কাছেও তাঁর পরিচয় অজ্ঞাত? কত ছলিমউদ্দীন-কলিমউদ্দীরই তো ছবি ছাপা হয়। ঘটা করে পালিত হয় জন্ম-মৃত্যু দিবস। কবি জসীমউদ্দীনের বেলায় এ অনীহার কারণ? একি তাঁর নিয়তি? না তিনি কোন ষড়যন্ত্রের শিকার?

প্রতিটি দৈনিকেরই তো সাহিত্য বিভাগ আছে। সে বিভাগে সাহিত্য নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা হয়। খ্যাত-অখ্যাত লিখিয়েদের সৃষ্টির সপক্ষে-বিপক্ষে খাড়া করা হয় শব্দের মিছিল। কিন্তু সেখানেও তাঁর কোন হাজিরা নাই, গত চৌদ্দ তারিখ বা তার পরের কোন সময়ে। একটি মাত্র ব্যতিক্রম ছাড়া। এ বিভাগগুলো যাদের চিন্তা-চেতনাকে ধারণ করে পুষ্পিত হয় তাদের কেউ কেউ তো জসীমউদ্দীনের বন্ধু তালিকারও অন্তর্ভুক্ত। আবার কেউ তার স্নেহের ছায়ায় লালিত হয়ে সাহিত্যের বাগানে প্রবেশ করেছিলেন। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার তাদের কারো কলমই সচল হয়নি কবি জসীমউদ্দীনকে নিয়ে, তাঁর সৃষ্টিকে নিয়ে। এটা কোন ধরনের কৃতজ্ঞতা? আসলে কোন মহৎ সৃষ্টিই কারো অনুগ্রহের প্রত্যাশা করে না। সে ভাস্বর হয় তার আপন ঔজ্জ্বল্যে।

www.pathagar.com

তবে কবি জসীমউদ্দীনের সৃষ্টি কালকে কতটা জয় করতে পারবে জানি না। অবশ্য একথা নিশ্চিত করেই বলা যায়, আজকে যারা আধুনিকতার চশমা এঁটে জসীমউদ্দীনের সৃষ্টিকে খারিজ করে দিতে চান তারা নিজেরাই খারিজ হবেন তাঁর অনেক আগেই। জসীমউদ্দীনের সৃষ্টির শিকড় মাটির অনেক গভীরে। তিনি তার কবিতার অন্তরে লুকিয়ে রেখেছেন এদেশের মানুষের সুখ-দুখ। আর অন্যদিকে শিকড় মাটি শূন্য। অল্প বাতাসেই পতনের সমূহ সম্ভাবনা। পতন ঘটছেও এভাবে। কিন্তু জসীমউদ্দীন আছেন এবং থাকবেন মানুষের কাছাকাছি। প্রগতির ধারকরা স্মরণ করুক আর না করুক। এ প্রগতিবাদী সাহিত্যিকদের উদ্দেশ্যে জসীম উদ্দীনের একটি সাহসিক ভাষ্য আছে এ রকম— "দেশের অতীত সাহিত্যের বুনিয়াদের উপর সাহিত্যশৈলি স্থাপন না করিলে নূতন সাহিত্য যে পাঠকসাধারণ হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িবে। পাঠক-বর্জিত সাহিত্যকে ধরিয়া রাখিবে কাহারা? বিদেশীর অনুকরণ করিয়া নিজের রচনার জন্য বিদেশীদের উৎসাহপূর্ণ পত্রাবলী বা সমালোচনা পাওয়া যাইতে পারে কিন্তু তাহারা ত অপর দেশের সাহিত্যকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারিবে না।"

আমাদের আজকের সাহিত্যিক এবং সাহিত্যের চেহারা কি এ থেকে ভিন্ন? তা কি জসীমউদ্দীনের কথার বৃত্তেই বন্দী নয়? দু'-একজন ব্যতিক্রম ছাড়া এ কালের কবিরা এখন পাঠক বর্জিত। কবিতার অবস্থান এখন হোটেল বা কোন ক্লাবের চার দেয়ালে আটকা। বিষয়টা বিতর্কের।

জসীম উদ্দীন এখন পরিত্যক্ত প্রগতিবাদীদের কাছে। তবে এমন একদিন ছিল এ জসীমউদ্দীনই ছিলেন তাদের হাজারো অপকর্মের ঢাল। তারা এ ঢালকে আশ্রয় করেই অনেক রঙিন স্বপ্নে মাতোয়ারা হয়েছেন। কল্পনার দোলনায় দোল খেয়েছেন। এখন সে জসীমউদ্দীনই তাদের সমাজে পরিত্যক্ত বাদামের খোসা।

কবি জসীমউদ্দীন মাটির এবং মানুষের খুব কাছের অন্য অনেক কবির চেয়ে। যাদের নিয়ে আলট্রামডার্ণ সমাজের কর্তা তথা বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা লম্ফ-ঝম্ফ করেন। মজমা বসান। মাতম করেন।

নববর্ষ আসে, বটতলায় আসর বসে, হুর-পরীদের আসর। গান-বাজনা হয়। ভাষণ-টাষণ ঝাড়েন বড় বড় মাথাওয়ালারা। কিন্তু সে সব গান-বাজনার আসরে জসীম-নজরুলের প্রবেশাধিকার থাকে না। বাঙলা নববর্ষ কেন? যে কোন উৎসবেরই চেহারাটা একই ধাচের। নজরুল-জসীম উদ্দীন সেখানে অপাংক্তেয় হয়ে যান। এর কারণ কি সঠিকভাবে জানা নাই। তবে সেসব উৎসবের যারা সারথী তাদের কাছে কি এ দু'জন কবি বাঙলার কবি বা বাঙালী কবি বলে বিশ্বাস হয় না? তাদের গানগুলো কি বাঙলায় লেখা নয়? এসব উৎসবে কি তাদের গান পরিবেশনে কোন অসুবিধা আছে? না, কানু ছাড়া কোন গীত নাই? কোন্‌টা যে কারণ এখনো বুঝে আসেনি। হয়তো আরো সময় যাবে কারণগুলোর শিরা-উপশিরা সঠিকভাবে চিনে নিতে।

গত চৌদ্দই মার্চ কবি জসীমউদ্দীনের মৃত্যু দিবস ছিল। কারো সে কথা মনে নাইবা থাকল। কিন্তু বাঙলা একাডেমীর মনে না থাকার কারণ কি? চুনোপুটি অনেককে নিয়েইতো বাঙলা একাডেমী বটতলা সরগরম করেন। রথী-মহারথীরা হাওয়ায় কথার

www.pathagar.com

খৈ ফুটান। আবেগে উদ্বেলিত হন। যদিও কবি জসীমউদ্দীনের ধারে-কাছে ঘেঁষার যোগ্যতা রাখে না যাদের নিয়ে বক্তারা হাত-পা ছুঁড়েন। এমনকি যারা ছুঁড়েন তারাও!

এইতো সেদিন বাঙলা একাডেমীর চত্বরে আলোচনার বিষয় ছিল মহাকবি সেক্সপিয়র। সেক্সপিয়র বড় লেখক সন্দেহ নাই। তাছাড়া এসব বড় বড় প্রতিভা নিয়ে যতই নাড়াচাড়া করা যায় ততই মঙ্গল। কিন্তু সে মঙ্গলই অমলের অবয়ব নেয় যখন 'ঘরকে' রেখে 'পরকে' নিয়ে বেশী মাতামাতি হয়। সেখানে আমাদের কোন কোন প্রগতিশীল লেখক সেক্সপিয়রের সাথ আমাদের নাড়ির যোগাযোগ আবিষ্কার করেছিলেন। মনের আর্তিকে উজাড় করে দিয়েছিলেন। অন্যদিকে ঘরের কবি জসীমউদ্দীন সম্পর্কে তারা একেবারেই নিরব। যদিও বলার একটা ক্ষেত্র তৈরী হয়েছল গত চৌদ্দই মার্চ। তারা কিছু একটা বলতে পারতেন পক্ষে বা বিপক্ষে। কিন্তু তারা তা করেননি। বাঙলা একাডেমীও একটা পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারতো, তারাও কবিকে উপেক্ষা করেছে। জসীমউদ্দীন কি এতই উপেক্ষণীয় কবি প্রতিভার ধারক, যাকে অনায়াসে বাতিল করে দেয়া যায়?

অবশ্য আজকাল আমাদের অনেকেই অতীতকে অস্বীকার করার প্রবণতায় ভুগছেন। (বলাবাহুল্য এ রোগের লক্ষ্মণটা আমাদের মাথাওয়ালাদের দেমাগেই বড় বেশী প্রবল।) জসীমউদ্দীনকে স্মরণে না আনার কারণও সে প্রবণতারই ফসল বলেই ধারণা।

২৪. ৫. ৮৩

www.pathagar.com

কাদের নওয়াজের 'টুপি'

কবি কাদের নওয়াজ একটি উজ্জ্বল নাম। অবশ্যই কবিতার জগতে। এ উজ্জ্বলতা তাঁর প্রতিভার। এ উজ্জ্বলতা তাঁর কবিতার। সময়ের প্রেক্ষিতেই কাদের নওয়াজ প্রসঙ্গে এ উচ্চারণ। তাঁর কাব্যচর্চার যে সময়কাল তা ছিল একটি বিশেষ বলয়ে বন্দী। একমাত্র প্রতিভার তীক্ষ্ণতাই এ বলয়কে ভেদ করতে পারত। বিশেষ করে একজন মুসলমান কবির পক্ষে তা ছিল অসম্ভব, যদি না তার প্রতিভা সহায়ক শক্তিরূপে কাজ করত। তৎকালে যে কয়জন মুসলমান কবি-সাহিত্যিক তাদের নামকে সাহিত্যের পাতায় আটকাতে পেরেছিলেন তারা সবাই ছিলেন তাদের প্রতিভার ফসল। কাজী কাদের নওয়াজও ছিলেন এ দলেরই একজন। তাঁর যে সম্মান, যে প্রতিপত্তি তা তাঁর প্রতিভার। মনন এবং মেধার। প্রচার বা প্রভাবের নয়। যা আজকাল দেখা যায়।

কাজী কাদের নওয়াজের প্রচার-প্রভাব কোনটাই ছিল না। তা ছিল তাঁর রুচির বিপক্ষে। যে জন্যে তার কবিতা নিয়ে পত্র-পত্রিকার পাতায় তেমন একটা ঘাঁটাঘাঁটি হয়নি তার জীবনকালে। এ কাজটা যাদের আওতায় ছিল তারাও তেমন একটা আগ্রহ অনুভব করেননি তার প্রতি। তার কবিতার প্রতি। ছিটেফোঁটা ব্যতিক্রম ছাড়া। এটা তার বদনসিবই বলতে হয়। মৃত্যুর পরও একই দশা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কাদের নওয়াজের 'হারানো টুপি' কবিতাটি সঙ্কলিত করেছিলেন তাঁর একটি সংকলিত গ্রন্থে। ব্যক্তিগত চিঠি দিয়েও কবিকে উৎসাহিত করেছিলেন। মোহিত লাল মজুমদারও পরবর্তীকালে তাঁর 'কাব্য মঞ্জুষার' অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন 'হারানো টুপি' কবিতাটি ঊনিশ শ' চল্লিশে। সংকলনের 'কাব্য উন্মোচনী' অংশে মোহিত লালের মন্তব্য ছিল, "বাঙালীর কাব্যে টুপির কথা এ পর্যন্ত ছিল না, কারণ বাঙালী জাতির মাথায় টুপি নাই কিন্তু এক্ষণে যে কারণে খাঁটি বাংলায় বাঙালী কবিও টুপির মমতা প্রকাশ করিতেছেন, তাহাতে আশা হয় আমরা বাংলা সাহিত্যে অনেক নূতন বস্তু লাভ করব এবং তা দ্বারা বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হইবে।" তখন রবিঠাকুর এবং মোহিতলালের মত ব্যক্তিত্বের স্বীকৃতি ছিল কাদের নওয়াজের জন্য পরম পাওয়া। এ স্বীকৃতি তার কবি শক্তির। কিন্তু "বাঙালীর মাথায় টুপি নাই" মোহিতলালের এ মন্তব্যের সাথে একাত্ম নই। কারণ কাদের নওয়াজ কেবল বাঙালীই ছিলেন না, তাঁর বাঙালী পরিচয়ের শব্দটির আগে আরো একটি শব্দ যুক্ত ছিল। তা হল মুসলমান। মুসলমান বাঙালীর মাথায় কিন্তু তখনো টুপি ছিল। এখনো আছে। আগামীতেও থাকবে। টুপি তার নিত্য সঙ্গী। তবে মোহিতলালের এ কথাগুলো তার সংকীর্ণ

www.pathagar.com

মনোভঙ্গির ফসল তা বলছি না। তাঁর হৃদয়ের প্রসারতা নিয়েও তেমন কোন প্রশ্ন নেই। 'কালা পাহাড়'-এর মতো কবিতার স্রষ্টা মোহিত লাল। কিন্তু এ সত্য অস্বীকারের জো নেই যে পরবর্তীকালে তাঁর হৃদয়ের বৃত্ত বিন্দুতে এসে ঠেকেছিল। অবশ্য তিনি জানতেন টুপি সম্মান এবং প্রতিপত্তির প্রতীক। যে জন্য তিনি তার কণ্ঠকে উচ্চকিত করেছেন এই বলে যে, "তাহাতে আশা হয় আমরা বাংলা সাহিত্যে অনেক নূতন বস্তু লাভ করিব এবং তাহা দ্বারা বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হইবে।"

কাদের নওয়াজ 'হারানো টুপি'র শেষ দিকে লিখছেন—'চার মিনিটে 'চসার' পড়ে/শেষ করেছি টুপির জোরে/পরীক্ষাতে প্রথম হতাম থাকলে টুপি মাথার পরে/দুখের দিনের বন্ধু টুপি/কোথায় গেলি আজকে ওরে।" এ বিশ্বাস অবশ্য সব বাঙালীর নাই। কারণ এ বিশ্বাস তার ধর্মবিশ্বাস থেকে উদ্গত। যেমন 'পরীক্ষাতে প্রথম হতাম থাকলে টুপি মাথার পরে' এ বাক্যটি কেবল কথার খাতিরেই কথা নয় বা কাদের নওয়াজের কবি কল্পনার বৃত্তেই আটকা নয়, এ তার বিশ্বাসের যোগফল। যে বিশ্বাসের জন্ম হয় প্রতিটি মুসলমান বাঙালীর অন্তরের গভীরে। বলা বাহুল্য কবি কাদের নওয়াজের মাথায় কিন্তু টুপি থাকত। তবে টুপি তার কতদিনের সঙ্গী সে কথা জানি না। হয়তো তা জানেন কেউ কেউ। বছর চারেক আগে কবির মুখামুখি হয়েছিলাম তখনো তার মাথায় একটি কালো টুপি দেখেছি যা তার চেহারার উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করেছিল বহুলাংশে।

কাদের নওয়াজ নামের সাথে প্রথম পরিচয় স্কুল জীবনে। তাঁর 'উস্তাদের কদর' কবিতার মাঝ দিয়ে। ইদানীং অবশ্য এ শিরোনামকে বঙ্গকরণ করা হয়েছে। উস্তাদের কদর এখন 'শিক্ষকের মর্যাদা'। এ কর্মটি কে বা কারা করেছেন জানা নাই। উস্তদের কদর আর শিক্ষকের সম্মান শব্দ দু'টির মাঝে যেমন ধ্বনিগত পার্থক্য আছে বিস্তর, অর্থগত পার্থক্যটাও একেবারে উপেক্ষার নয়। তাছাড়া এতে করে কবিতাটির ভাবগাম্ভীর্যতাও নষ্ট হয়েছে। কারণ উস্তাদ শব্দের প্রতি ছাত্রের এবং তার অভিভাবকদের মনে যে সম্ভ্রমের উদ্রেক করে শিক্ষক শব্দের প্রতি তেমনটা করে না। কবি কাদের নওয়াজ ছিলেন উস্তাদের ভূমিকায় আমরণ। হয়তো এজন্যই এমন একটি কবিতার সৃষ্টি। এ প্রসঙ্গে বলা যায়, কাদের নওয়াজ কেবল তার ছাত্রদেরই উস্তাদ ছিলেন না তিনি ছিলেন আমাদের সমগ্র সমাজের উস্তাদ। তার এ একটি মাত্র কবিতা থেকেই সমাজ অনেক কিছুই আহরণ করতে পারে। আসলে প্রতিটি বিবেকবান কবি-সাহিত্যিকই তার নিজ নিজ সমাজের একেকজন উস্তাদ। কাদের নওয়াজ ছিলেন এ সারিরই লেখক। তিনি শিল্পের জন্যেই শিল্প সৃষ্টি করেননি। তার শিল্প ছিল কল্যাণের স্বপক্ষে। মানুষের মঙ্গলের স্বপক্ষে।

কাদের নওয়াজের জীবনের শেষ দিনগুলো গেছে অভাব আর অনটনে। অথচ কেউ কেউ গরীবীর লেবাস এঁটে হাজার হাজার টাকা পকেটস্থ করেন জনগণের তহবিল থেকে। কিন্তু কাদের নওয়াজদের পাওনা-দাওনা থাকে নানা বেড়াজালের ঘুরপাঁকে। তবে একথা ঠিক যে, কাদের নওয়াজদের উজ্জ্বলতা প্রতিভার। ষড়যন্ত্র বা উপেক্ষায় যার বিনাশ নাই।

২৯. ৩. ৮৩

www.pathagar.com

বাঙলা ভাষার লড়াই

শুরুতেই ষড়যন্ত্রের শিকার। এ যেনো তার ললাটের লিখন। যে ভাষা তার হৃদয়ের আর্তিকে প্রকাশ করতে গিয়ে প্রতিরোধের মুখোমুখি হয়েছিল। মুখোমুখি হয়েছিল লড়াইয়ের। তা ছিল তারা জন্মের শুভক্ষণেই। অর্থাৎ ধ্বনি যখন তার কণ্ঠে ভর করেছিল সেই মুহূর্তে। লড়াইয়ে হারজিত আছে। আছে লাঞ্ছনা-গঞ্জনা এবং অপমান-অপবাদ। যার সব ক'টার চিহ্নই বাংলা ভাষায় উজ্জ্বলভাবে আটকা। এ ভাষার ইতিহাস সংগ্রামের ইতিহাস। এ ভাষার ইতিহাস প্রতিবাদ-প্রতিরোধের ইতিহাস।

বায়ান্ন সালে ভাষার লড়াইয়ে রক্ত ঝরেছে অস্বীকার করি না। কিন্তু বাঙলা ভাষার লড়াই মাত্র আড়াই যুগের বা তিন যুগের নয়। আসলে বাঙলা ভাষা রাজরোষে পড়েছিল তার আঁতুড় ঘরেই।

দেশের শাসক এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা এতে তাদের সর্বনাশ আবিষ্কার করেছিল। শিশু বয়সেই তাকে ঠেংগিয়ে দেশছাড়া করেছিল। দেশছাড়া করেছিল এ ভাষার ধারকদেরও। তখন থেকেই বাঙলা ভাষার লড়াইয়ের সূচনা। যদিও সরবে নয়, নীরবে। বখতিয়ার খিলজিই পরবর্তীকালে এ ভাষার অন্তরে জীবনের স্পন্দন জাগিয়েছিলেন। এ ভাষার শাখা-প্রশাখাকে ফুলে-ফলে পল্লবিত করেছিলেন। এ কথা ইতিহাসের। যদিও কেউ কেউ এ দিকটাকে অন্ধকারে ফেলে রাখার পক্ষে।

বাঙলা পক্ষীর ভাষা, বাঙলা ইতরের ভাষা, যারা বাঙলা চর্চা করেন তাদের অধিবাস নরকে এসব বিশেষণের টানা-হেঁচড়াও এই সেদিনের। এই শাস্ত্রীর বাক্যগুলোর যারা ছিলেন আবিষ্কারক তারা সেন রাজাদেরই সার্থক উত্তরপুরুষ। কিন্তু পক্ষীর ভাষাই নতুন ঐ খিলজী শাসকের আদরে লালিত হলো। মাটির সাথে তার যোগাযোগ ঘটলো। কিন্তু সংস্কৃতসেবী পণ্ডিতদের ষড়যন্ত্র অনুসরণ করলো ছায়ার মতো। দেশের শাসক এর পক্ষে, তাই ষড়যন্ত্র ততটা গভীরে কামড় বসাতে ব্যর্থ হয়েছিল। পরবর্তীকালে অর্থাৎ ইংরেজ আমলে তারা তাদের মনের খায়েশকে পূরণকরেছিল। বাঙলাকে সংস্কৃতের 'দুহিতা' বানিয়ে ছেড়েছিল। কিন্তু বিধি বাম। ষড়যন্ত্র ফাঁস। সাময়িকভাবে প্যাচে ফেলেছিল অনেককে। বিশেষ করে এ দেশের বাঙলা ভাষী মুসলমানরা এর শিকার। এ ষড়যন্ত্রের উদ্দেশ্যই ছিল এটি। যার ফল দাঁড়াল এদেশের মুসলমানরা বাঙলা ভাষা থেকে নিজদেরকে কিছুটা আলগা করে নিল। এ সুযোগে বাঙলা ভাষা-সাহিত্য অবস্থান নিল ভিন্ন জগতে। চেহারা-সুরতেও ভিন্নতা এল। কিন্তু এর রেশ বেশীদিন থাকলো না। বাঙলাভাষী মুসলমানরা আবার এক করে

www.pathagar.com

নিল নিজেদের মেধাকে, যে মেধা একদিন এ ভাষার জমিনে নানা সোনালী ফসলের জন্ম দিয়েছিল। যে বাঙলা ভাষার চারাগাছটি নিজ হাতে লাগিয়েছিল, তাতে তারা আবার ঢালল স্নেহের পানি।

কিছুকালের জন্য বাঙালী মুসলমানরা যে এ ভাষার চর্চা থেকে নিজেদের দূরে রেখেছিল সে কথা অস্বীকার করার জো নেই। কিন্তু কেন? এর উত্তর দিয়েছেন কবি আবদুল ওহাব বাঙলা এগার শ' দু' সালে। উত্তরটা হল এ রকম-"আবদুল ওহাব কহে কদমে সবার/ত্রিপুরার বিচে জান মাকান আমার/শুন যত মোমেনান খেয়াল করিয়া/মোছলমান বাংলার আহাল জারিয়া।...আহলে হনুদ ও মোমেন সবের/এক ভাষা আছিলেক সে দোন জাতের/বাংলা জবান তারে বলিত সকলে/লিখিত পড়িত সবে খুষিখোষহালে।...কিন্তু ক্রমে ঘটীলেক এমন হালত/হনুদ কোশেশ কৈল হইতে তফাত/বাঙ্গালা জবান মধ্যে আনিলেক ছারা। কোফরী শেরেকী বাত ভরিল তাহারা/তা দেখি মোজেজ লোকেরা এছলামের/ছাড়িল সে ভাষা ভাঁই ঈমান খাতের।" তাহলে দেখা যাচ্ছে হনুদ অর্থাৎ এদেশের সংস্কৃত হিন্দু পণ্ডিতরা এমনটা ঘটিয়ে ছিল। আগে 'দোন জাতের' ভাষাতো একটাই ছিল আর তা ছিল বাংলা জবান। কিন্তু পরবর্তী ভাষা হলো দুই। কারণ 'হনুদের' তফাত থাকার খায়েশ।

বাঙলা ভাষার উত্তরণ নানা চড়াই-উতরাইয়ের সাঁকো বেয়ে। এ ভাষাকে কেন্দ্র করে সক্রিয় ছিল দু'টি শক্তি। একটি উৎখাতের আর অন্যটি প্রতিষ্ঠার। এই দুই শক্তির টানা-হেঁচড়ায় বাঙলা ভাষার শিরায় এখন দু'টি ধারা। যারা এ ভাষাকে উৎখতে তৎপর ছিল তারা কারা সে খবর দিয়েছি। বাংলা ভাষায় মূল ধারা কোন্‌টি সে কথাও কবি আবদুল ওহাব তার কবিতায় জানিয়েছেন। বাঙলা ভাষা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের সূচনা তার জন্মকালেই। অর্থাৎ শব্দ উচ্চারণের প্রাক্কালেই। সেন রাজারা ছিল যার প্রথম প্রতিপক্ষ।

বায়ান্নর একুশে ছিল ভাষা আন্দোলনের ফাইনাল লড়াই। সেন ষড়যন্ত্রের বিপক্ষে খিলজী-শাহ্‌রা যে লড়াই করে বাঙলা ভাষাকে মানুষের মুখের এবং মায়ের ভাষারূপে প্রতিষ্ঠা করেছিল, বায়ান্নর লড়াই তাকে অভিষিক্ত করেছিল।

২১. ২. ৮৩

www.pathagar.com

যায় মান যায় ধন না যায় বাতিক

এই তো দেয়াল থেকে অপসারিত হয়েছে বিরাশির দিনপঞ্জি। সেখানে অবস্থান নিয়েছে তিরাশির নতুন পাতা। এক দিন এ পাতাও ঝরবে। আসলে ব্যাপারটা কি কেবলই সময়ের আসা-যাওয়া? গতকে বিদায় দিয়ে আগতকে স্বাগত জানানো? বিরাশি তো গেলো, সাথে কি নিলো? কেউ হয়তো জবাবে বলবেন, হতাশা, ক্ষত-বিক্ষত মানব সভ্যতার জয়িফ গতর আর দাম্ভিক মানুষের নিস্ফল দম্ভ। তবে সবচে দামী যে জিনিসটি নিলো তা আমাদের আয়ু। নতুন বছরের আগমনের অর্থই হলো জীবনের বৃক্ষ থেকে আয়ুর একটি হরিৎ পাতাকে বিদায় দেয়া। সময়ের স্রোত যাকে ভাসিয়ে নিচ্ছে অনন্তের দিকে। যদিও সবাই সময়ের স্রোতকে আটকাতে চাই। আটকে রাখতে চাই আয়ুর হলুদ পাতা। রবি ঠাকুরের ভাষায় "এ অনন্ত চরাচরে স্বর্গমর্ত্য ছেয়ে/সবচেয়ে পুরাতন কথা, সবচেয়ে গভীর ক্রন্দন/যেতে নাহি দিব হায়/তবু যেতে দিতে হয়, তবু চলে যায়।" আর এটাই এ জগতের নিয়ম। চলে যায়। এবং চলে যাবে। আটকে রাখার আকুলতা বেকুলতার বৃত্তেই সীমায়িত। তাই এসব কথার ইতি এখানেই।

গত তো আগতেরই ভিত। গত দিনের শক্ত ভিতের উপরই নির্ভর করে আগামী দিনের সফলতা। আজকাল অবশ্য অনেকেই গতকে একেবারেই অন্ধকারে ঠেলে রাখার পক্ষে। তাদের ভাব-ভাবনা, আশা-ভরসা আজ এবং আগামী কালের বৃত্তেই ঘুরপাক খায়। গতকালে তাদের কাছে বিষবৎ। এক সংখ্যাটিকে বাদ দিয়ে দুই এবং তিনের কি মূল্য থাকতে পারে তা বোধের বাইরে। পিতৃ পরিচয়হীন সন্তানকে সমাজে কি অভিধায় বিশেষিত করা হয় তা হয়তো কারোই অজানা নয়।

বছর দু'এক আগে একটা লেখা পড়েছিলাম। লেখাটার শিরোনাম ছিল 'পুনশ্চ নারী' ধারাবাহিকএকটা নিবন্ধ। লেখক নীরদ মজুমদার। ছাপা হয়েছিল কলকাতার একটা সাপ্তাহিকে। লেখাটা মজুমদার বাবুর স্মৃতি রোমন্থন জাতীয়। সে লেখাতেই 'রনে গেনোর' সাথে আমার প্রথম মোলাকাত। তাতে যতটা জানলাম মনে হলো রনে গেনো একজন সত্য সন্ধানী পণ্ডিত ছিলেন। পেশায় ছিলেন অধ্যাপক। বিশেষজ্ঞ ছিলেন গণিত এবং ন্যায় শাস্ত্রে।' লেখক, রনে গেনোর পরিচয় লিখছেন এভাবে—"রনে গেনো ১৮৮৬ সালে ব্লোয়াতে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ছিলেন স্থপতি। গেনো ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী বহু ভাষাবিদ। শিক্ষালাভ করেন বিজ্ঞানে ও সাহিত্যের ছাত্র হিসাবে ব্লোয়াতে। স্বর্ণপদক পান গণিতে। ১৯০৪ সালে আসেন পারীতে। পরে স্যাজার্স আঁ-লে-তে। ১৯২১ সালে লেখেন 'ডক্ট্রিন হিন্দু' নামে একটি পুস্তক। তারপর থিউজফিইজম, মেকি

www.pathagar.com

ধর্মের ইতিহাস। ১৯২৫-এ লেখেন 'ল অম এ সোঁ দ্যভিনির সলোলে বেদান্ত' ইত্যাদি জ্ঞানগর্ভ সব পুস্তক। এই সব গ্রন্থ তুলনাহীন। সার্বিক ঐতিহ্যের বিষয়ে তাঁর বক্তব্য এবং বিশ্লেষণ তাসের মত বিছিয়েছেন জীবনের শেষ দিন অবধি। ১৯৫১ সালে যিনি রচনা করেন এক বিরাট গ্রন্থ সব ধর্মের ও সভ্যতার এক বিরাট পরিপ্রেক্ষণে। দেহত্যাগ করেন মিসরে ১৯৫১ সালে।"

মোটকথা, গেনো ছিলেন সত্যানুসন্ধী মনের ধারক। বিশেষজ্ঞ ছিলেন অংক এবং ন্যায়শাস্ত্রে। যে জন্যে তিনি ন্যায় তথা সত্যকে আত্মস্থ করেছিলেন অংকের যোগ-বিয়োগ এবং পূরণ-ভাগের নির্ভুল ফলাফলের সূত্র ধরে। সত্য তার কাছে ধরা দিয়েছিল। তিনি ইসলামকে তার বিশ্বাসের কারুময় বাক্সে বন্দী করেছিলেন। তাঁর ধ্যান-ধারণা পাশ্চাত্যের অনেক জাঁদরেল পণ্ডিতের চৈতন্যেই ঝড় তুলেছিল। অনেকের চিন্তাকে করেছিল ধূলিসাৎ। মজুমদার বাবু কথাগুলো সাজিয়েছেন এভাবে—"অকাট্য যুক্তি দিয়ে আধুনিক দর্শন আধুনিক মেকী ধর্ম যে কত অসার প্রতিপন্ন করেছেন। দেখিয়েছেন নিছক ভ্রান্তের কলাকৌশল।" আসলে রনে গেনোর চিন্তা-চেতনা ছিল অংকের ফলাফলের মতই অভ্রান্ত। নিবন্ধ লেখক এ সত্যটাকেই তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। যেজন্যে পাশ্চাত্যের পণ্ডিতদের চিন্তা-চেতনার পাশাপাশি খাড়া করেছেন গেনোকে। লেখক ফরাসী পণ্ডিত আঁদ্রেজিদের সাথে দেখা করেছিলেন। তুলেছিলেন গেনো প্রসঙ্গ, আঁদ্রেজিদ-এর মন্তব্য নাকি ছিল এ রকম—"আমার কালে রনে গেনোর লেখা প্রকাশিত হয়নি। আজ অনেক দেরী হয়ে গেছে, দান চালা হয়ে গেছে, কিছুই করার নেই। যে কথায় যোগীদের স্বস্তিদান করে সে কথায় এ দেহ আর ভাঁজ বাধে না। অথচ এইসব কথাই একমাত্র আমাদের ধ্যানমগ্ন করতে পারে। সত্য বলতে কি, আমি সত্যই যে অবস্থায় পৌছতে চেয়েছি, সেই লক্ষ্যের দিকেধাবিত হতে চেয়েছি যেখানে নিজকে গুটিয়ে আনা যায়। গেছি তারই সন্ধানে যা লাভ করলে ব্যক্তিত্ব পৌছায় অনন্ত সত্তায়। আমি দুঃখের সঙ্গে বলতে পারি আমার অক্ষমতার কথা...। আমি থেকেছি দেকার্ত ও বেকনের জগতে আমার পাঠকের কাছে আমার পাশ্চাত্যের ভাবরূপে আমি নিজকে বিন্যাস করেছি। কিন্তু তাই আজ কেন আমি আমার নিজের বিরুদ্ধতা করবো? কিসের জন্য? যদিও গেনোর "অভূতপূর্ব চিন্তা আমাকে বিমুগ্ধ করেছে। অনেক জ্ঞান আমাকে দিয়েছে। মনোজ্ঞ নিশ্চয়ই। আমার মনের ভিতরের সায় না থাকা সত্ত্বেও আকৃষ্ট হয়েছি। হয়তো এখন পিছু হাঁটা আর চলবে না। আমাদের চূড়ান্তভাবে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কিছুই করার নেই। প্রয়োজন হলে আমরা আমাদের ধ্বংসের দিকে চলে যাব।" মজুমদার বাবু আঁদ্রেজিদের এমন আরো কয়েকটি জিদের কথা উল্লেখ করেছেন তার লেখায়। যা পুরাপুরিভাবেই হাস্যকর। আঁদ্রেজিদের এ অমূলক আশঙ্কা এবং তার উপর মন্তব্য করতে গিয়ে মজুমদার বাবু তার বন্ধুর কাছে সুন্দর একটা বাক্য রেখেছিলেন। বাক্যটা দেখুন—"দেখছো ফ্রাঁসিস, মায়ার বন্ধনে পশ্চিম কি করুণভাবে জড়িয়ে পড়েছে। পুতুল খেলাই তোমাদের শেষ খেলা।"

তবে একথা বলা যায় যে, আঁদ্রের হয়তো ধারণা জন্মেছিল, গেনোর চিন্তার কাছে যদি আত্মসমর্পণ করা হয় তবে হয়তো জিদের এতদিনের গড়া খ্যাতির সৌধ ধসে

www.pathagar.com

যাবে। যে জন্য মনে মনে মেনে নিলেও প্রকাশ্যে সাহস করেননি এক অমূলক আশংকায়।

এমন আশংকা আমাদের অনেক বড় মাথাওয়ালাদের মনেও বাসা বেঁধেছে। ইদানীং তাদের ধারণাও আঁদ্রেজিদের অনুগামী, ভয় এবং মোহ। যদিও আলো এবং আঁধারের পার্থক্যটা মোটেও অজানা নয় তাদের কাছে। কিন্তু প্রকাশে অনীহা, কারণ ঐ 'জিদ' আর খ্যাতির মোহ। রনে গেনোর খ্যাতির সৌধ কি ধসে গেছে।

কথা হচ্ছিল, নতুন বছরের প্রত্যাশা নিয়ে। প্রত্যাশা হোক সত্যকে অন্তরে উপলব্ধি করার। প্রত্যাশা হোক মনন এবং মেধার বিস্তার যা সত্যের সীমাকে স্পর্শ করতে পারে অবলীলায়। খ্যাতির সুরম্য সৌধ ধসে যাক। তবু যেন আঁদ্রেজিদের মতো অন্তরে আলোর বিপক্ষে কোন 'জিদ' জমা না বাড়ে। নতুন বছরে এটাও একটা প্রত্যাশা হোক। আমাদের সকলের।

১০. ১. ৮৩

www.pathagar.com

আকাল পাঠকের না লেখকের–

পাঠকরা আর বই কিনছেন না। আমাদের কবি-সাহিত্যিকরা কি লিখছেন তা তারা চোখের আওতায় আনছেন না। যে কারণে এ দেশের লেখকদের বই বছরের পর বছর গুদামে ইঁদুরের হাওলায় থেকে যাচ্ছে। ব্যাপারটা দুঃখের। এবং আশংকার। কিন্তু কেন? অর্থনীতির হেরফের? ভাত-মাছের শরীরও তো গরম হয়েছে, গামছা-লুঙ্গিরও একই দশা। কারণ ঐ অর্থনীতির হেরফের। ধরে নিলাম এর সাথে ওর কোনরকম তুলনা আহাম্মকি। বই আর ভাত এক জিনিস নয়। বুঝলাম। তাহলে পান-বিড়ির কথায় আসুন। কই এগুলো থেকেও তো কেউ মুখ ফিরায়নি। দফায় দফায় তো এরা দামের সিঁড়ি পার হয়ে যাচ্ছে। আর এর ভক্তরা তো প্রয়োজন মতো মই লাগিয়ে তাদের সাথে গলাগলি করছে। কোলাকুলি করছে। এখানেও প্রশ্ন উঠতে পারে পান-বিড়ির যারা ভক্ত তাদের সবাই বইয়ের ভক্ত নাও হতে পারে। মানলাম সবাই পড়ুয়া না। কিংবা কেউ কেউ তো পড়ুয়া। তারাও আজকাল বই-পত্রের ধারে-কাছে ঘেঁষছেন না। যার ফল দাঁড়িয়েছে বই লেখকরা প্রকাশক পাচ্ছেন না আর প্রকাশকরা বই ছাপিয়ে ক্রেতা পাচ্ছেন না। তাই অনেকের আশংকা যদি এমন চলে তবে এদেশের সাহিত্যের ঝলমলে জমিনে আঁধার নামতে বেশী দেরী নাই। যদি বলি এখানে আঁধার না, খরা চলছে। প্রয়োজন কেবল সেচের। আর এজন্য দরকার দক্ষ কর্মীর।

আমাদের লেখকরা পাঠকদের কাছে আসতে পারছেন না। অর্থাৎ পাঠকদের মনের সাথে লেখকদের মনের কোথায় যেন একটা বেমিল দেখা দিয়েছে। যে কারণে তাদের দু'তরফের দুরত্বটা দিন দিনই আলগা হচ্ছে। একটু সরল এবং সহজভাবে বললে বলতে হয় এভাবে– পাঠকের মনের যে ক্ষুধা তা মিটাতে ব্যর্থ হচ্ছেন আজকের লেখকরা। পাঠক যা চায়, তা তারা পাচ্ছে না তাদের কাঙ্খিত লিখিয়েদের কাছে। এটা অনেক পাঠকের কণ্ঠেরই প্রতিধ্বনি।

লিখিয়েদের কিন্তু ভিন্ন স্বর। তাদের কারো কারো মত চিন্তা-ভাবনার দিক থেকে আজকের লেখকরা পাঠকদের কাছ থেকে অনেক আগে। যে কারণে পাঠকরা তাদের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। কেউ কেউ তো সরবে উচ্চারণই করেন যে আজকে যারা লেখেন তারা আর একজন লেখকের জন্যই লিখেন। কারণ তাদের শিল্পিত বোধ দিয়ে যা সৃষ্টি করেন তা সাধারণ পাঠকের বোধের নাকি বাইরে। প্রয়োজন অসাধারণ পাঠকের। কিন্তু মুশকিল হলো আমরা যে সব সাধারণ পাঠকের তালিকায়?

www.pathagar.com

আজকাল আমাদের লেখকরা কি লিখছেন? তাদের ধ্যান-ধারণা কি? যা তাদের সৃষ্টিতে আটকে দিচ্ছেন? যদি বলি সেখানে এদেশের মানুষের উপস্থিতি শূন্যের কোঠায়? অর্থাৎ বাকহীন মরা লাশের মতো। সবচেয়ে চরম কথা যা তা হলো তাদের লেখা পড়ে মনেই হবে না যে এদেশের মানুষ নারীর শরীর এবং নেশা-টেশা ছাড়া অন্যকিছু চিন্তা করে। তাদের সকাল সন্ধ্যার জপমালাই যেন এই একটা বিষয়। এ ব্যাপারটা আমাদের লেখকদের মগজে বেশ জুতসই জাগাটাই দখলে রেখেছে। প্রবীন থেকে নবীন সবাই প্রায় একই কাতারে খাড়া। অবস্থাটা হয়েছে এমন, কলম ধরলেই তাদের চোখ ঐ শরীরেই আটকে যায়। তাদের দৃষ্টির সীমাই যেন এ পর্যন্ত।

এই তো সেদিন একজন লেখককে প্রশ্ন করেছিলাম তার একটা লেখার শরীরি ব্যাপার-স্যাপার নিয়ে। তার উত্তর ছিল, নারীর শরীর বা এ জাতীয় শারীরিক ব্যাপারগুলো দিয়ে একটা দর্শনকে বুঝানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। বলেছিলাম, এই যে দর্শনের কথা বলছেন তার বৃত্ততো আপনার মগজের প্রকোষ্ঠেই। পাঠক তো অতশত দর্শন বুঝে না। পাঠকের কাছে তো আপনার কথিত দর্শয়নের 'দ' বার বার 'ধ' হয়েই ধরা দিচ্ছে।

নজিবুর রহমানের আনোয়ারা-মনোয়ার এখনো পাঠককে আলোড়িত করে। কারণ এ বইগুলোতে সে তার আপন সত্তাকে অবিষ্কার করতে পারে। তাই এতো সময়ের ব্যবধানেও যে পাঠক হারায়নি। বছরে দু'একটা সংস্করণ এর হচ্ছেই। সাধারণ থেকে অসাধারণ পাঠকও আনোয়ারা-মনোয়ারার হৃদয়কে নিজেদের হৃদয়ে ধারণ করতে পারে। অন্যদিকে বিষাদ সিন্ধু এখনো তার লাখ লাখ পাঠককে আলোড়িত করছে এবং আগামীতেও করবে। কারণ মনের সাথে মনের জানাশোনা। অখাদ্য দু-একবার গলধকরণ করা যায়। কিন্তু কুখাদ্য!

বলা হয় মূল্যবৃদ্ধির জন্যে মানুষ আর বই কিনছে না। কিন্তু আমার জানা মতে তিনশ' টাকা মূল্যের বইও এদেশের পাঠক লাইন দিয়ে কিনেছে। এখনো কিনছে। তাও আবার নিরেট নিবন্ধ এবং প্রবন্ধ।

তাছাড়া তাদেরই প্রকাশিত বইগুলো প্রতিবারেই নতুন করে ছাপতে হচ্ছে। শিশু সাহিত্যের বেশ কিছু বই তো বছরে দু'বার করে ছাপার প্রয়োজন হয়ে পড়ে ছিল। যাদের ছাপার সংখ্যা প্রায়গুলোরই দশের কোঠায়। দশ বলতে দশ হাজারকেই বুঝাতে চাচ্ছি। এই যখন দৃশ্য তাহলে কি করে বলি এদেশে পাঠকের আকাল? এ দেশের মানুষ পাঠ বিমুখ হয়ে পড়েছেন? তাহলে আকালটা কার–পাঠকের? না লেখকের?

২০. ১২. ৮২

www.pathagar.com

ছাত্র শিক্ষক এবং অভিভাবক

সময় গত হয়েছে অনেক। প্রাইমারী শ্রেণীতে পড়েছিলাম কবিতাটি। স্রষ্টা ছিলেন কবি কাদের নেওয়াজ। তখন 'উস্তাদের কদর' ছিল কবিতাটির শিরোনাম, এখন 'শিক্ষকের মর্যাদা'। স্মরণের ক্ল্যাকবোর্ড থেকে কবিতার পংক্তিগুলো এক প্রকার মুছেই গিয়েছিল। তবে বইয়ের পৃষ্ঠায় শিল্পীর আঁকা ছবিটি এখনো চোখের ক্যানভাসে আটকা আছে হুবহু। ছবিটি ছিলো উস্তাদ অজু করছেন। আর তার শিষ্য (বাদশাজাদা) বদনা থেকে তার পায়ে পানি ঢালছে। এখনকার বইয়ের ছবিটিও অদলবদল হয়েছে। কবিতাটির শুরু ছিল এ রকম– "বাদশা আলমগীর/কুমারে তাহার পড়াইত এক মৌলবী দিল্লীর/একদা প্রভাতে গিয়া/দেখেন বাদশা শাহজাদা এক পাত্র হস্তে নিয়া/ঢালিতেছে বারি গুরুর চরণে/পুলকিত হৃদে আনত নয়নে/শিক্ষক শুধু নিজ হাত দিয়া নিজেরই পায়ের ধুলি/ধুয়ে মুছে সব করিছেন সাফ সঞ্চারি অঙ্গুলি।" বাদশার তখন এ দৃশ্যটি মোটেই মনঃপুত হয়নি। ডাকলেন শিক্ষককে খাস কামরায়। "শিক্ষককে ডাকি বাদশা কহেন শুনুন জনাব তবে/পুত্র আমার আপনার কাছে/সৌজন্য কি কিছু শিখিয়াছে? বরং শিখেছে বেয়াদবি আর গুরুজন অবহেলা।... দেখিলাম আমি দাঁড়ায়ে তফাতে/নিজ হাতে যবে চরণ আপনি করেন প্রক্ষালন/পুত্র আমার পানি ঢালি শুধু ভিজাইছে ও চরণ/নিজ হাতখানি আপনার পায়ে বুলাইয়া সযতনে/ধুয়ে দিলোনাকো সে চরণ, স্মরি বড় ব্যথা পাই মনে।" কবিতাটি অবশ্য এখনো পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ানো হয়। শিক্ষকরা পড়ান। ছাত্ররা পড়ে।

আর অভিভাবক? তাদের কথা সঠিকভাবে বলা কিছুটা মুশকিল। কারণ তদের অনেকেরই সময়ের বড় বেশী অভাব। যদিও বা কারো নজরে এসেও থাকে তাহলেও হয়তো কবিতাটির অন্তরের অর্থটি নিয়ে ততটা উৎসাহিত নন তারা। ওস্তাদের পায়ে পানি ঢালা না ঢালা নিয়ে যেমন নির্বিকার তেমনি ওস্তাদের পায়ে লাঠি মারলেও আজকের অভিভাবকরা তেমনি নিরুদ্বেগ। বেশ কয়েকদিন যাবতই কবি কাদের নেওয়াজ এবং তার কবিতা মাথায় উঠা-নামা করছিল। ভাবছিলাম বাদশা আলমগীর গত হয়েছেন তাঁর সাথে সাথে যেন উস্তদের কদরও আলো থেকে অন্ধকারে ঢুকেছে। আর অন্ধকারে ঢুকেছে অভিভাবকের সতেজ বিবেক। বিষয়টা হয়তো কবির হৃদয়কেও ধাক্কা দিয়েছিলো। যে কারণে এ ভাবনার শাব্দিক প্রকাশ।

জ্ঞানী-গুনীদের ধারণা, শিক্ষা নাকি মানুষকে সভ্য করে। অর্থাৎ মনের পশুত্বের পোশাকটা বদলে দেয়। সংস্কার মুক্ত করে। করে পরিশীলিত এবং পরিমার্জিত। আর

www.pathagar.com

মস্তিষ্কে জমা করে ভাল এবং মন্দকে যাচাই করার মতো একটি দুর্লভ অনুভূতি, যার নাম বিবেক।

কিন্তু যখন দেখি শিষ্য তার গুরুর ঠ্যাং ভাঙছে অবলীলায় তখনই জ্ঞানীদের সে আপ্তবাক্যে আর বিশ্বাসকে ধরে রাখতে পারি না। এই তো সাপ্তাখানেক আগের খবর। শিষ্য তথা ছাত্রদের হাতে শিক্ষকরা নাজেহাল হয়েছেন। কারু কারু অবস্থা নিকি শংকিত হবার মতো। খবরটা ছিল চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের। শিষ্যরা তাদের গুরুদের শরীরে হাত তুলেই শান্তশিষ্ট হয়ে বসেছিল না, পেছনের লেজটাও এধার ওধার করেছে বার কয়েক। গাড়ী থামিয়েছে। টেলিফোনের তাঁর কেটেছে। আগুন দিয়েছে এখানে সেখানে। ঢাকায়ও 'ডাক্তার ছাত্র'রা তাদের ছুঁরি-কাঁচি নাড়াচাড়া করেছেন। তালা ঝুলিয়েছেন গুরুর ঘরে। ধাক্কাধাক্কি করে গুরু শিষ্যরা শক্তি পরীক্ষা করছেন। যারা এমনটা করলো তারা কি অশিক্ষিত জন? তারা তো সবাই শিক্ষিত জনদেরই তালিকায়। তাহলে তাদের আচরণে এমন উচ্ছৃংখলতার কারণ! গুরুদের প্রতি শিষ্যদের এমন একটা বিতৃষ্ণাকর মনোভঙ্গি খাড়া হবারই বা কারণ কি? এসব বিষয়ে অবশ্য ভিন্ন জনের ভিন্ন মত। কারো ধারণা, সামাজিক অস্থিরতা আবার কারো আঙ্গুল অর্থনৈতিক শরীরকে বিদ্ধ করে। মোট কথা সামগ্রিক নৈরাশ্যতাই এর কারণ বলে অধিকাংশের বিবেচনা হতেও পারে। কিন্তু বিবেচনা-টিবেচনা যাই থাক আমার মনে হয় এর আরো কিছু কারণ আছে। তা হলো অভিভাবকদের নির্লিপ্ততা এবং অসহযোগিতা। অতীতে দেখেছি গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক ছিল পিতা এবং সন্তানের মতো। অবিভাবকরাও তাদের সন্তানদের এ সত্যটাই জানিয়ে দিতেন। অর্থাৎ তখনকার অভিভাবকেরা তাদের সন্তানদের মনের নরম জমিনের বেশ গভীরেই পুতে দিতেন এমন একটি সোনালী বীজ। এ বীজ থেকে যে ফসল ফলতো তা থেকে ঝরত বিনয় এবং শ্রদ্ধা। গুরুর স্নেহ এবং ভালবাসা। শিষ্যের বিনয় এবং শ্রদ্ধার চারা গাছটি হয়ে উঠতো এক বিরাট মহীরূহে। কিন্তু আজ? অনেক অভিভাবককেই দেখেছি শিক্ষককে শাসাতে। কারণ, তার সন্তানকে সে শিক্ষকটি কটু কথা বলেছেন অথবা শারীরিকভাবে কষ্ট দিয়েছেন। এমন দৃশ্য একটা নয়—অসংখ্য নজির টানা যাবে। যা তার সন্তানের মনকেও প্রভাবিত করে। একজন শিক্ষকের প্রতি অভিভাবকের শ্রদ্ধার কথাটাই বুঝাতে চাচ্ছি। সেই শ্রদ্ধার গলিপথেই তার শিশু সন্তানের মনে এসে জমা হয়। এ শ্রদ্ধা প্রসঙ্গে একটা গল্প শুনিয়ে ছিলেন এক বন্ধু।

একজন জজ সাহেব। তার সন্তানদের জন্য গৃহশিক্ষক রেখে ছিলেন। প্রতিদিনই জজ সাহেব সেই শিক্ষককে গেইট থেকে এগিয়ে আনতেন। আবার চলে যাবার সময় তাকে কিছুদূর এগিয়ে দিয়ে আসতেন। এতে করে সেই শিক্ষক বেচারা বেশ লজ্জাবোধ করতেন। একথা তিনি জজ সাহেবকে জানালেন। জজ সাহেবের উত্তর নাকি ছিল এ রকম যে, আমার সন্তানরা শ্রদ্ধা শিখুক বিনয় শিখুক। আর জানুক একজন শিক্ষক জজ থেকে ছোট নয়। গল্পটি সত্য কি মিথ্যা তা যাচাইয়ের বিষয় নয়। দেখার বিষয় অভিভাবকের বিবেক এবং বোধ। যা তার সন্তানদের প্রভাবিত করে। কিন্তু আজ এ ব্যাপারগুলো প্রায় শূন্যের কোঠায়। এর উলটা পিঠেও অবশ্য ব্যাপার আছে। তা হলো

www.pathagar.com

গুরু তথা শিক্ষকদের অগুরু সুলভ কার্যকলাপ। অনেক অকাজ কুকাজে শিক্ষকদের জড়াজড়ি করতে দেখা যায়। কাগজের পৃষ্ঠায় এমন খবর প্রায়ই নজরে পড়ে। নজরে পড়ে এমন অনেক কিছু যা সত্যি ভাবনা চিন্তার তন্ত্রিকে স্পর্শ করে। স্পর্শ করে শ্রদ্ধা এবং বিনয়ের বৃক্ষকেও। তাছাড়া শিষ্য যথা ছাত্রদের প্রসঙ্গেও কারো কারো মত, এই উচ্ছৃঙ্খল ছাত্ররাই কেউ পরবর্তীকালে শিক্ষক হয়, সমাজপতি হয়, আরো বড় বড় আসন দখল করে। সাথে বহন করে নেয় সেই উচ্ছৃংখল মন-মগজ। তা তাদের সব কাজকামকেই উলট-পালট করে দেয়। কথা হলো গুরু-শিষ্য এবং অভিভাবক সবাই যেন একই বৃত্তে ঝুলছে। ঝুলছে আমাদের সমাজ-সংসার। ঝুলার কারণ অই বিবেক এবং বোধ। যা এখন আমাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে। আর এই বিবেকের জন্য প্রয়োজন বাদশা আলমগীরের মতো মনের। অর্থাৎ আলমগীরের মতো অভিভাবকের। যে অভিভাবক তার সন্তানকে বলতে পারেন "পুত্র আমার পানি ঢালি শুধু ভিজাইছে ও চরণ/নিজ হাতখানি আপনার পায়ে বুলাইয়া সযতনে। ধুয়ে দিলো নাকো সে চরণ, স্মরি' বড় ব্যথা পাই মনে।"

২৯. ১১. ৮২

www.pathagar.com

'তথাপি যবন জাতি না করি প্রতিতি'

"পশ্চিমবঙ্গ হইতে আমরা প্রতি বৎসর ৬০/৭০ লাখ টাকা মূল্যের বইপুস্তক আনিয়া থাকি কিন্তু আমাদের লিখিত বই-পুস্তক পশ্চিম বঙ্গে যাইতে পারে না। আমাদের এখানে যেমন কত টাকার বই-পুস্তক আনিতে পারিব তাহার অঙ্ক নির্দিষ্ট আছে, আমার বিশ্বাস পশ্চিমবঙ্গে তেমন অঙ্ক চিহ্নিত নাই। দান-প্রতিদান না থাকিলে সেই সখ্য বেশীদিন টিকে না। একমুখী পথে যাওয়া-আসা চলে না। এদেশে ওদেশে ভালবাসার বন্ধন যাহারা আরো অন্তরঙ্গ করিতে চান তাঁহারা যেন এই কথাটি ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখেন।

সাহিত্য জনজীবনের বহিরঙ্গ এবং অন্তরঙ্গ লোকের আলেখ্য। পদ্মা, মেঘনা, ধলেশ্বরী নদীর তীরে তীরে এদেশের উদার গগনতলে অবারিত মাঠের কোলে যাহারা ঘর বসতি করিয়া জীবনের কাহিনী রচনা করে, আমাদের সাহিত্য তাহাদেরই কথায় ভরপুর। কি আমরা হইতে চাহিয়াছি, কি আমরা হইতে পারিয়াছি, কি আমরা হইতে পারি নাই—যুগে যুগে এই কাহিনীই শুধু আমাদের সাহিত্যকে রূপ দিয়াছে। তাহা না জানিলে ওদেশের বন্ধুরা যতই উদারমনা হউন, আমাদের কিছুই জানিতে পারিবেন না।... এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা আসিয়া পড়ে। পশ্চিমবঙ্গের অসংখ্য নভেল, নাটক, কাব্যগ্রন্থ এখানকার কতকগুলি প্রকাশক হরিলুটের মত লেখকের প্রাপ্য পারিশ্রমিক ছাড়া অবাধে প্রকাশ করিয়া বিক্রি করিতেছে।... পশ্চিমবঙ্গের বইগুলি বিনা রয়েলটিতে ছাপাইবার সুযোগ পাইয়া সেই সব বই-এর দাম যথারীতি কম রাখা হয়। এখানকার প্রকাশকেরা তাই দেশী লেখকদের বই-পুস্তক ছাপাইতে চাহেন না। বই-পুস্তকের পাণ্ডুলিপি হস্তে লইয়া এদেশের বই লেখকেরা চোখের পানিতে বুক ভাসায়। এরূপ চলিতে দেওয়া আমাদের রাষ্ট্রের পক্ষে অমার্জনীয় অপরাধ। বিদেশের সাহিত্য ও জ্ঞান ভাণ্ডারের পথ আমরা রুদ্ধ করিতে চাহিনা।... কিন্তু আমাদের পায়ের তলার ভিত্তি ভূমি উৎখাত করিয়া আমরা অপর দেশের সাহিত্যকলা হজম করিতে পারিব না।"

এই সাহসিক শব্দগুলো কবি জসীমউদদীনের। সাহসিক এ জন্যে যখন কবি তার এই উজ্জ্বল শব্দগুলো উচ্চারণ করেছিলেন তখন সময়ের স্রোত ছিল এর বিপরীতে। এ বিপরীত স্রোতের ধারাও ছিল খুব সবল। তাই এই সবল স্রোতের বিপক্ষে সাঁতার কাটা ছিল অনেকের পক্ষেই কষ্টকর। জসীম উদদীন এই অসাধ্যই সাধন করেছিলেন।

উনিশ শ' চুয়াত্তর সালের ফেব্রুয়ারী মাস। বাংলা একাডেমীর চত্বরে এলাহি আয়োজন। যে আয়োজনের উদ্যোক্তা ছিলেন একাডেমী কর্তৃপক্ষ। যার বিস্তার ছিল

www.pathagar.com

পুরো আটদিন। অর্থাৎ পহেলা ফাল্গুন থেকে আটই ফাল্গুন পর্যন্ত। যে আয়োজনের শিরোনাম ছিলো 'বাংলা সাহিত্য সম্মেলন'। বিভিন্ন দেশ থেকে প্রতিনিধিরা যোগ দিয়েছিলেন এ সম্মেলনে। সবচেয়ে বড় দলটি ছিল ভারতীয় প্রতিনিধিদের। যার দলপতি ছিলেন অন্নদাশঙ্কর রায়। সম্মেলনের উদ্বোধন করেছিলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান। চন্দনের তিলক পরিয়ে অনুষ্ঠানের 'বিসমিল্লাহ' করা হয়েছিল। (তবে এ চন্দন সবার ভাগ্যে জোটেনি। কেবলমাত্র মঞ্চে উপবিষ্ট মেহমানদের কপালের ঔজ্জ্বল্যই বৃদ্ধি করেছিল।) অনুষ্ঠানটির মূল সভাপতি ছিলেন কবি জসীম উদদীন। তিনি তার দীর্ঘ ভাষণে মনের সুপ্ত কথাগুলোকেই মুক্ত করেছিলেন। যার সামান্য অংশমাত্র এ লেখার শিরোভাগে টুকে দিয়েছি। সেদিন তুমুল করতালির মাঝ দিয়ে তিনি তাঁর ভাষণের ইতি টেনেছিলেন। নাহ্। সাহিত্য সম্মেলনের কোন সরস বর্ণনা এ লেখা নয়। তবে কবির কথাগুলো যে অনেকের চৈতন্যকেই প্রবলভাবে ঝাঁকুনি দিয়েছিল জনতার সশব্দ করতালিই ছিল তার প্রমাণ। সপ্তাহ কয়েক আগে কবি আল মাহমুদও এই ধ্যান-ধারণাটাকেই টেনেটুনে আরো কিছুটা ডাঙ্গর করে দিলেন। পশ্চিমবঙ্গে সৈয়দ মুজতবা আলী বা কাজী আবদুল ওদুদের মত ব্যক্তিত্বের স্থান এখন কোন্ সারিতে সে প্রশ্নও তুলছি না। এ প্রসঙ্গে হুমায়ুন কবিরের কথাও এসে যায়। নজরুলের মতো প্রতিভাও পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে উদারপন্থীদের কাছে অবহেলিত এবং উপেক্ষিত। এমন কি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকায়ও তিনি অচ্ছুত। অবশ্য যাদের উদারতা নামক শব্দটা থাকে মেকাপের আড়ালে তাদের আচরণে এটাই স্বাভাবিক। এদেশে যারা উদারতার ব্যবসা করেন তাদের কাছে এর কি জবাব জমা আছে? তবে অন্নদা শঙ্কর রায় এর একটা উত্তর দিয়েছিলেন সাহিত্য সম্মেলনের অনুষ্ঠানেই। তিনি তার দীর্ঘ ভাষণে ইনিয়ে বিনিয়ে অনেক কথাই বলেছিলেন। যার প্রতিটি শব্দেই ছিল একটা মুরুব্বী সুলভ আবহ। এ আবহটা কেমন ছিল তার কণ্ঠ থেকেই শোনা যাক—"কিন্তু ঢাকার সভামঞ্চে যা শোনা গেল তাতে সহযোগিতার চেয়ে প্রতিযোগিতার সুরটাই প্রকট। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সভাপতি ছিলেন দুইপারের প্রিয় কবি জসীম উদ্দীন সাহেব। অবিভক্ত বাংলায় নজরুলের পরেই ছিল তার আদর। তাই তার অভিভাষণে আমি প্রত্যাশা করিনি এমন উক্তি যে, 'পশ্চিমবঙ্গ হইতে বইপত্র আনিবার আগে ভারতের সাথে চুক্তি করিতে হইবে তারা যেন এপার হইতে সমমূল্যের বইপত্র ক্রয় করেন।' সোজা কথা জসীম উদ্দীন সাহেব চান প্যারিটি। সমান সমান। সভায় হাততালির বহর থেকে বোঝা গেল ওটা অনেকেরই মনের কথা।"

অন্নদা বাবুদের সব কথার মূল কথা হলো তারা আমাদেরকে সহযোগী হিসাবে পেতে চান, 'প্রতিযোগী' হিসাবে নয়। তিনি তার এ ধারণাটাকেই আরো একটু খোলাসা করে বলেছিলেন এভাবে, 'আমরা আরো খুশী হতুম যদি পশ্চিমবংগের সাহিত্যের জন্যে অন্তত একটা দিন বরাদ্দ থাকত। বাংলা সাহিত্য সম্মেলন বলে যার পরিচয় তার থেকে পশ্চিমবঙ্গ বাদ।' সহযোগিতা-প্রতিযোগিতার ব্যাখ্যা-উপব্যাখ্যা আছে। আছে তর্ক-বিতর্ক। দুই বাংলা যেমন দু'টি আলাদা দেশ, তেমন তাদের সাহিত্য আলাদা হবে সেটাইতো স্বাভাবিক। তাছাড়া দুই বাংলার সাহিত্য বাংলা

www.pathagar.com

সাহিত্য নামধেয় হলেও এ সাহিত্যের হৃদয়ে যে সুরের অনুরণন তার ধারা পুরাপুরিভাবেই ভিন্ন খাতে প্রভাহিত। কারণ মনের স্পর্শ যে ভিন্ন। আবার এ ভিন্নতারও একটা কারণ আছে। তা হলো বিশ্বাসের বিপরীতমুখিতা। এ সত্যটা অন্নদা শংকর বাবুরা ভালভাবেই উপলব্ধি করে আসছেন যুগ যুগ ধরে। যে জন্য নজরুল পাঠ্য তালিকার বাইরে থাকেন। বাংলা সাহিত্য সম্মেলনেও পশ্চিমবঙ্গের জন্য আলাদা অনুষ্ঠানের প্রয়োজন অনুভূত হয়।

এর পরেও অন্নদা শংকর বাবু সহযোগিতার কথা বলেছেন। এই সহযোগিতারস্বরূপটি আমাদের কাছে বড়ই পরিষ্কার। ধরা যায় ওয়ানওয়ে ট্রাফিক। তাই সহযোগিতার তত্ত্বটা অন্নদা বাবুদের কাছে মধুর। এই সহযোগিতার সিঁড়ি বেয়েই মুজতবা আলী আর মোস্তফা সিরাজদের মত লোকদের বাবু বানানোর তালিম চলে। তাদের এই সহজ তত্ত্বটা জসীম উদদীনের মনে সামান্য ঝিলিক দিলেও এ বিষয়ে আমরা অনেকেই এখনো অন্ধকারে। দুঃখ এই আমরা নবরূপী শ্রী চৈতন্যদের বুঝতে বারবারই ভুল করছি। আমরা জেনে বুঝেও ভুলে যাই রূপ-সনাতনের সেই কথা, 'তথাপি যবন জাতি না করি প্রতীতি।' 'যবনরা' যে রঙেডোবা শিয়ালের মতো বাবু সাজার কসরত করেও অন্নদা বাবুদের মনের সীমানা স্পর্শ করতে বরাবরই ব্যর্থ হয়েছেন, এ সরল সত্যটা বুঝার জন্য আমাদের আর কতকাল অপেক্ষা করতে হবে?

১. ৬. ৮২

www.pathagar.com

মানুষের সন্ধানে

আজকাল অনেকেরই খেদোক্তি মানুষ আর মানুষ নাই। মানুষ এখন মানব থেকে মানবেতর প্রাণীতে রূপান্তরিত হচ্ছে দিন দিন। তবে এর রূপান্তর অবয়বে নয়—স্বভাবে। এ কথাটা পারস্যের সুফী কবি সামসুদ্দীন তাব্‌রিজের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল কয়েক'শ বছর আগেই। তিনি ছিলেন জালালুদ্দীন রুমীর আধ্যাত্মিক গুরু। বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'দিওয়নে সামসে তাবরিজে'র স্রষ্টা। তিনি তাঁর একটি দীর্ঘ কবিতার এক জায়গায় লিখেছেন, "জনৈক বিজ্ঞ ব্যক্তি প্রদীপ হাতে সারা শহরময় ঘুরছিলেন। তাকে যখন কবি প্রশ্ন করলেন, 'আপনি এত রাতে কিসের তালাশ করছেন?' উত্তরে বিজ্ঞব্যক্তিটি বললেন, আমি মানুষের সন্ধানে ফিরছি। পশু আর শয়তানের ভারে আমি ক্লান্ত। আমার আরজু একজন মানুষ।" মূল ফারসীতে বাক্য কয়টি এ রকম—"দেখায় বা চেরাগে হামী গাশত গিরদে শহর/কায্ দেও ওদূদ মালু লাম ওয়া ইনসানাম আরযুসত।" হৃদয়ে লালিত আরো অনেক ভাবনাকেই কবি তাঁর এ কবিতায় ব্যক্ত করেছেন।

কয়েকদিন আগের একটা খবর। ভারতের বিহার রাজ্যে একত্রিশজন কয়েদীর চোখকে চিরতরে অন্ধ করে দেয়া হয়েছে। অন্ধকরণের প্রক্রিয়াটা নাকিছিল এ রকম—প্রথমে অপরাধীকে চিৎ করে শোয়ানা হয় ও তিন-চারজন তার মাথাটাকে জোর করে চেপে ধরে তার চোখের পাতা খুলে ধরে, তারপর অন্য আর এক ব্যক্তি একটা সুঁচালো সাইকেলের স্পোক দিয়ে অপরাধীর চোখের মনি খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ঘুলিয়ে দেয়। তারপর চোখের মধ্যে সালফিউরিক এসিড ঢেলে দেয়। এসিড ঢোকার পর সে ব্যক্তির চোখ দু'টি চিরতরে বন্ধ হয়ে যায় এবং এতে করে তার মুখমণ্ডলও পুড়ে যায়। খবরটার শিরোনাম ছিল 'নৃশংস'। অর্থাৎ অমানবিকতা। কোন্‌টা মানবিক আর কোন্‌টা অমানবিক এর পার্থক্য নির্ণয় এখন একটা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। 'এটম' কোটি কোটি মানব সন্তানের জীবন নাশের কারণ হলেও এটম নাকি মানব কল্যানেরই হাতিয়ার্‌ার এ তত্ত্ব কথার উপর ভিত্তি করেই দেশে দেশে 'এটম' চাষের হিড়িক। আফগানিস্তানে রাশিয়ার নিধনযজ্ঞও নাকি মানব কল্যাণেরই বহিঃপ্রকাশ। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের নামে চীনে লক্ষ লক্ষ লোককে হত্যা করা হয়েছিল। এ তথ্যটা সম্প্রতি চীনা নেতারাই প্রকাশ করেছেন। বিপ্লবের নামে কয়েক লক্ষ লোকের প্রাণনাশের নায়ক ছিলেন রাশিয়ার লেনিন। এসবগুলোই সমাধা করা হয়েছিল মানবতার আলখেল্লারই অভ্যন্তরে।

www.pathagar.com

সভ্যদেশ বলে কথিত বিলাতের একটি খবর ঃ রিপার নামক জনৈক ব্যক্তি গত পাঁচ বছরে তের জন মহিলাকে ধর্ষনের পর জবাই করে হত্যা করেছে। এ জাতীয় আরো অনেক খবরেরই উল্লেখ করা যায়—যা প্রতিদিন শিরোনাম হচ্ছে পৃথিবীর তাবত দৈনিক পত্রিকাগুলোর। বলা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী নীহার বানুর কথা, স্কুলছাত্রী নীরার কথা, জ্যোতিরানী, সালেহা, স্বপ্না, আরো কত নাম। সামান্য একটা সাজেশন বইকে কেন্দ্র করে এক স্কুল ছাত্র অপর এক স্কুল ছাত্রের বুকে ছুরি চালিয়েছিল। এ খবরও আমাদের অজানা নয়। কুকুরের মত পিটিয়ে মানুষ মারতে দেখেছি তিয়াত্তুর-চুয়াত্তুরে। এখানে লাশ উদ্ধার, ওখানে লাশ উদ্ধার। কোথাও মস্তকহীন, কোথাও মস্তকসহ। তাছাড়া স্ত্রী হত্যা তো এখন তুঙ্গে। কিন্তু এসব খবর এখন আর আমাদের চোখ বা হৃদয়কে পীড়িত করে না। বিবেকের তন্ত্রীতে তোলে না এতটুকু ঢেউ। এত গেল মুদ্রার এপিঠ। অন্যপিঠে কি আছে দেখা যাক।

প্রথমে 'নুড বীচ' প্রসঙ্গটাই তুলছি। 'নুড বীচ' তো এখন কথিত 'সভ্য দেশগুলো'র অঙ্গভুষণ। এমনি একটি 'নুড বীচ' আছে বৃটেনের ব্রাইটন শহরে। সেখানে নর-নারীরা জান্তব উল্লাসে উল্লসিত হন। তাদের ভাষায় যাকে বলা হয় জন্মদিনের পোশাকে সূর্যস্নান। ব্রাইটন নুড বীচের প্রবেশ পথে নাকি আছে একটি সাইন বোর্ড, যাতে লেখা আছে 'ক্লথ নিড নট বি অর্ন অন দিস বীচ।' আর একটা নীল পতাকা যাতে লেখা আছে ব্রাইটন নুড বীচ। যুগোশ্লাভিয়ায় আছে 'সামর নুড ভিলেজ।' দেশ-বিদেশের পর্যটকরাই এ গ্রামের অধিবাসী। তবে একটা নির্ধারিত সময়ের জন্য। এ গ্রামে প্রবেশের জন্য প্রয়োজন পড়ে প্রবেশ মূল্যের। যদিও সেটা খুবই সামান্য। নির্দিষ্ট কোন একটা স্থানে শরীরের সব পোশাকই জমা রাখতে হয়। এদেশেও দাবী উঠেছিল, কক্সবাজারের সাগর সৈকতের কোন একটি এলাকাকে 'নুড বীচ' ঘোষণা করার জন্য। বলা বাহুল্য, পৃথিবীর সব কটা 'নুড বীচে'র চেহরাই এক। শারীরিক নগ্নতার মাঝ দিয়ে মনের নগ্নতা প্রদর্শনই এর একমাত্র উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য-টুদ্দেশ্য যাই থাকুক, এটাকেই এখন আধুনিক জামানার মানুষ সভ্যতা-ভব্যতা বলেই ধরে নিয়েছে।

তারপর আসে বউ বদলের খেলা প্রসঙ্গ। বড় বড় শহরগুলোতে নাকি এ খেলাটা এখন জমজমাট। একটা বিদেশী মাসিকে সন্ধান পেয়েছিলাম এ জাতীয় কিছু ক্লাবের। সে মাসিক-এ খেলাটার নিয়ম-কানুনের কথা থাকলেও এর উল্লেখ থেকে বিরত থাকলাম। এমন আরো অনেক ঘটনারই হাওলা দেয়া যায় যেখানে পশু আর মানুষ এক দেহে লীন। যেমন ইটালীর এক দম্পতি জনবহুল বাস স্ট্যান্ডেই মৈথুন ক্রিয়ায় রত হয়েছিল যেমনটা আমরা প্রত্যক্ষ করি কুকুর-কুকুরীর মাঝে। কিন্তু কেন মানুষের স্বভাবের এই রূপান্তর?

বিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী লুইস হেনরী মর্গান বলেছেন, মানুষ যখন জঙ্গল জীবন থেকে সভ্যজগতে প্রবেশ করছিল, সভ্যতার প্রতিটি সোপানই তাকে পার হয়ে আসতে হয়েছিল। অর্থাৎ সভ্যতার সবকটা গুণাবলীই মানুষকে আত্মস্থ করতে হয়েছিল, এখন যেন সেই জঙ্গল জীবনে ফিরে যাবার জন্য প্রাণান্তকর প্রচেষ্টায় রত। বর্বর যুগে ফিরে

www.pathagar.com

যাবার জন্য মানুষ এখন বর্বরতার সব কটা ধাপই একে একে ভেঙে চলেছে। পশুর সব স্বভাবকেই যেন মানুষ আত্মস্থ করে নিচ্ছে প্রতিমুহূর্তে। মানবিক মূল্যবোধগুলোর দেয়াল ধসে পড়ছে একে একে। কিন্তু কেন? এক কথায় হয়তো এ প্রশ্নের উত্তর অসম্ভব। অনেকে মানুষের দারিদ্র্যতার কথা, অর্থনীতির কথা তুলতে পারেন এবং এগুলোকেই এর কারণ হিসাবে খাড়া করতে চাইবেন। তবে এটা ঠিক যে, এর মূল শিকড় এখানেই প্রোথিত নয়। আরো গভীরে।

তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে নয়, সহজ এবং সরল ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয়, যখন থেকে মানুষ ধর্মীয় শিক্ষা থেকে নিজকে বিমুক্ত করেছে তখন থেকেই তার অধঃপতনের শুরু। আজকাল 'মানবতাবাদের' আন্দোলন হচ্ছে কিন্তু এতে করে কি শেষ রক্ষা হবে? না সামসুদ্দিন তাব্‌রিজের সেই বিজ্ঞব্যক্তির মত চেরাগ হাতে শুধু মানুষের সন্ধানই করে যাব আমরা?

৬. ১২. ৮০

www.pathagar.com

'সে সব কাহার জন্য...'

১. ঢাকা-কলকাতা সরাসরি বাস চলবে এ খবরে অনেকেই পুলকিত। যারা লিখতে টিখতে জানেন তাদের কেউ কেউ পত্র-পত্রিকায় লিখে সে পুলকের বহিঃপ্রকাশ ঘটাচ্ছেন এন্তার। যারা লিখতে জানে না তাদের দু'একজন আবার উল্লাস প্রকাশ করছেন আড্ডায়-সভা-সমিতিতে। এই পথের প্রথম যাত্রী হবার খায়েশও প্রকাশ করছেন কেউ। সব মিলিয়ে মনে হচ্ছে এ যেন এক মহামিলনের রাখিবন্ধনের উৎসব হতে যচ্ছে। অবশ্য এ কথা সত্যি যে, আমাদের পূর্ব পুরুষদের অনেক স্মৃতিই ধারণ করে আছে এই কলকাতা শহর। ঢাকা-কলকাতা বাস সার্ভিস তাদের পুরোনো দিনের স্মৃতিকে জাগরুক করতে পারে হয়তো। কারণ তারা সে শহরের উন্নতি-অগ্রগতির জন্য জীবনপাত করেছেন। তাই টান থাকাটা স্বাভাবিক। কিন্তু উত্তর পঞ্চাশের পরবর্তী প্রজন্মের কাছে কলকাতার প্রতি এমন মাত্রাতিরিক্ত আকর্ষণ স্বাভাবিক না ঠেকারই কথা। তাদের কাছে তো কলকাতা যেমন রেঙ্গুন-থাইল্যান্ডও তেমনি এক ভিনদেশী শহর। রেঙ্গুন শহরের সাথেও এদেশের মানুষের পরিচয়ের ব্যাপ্তিটা বড় একটা কম ছিল না। যাতায়াত ছিল, কায়কারবার ছিল। চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগে কলকাতার মত রেঙ্গুনের গাল-গল্পও শোনা যেত এ দেশের প্রায় ঘরেই। দু'একজন অতি উৎসাহী ব্যক্তি বাদে এ দেশের আমমানুষের কাছে তো রেঙ্গুনও যা কলকাতাও তারচেয়ে অতিরিক্ত কিছু না। কলকাতার সাথে ভাষার একটা সাজুয্য আছে, এই যা। তাছাড়া তো সবই বেমিল। দেশ-সংস্কৃতি-বিশ্বাস সবইতো আলাদা। অন্য রকম।

প্রতিবেশীর সাথে সৌহার্দ্য সম্প্রীতি আসাযাওয়া থাকবে সে তো ভাল লক্ষণ। অবশ্য এ জন্য প্রয়োজন সততা আর বিশ্বাস। কিন্তু মুশকিল হলো প্রতিবেশীর বিশ্বাস ভংগের তালিকাটি এতটাই দীর্ঘ যে, এ দেশের মানুষ তাদের প্রেমপ্রীতিতে আর আস্থা রাখতে পারছে না। তাই ঢাকা-কলকাতা বাস যোগাযোগে দ্বিধান্বিত, শংকিত। এই শংকা আর দ্বিধাকে কেউ কেউ ধর্ম-অধর্ম, সাম্প্রদায়িকতা, মৌলবাদ ইত্যাকার অভিধায় চিহ্নিত করতে ব্যস্ত। বাস যোগাযোগের সাথে ধর্ম-অধর্মের তো সম্পর্ক নেই। সম্পর্ক স্বার্থের, অর্থ-অনর্থের। তবু এই যাওয়া আসার মধ্যেও কতিপয় ব্যক্তি ধর্ম-মৌলবাদের গন্ধ খুঁজছেন। যা কিনা একেবারেই অবান্তর। এই অবান্তর বিষয় নিয়ে কারো কারো ভাবান্তর 'কিন্তু'র জন্ম দেয় বৈকি। প্রশ্ন উঠতো না, প্রশ্ন উঠছে এ কারণে যে, কলকাতার জন্য বেচইন জনাকতক চিহ্নিত মানুষ প্রচার করছেন দেশ বিভাগটা নাকি ছিল 'ইতিহাসের তৈরী পাপ' ক'দিন আগে পত্রিকায় প্রকাশিত একটি লেখায়ও এমন

www.pathagar.com

উক্তির সরব প্রকাশ দেখলাম। এই 'পাপের' সৃষ্টি না হলে হয়তো কলকাতার দেবী দর্শনে এত ঝুট-ঝামেলা পোহাতে হতো না। ভাবনাহীন কলকাতা যাওয়া-আসা যেতো। অজন্তা-খাজুরাহুতে গতায়াত হতো অবাধ। সবই হয়তো ঠিক কিন্তু পুরস্কারের নামে লাখ টাকার আনন্দবাজারী ঘুষের পথ যে রুদ্ধ থাকতো আজীবন। তাছাড়া এই বাড়তি কদর মাসিক সেলারীর সিস্টেম এসবের সৃষ্টি হতো কিভাবে। তাদের কথিত পাপ তো আসলে আশির্বাদেরই শামিল বলতে গেলে। বর্তমানের এই স্বাধীন বাংলাদেশ সেতো সেই ইতিহাসেরই অংশ। উপমহাদেশ বিভাজনের সময় যে সীমানা ছিল এখনো তাই আছে। তাহলে তারা কি বলতে চান এই সীমারেখাটাই পাপের চিহ্ন বহন করে আসছে?

ঢাকা থেকে বাস আজমীরে যাবে না আগ্রায় যাবে সে বিষয়ে কোন প্রশ্ন থাকার কথা নয়। প্রশ্ন হলো এই চলাচলের ধরন নিয়ে। প্রশ্নটা এ জন্য যে ইতিহাসের 'পাপেই' হোক আর 'আশির্বাদেই' হোক বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ। তাই আন্তঃদেশীয় চলাচলে একটা নিয়ম-রীতি তো অবশ্যই মানা উচিত। সেই নিয়ম রীতিটা কী? জনগণ এ ব্যাপারে একেবারেই বেওয়াকেফ। ভয় আর শংকাটা এ কারণেই। যে জনাক'জন কলকাতায় পা রাখার জন্য ব্যস্তসমস্ত হয়ে আছেন তারা প্রায়শই উদাহরণ টানেন ইউরোপীয় দেশগুলোর। সে দেশসমূহে নাকি অবাধ যাতায়াতের ব্যবস্থা আছে। এক দেশের রেল যাচ্ছে অন্য দেশে, বাস-ট্যাক্সি সীমান্ত পার হচ্ছে নির্ভবনায়। কি সুন্দর আন্তঃদেশীয় ব্যবস্থা। সেখানে তো ভয় নেই, শংকা নেই। বিরোধ নেই, বিভেধ নেই। আসলেই চমৎকার ব্যবস্থা। সৌহার্দ্য-সম্প্রীতিরও সুন্দর উপমা। লন্ডনের গাড়ী ফ্রান্স যাচ্ছে, জার্মান যাচ্ছে। এখন দেখা যাক কিভাবে যাচ্ছে। লন্ডন থেকে যখন গাড়ী সুড়ঙ পথে প্যারিস যায় তখন ফ্রান্স সীমান্তে পৌঁছামাত্র সে গাড়ীর সমস্ত ম্যাকানিজম ফ্রান্স কর্তৃপক্ষ বুঝে নেয়। অর্থাৎ গাড়ীর সব বৃটিশ কর্মচারী বদলে গিয়ে তা ফ্রান্সের ড্রাইভার-কর্মচারীরা গাড়ীটির দায়িত্ব গ্রহণ করে। রেলগাড়ী তখন ফ্রান্সের সর্বভৌমত্বের অধীন। একই নিয়মে জার্মান সীমান্ত অতিক্রমের পর গাড়ীর মালিক তখন জার্মান, জার্মান সরকার তথা জনগণ। আমিত্ব বজায় রেখেই ইউরোপীয় দেশগুলোর ট্রানজিট ব্যবস্থা। ঢাকা-কলকাতার বাস কি এভাবে চলবে? এমন হলে তো আপত্তির কারণ থাকার কথা নয়। আর তা না হলে তো আপত্তি উঠতেই পারে। কিন্তু এই আপত্তিতে যদি কারো কারো বিপত্তি দেখা দেয় তাহলে তো করার আর কিছু থাকছে না।

২

বাংলাদেশের অংশ বেরুবাড়ী তুলে দেয়া হয়েছে ভারতের হাতে। এই অর্পণের পরিবর্তে হারানোর বেদনা ব্যতিরেকে অন্য আর কিছু জোটেনি বাংলাদেশের জনগণের কপালে। তখনো শান্তির স্বপ্নই দেখানো হয়েছিল। হুমকি-ধমকিও পাশাপাশি চলেছে সদর্পে। বর্তমানের আবহাওয়াটাও যেন কতকটা সে রকমেরই। শান্তি আসবে, শান্তি আসছে। সেই লক্ষ্যেই নাকি বর্তমান সরকার তথাকথিত শান্তিবাহিনী প্রধানের সাথে

www.pathagar.com

চুক্তি করতে যাচ্ছে। যে চুক্তির নামকরণ করা হয়েছে 'শান্তিচুক্তি'। যদিও দেশের সচেতন এবং বিজ্ঞ মানুষেরা বলছেন আসলে এ চুক্তি হচ্ছে বাংলাদেশের একটি অংশে চিরস্থায়ী অশান্তির বীজ বপন করা। নিজের বাড়ী অন্যের হাতে তুলে দেয়া। অপরদিকে ভারত তথা সরকারপন্থি পত্রিকা আর বুদ্ধিজীবীরা তারস্বরে চিৎকার করে বলছে সরকারের এ আয়োজনে তারা নাকি 'শান্তির সুবর্ণরেখা' দেখতে পাচ্ছে। ভালো কথা, শান্তি কে না চায়। তাহলে আসুন দেখা যাক তাদের শান্তির সুবর্ণরেখাটা কি রঙের। ভারত তথা সরকারপন্থী পত্রিকার গত দশ তারিখের একটি খবরের শিরোনাম ছিল 'এম এন লারমা স্মরণে শোকার্ত পাহাড়ী জনপদ'। লারমার ছবি সমেত পৌনে এক কলামব্যাপী এ খবরটি পাঠ করে বুঝা মুশকিল হবে এটি কোন দেশের মুখপত্র। খবরের শুরুটা হয়েছে এভাবে 'এম এন লারমা। পুরো নাম মানবেন্দ্র লারমা। অবিসংবাদিত পাহাড়ী নেতা। ১৯৮৩-এর ১০ই নভেম্বর এই দিন হন্তা কেড়েছে তার প্রাণ কিন্তু বসিয়েছে তাকে যুদ্ধ দেবতার সিংহাসনে। আজো তার কিংবদন্তীতুল্য জনপ্রিয়তা ম্লান হয়নি এতটুকু। জুম্ম (পাহাড়ী) জাতীয়তাবাদের অগ্রনায়ক জনসংহতি ও সশস্ত্র শান্তিবাহিনীর প্রতিষ্ঠাতা এম এন লারমা স্মরণে তাই শোকার্ত হয় পাহাড়ী জনপদ। এরপর লারমার শৌর্যবীর্য আর মেধা-মননের উচ্ছ্বাসপূর্ণ প্রশংসার পর লেখা হচ্ছে 'রাঙ্গামাটি জনসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমানের উগ্র জাতীয়তাবাদী বক্তব্যের কারণে পাহাড়ী জাতিসত্তার অস্তিত্ব রক্ষায় এম এন লারমা ১৯৭৪ সালে জনসংহতির একটি সশস্ত্র গ্রুপ গঠন করেন। এই গ্রুপটিই পরে শান্তিবাহিনী হিসেবে পরিচিতি পায়। এম এন লারমা চেয়েছিলেন সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে জুমল্যান্ড (স্বাধীন পার্বত্য চট্টগ্রাম) প্রতিষ্ঠা করতে।' তারপর আছে শান্তিবাহিনীর অন্তর্দ্বন্দ্বের বয়ান, প্রীতি গ্রুপের হাতে ভারতের ইমারা গ্রামের বাশামার স্থানের শান্তিবাহিনীর কল্যাণপুর ক্যাম্পে লারমার নিহত হবার খবর। সব শেষে লেখা হয়েছে 'প্রতিবছরের মতো এবারও জনসংহতি শ্রদ্ধাবনতচিত্তে স্মরণ করবে তাকে। পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রভাবশালী পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, পাহাড়ী গণপরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন তার স্মরণে তিন পার্বত্য জেলায় একই সঙ্গে মহাশেক কর্মসূচী পালন করবে।

এই উদ্ধৃতিগুলো পাঠ করার পর সচেতন পাঠককূল হয়তো অনুমান করতে পারছেন, প্রচারিত শান্তির সুবর্ণ রেখার রংটা কেমন হতে পারে। উল্লেখ্য যে, সরকার যার সাথে চুক্তি করতে যাচ্ছে সেই শান্তু লারমা স্বাধীন পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রতিষ্ঠার তথাকথিত নেতা এম এন লারমারই ছোট ভাই।

৩

লারমা সংক্রান্ত প্রতিবেদনটি প্রতিবেদক বিপ্লব রহমান এবং আজকের কাগজ কর্তৃপক্ষ তাদের হৃদয় নিংড়ানো শব্দ দিয় যেভাবে সাজিয়েছেন তাতে করে মনে হচ্ছে, লারমার জন্য পাহাড়ী জনপদই কেবল নয়, প্রতিবেদক এবং পত্রিকা কর্তৃপক্ষকেও স্বজন হারানোর এক মহাশন্তাপ গ্রাস করেছে। তারাও শোক শন্তাপে মুহ্যমান প্রায়। কথায় বলে, 'লেজ দেখে যায় চেনা'। বলাবাহুল্য লারমা তথা শান্তিবাহিনী বিষয়ক

www.pathagar.com

খবরটি যেকোনো বিচারে স্বাধীনতা এবং রাষ্ট্রদ্রোহিতার শামিল। প্রতিবেদনটির ভাব-ভাষা আর প্রকাশের ভঙ্গি এ সত্যকেই প্রমাণ করে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, সরকার এ ব্যাপারে একেবারেই নির্বিকার। তাই সরকারের এই ধরনের শীতলতা পার্বত্য চট্টগ্রামের কথিত শান্তি চুক্তির ব্যাপারে দেশপ্রেমিক জনগণকে সন্দিহান করে তোলাটা স্বাভাবিক।

৪

খবরটি পাঠের পর যেমন বুঝা যায় না পত্রিকাটি কোথাকার, ঠিক তেমনি প্রতিবেদকের পরিচয় নিয়েও সন্দেহের অবকাশ রয়ে যায়। অবশ্য বিভীষণরা সব দেশেই থাকে। নিজ দেশের আলো-হাওয়ায় বড় হয়ে অন্য দেশের এজেন্ট রূপে কাজ করে। এমন বিভীষণদের উদ্দেশ্যেই মধ্যযুগের এক কবি বলেছিলেন, 'সেসব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি।'

২৫. ১১. ৯৭

www.pathagar.com

'সেই বেশী চায় আছে যার ভুরি ভুরি'

রবি ঠাকুরের কথা দিয়েই শুরু করছি। তিনি বলেছেন 'এ জগতে হায় সেই বেশী চায় / আছে যার ভুরি ভুরি / রাজার হস্ত, করে সমস্ত কাঙ্গালের ধন চুরি।'

সম্প্রতি ঠিক এ কথাটাই প্রতিধ্বনিত হয় ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনারের কণ্ঠে। তফাৎটা কেবল প্রকাশ ভঙ্গির। রবি ঠাকুর যা প্রকাশ করেছেন কবিতায়—মাননীয় পুলিশ কমিশনার তা প্রকাশ করেছেন গদ্যে। পুলিশ কমিশনারের ভাষ্য এ রকম, "অপরাধীদের মধ্যে এখন নতুন মুখ এসেছে। জঘন্য অপরাধীদের অধিকাংশই তরুণ, শিক্ষিত এবং অবস্থাসম্পন্ন ঘরের সন্তান।' এখানে কেবল একটা শব্দের আধিক্য ঘটেছে আর সে শব্দটা হলো 'শিক্ষিত'। রবি ঠাকুরের কবিতার জমিদার, যিনি বেচারা উপেনের দুই বিঘা জমি আত্মসাৎ করেছিলেন মিথ্যা দেনার অজুহাত দেখিয়ে, সে জমিদার অশিক্ষিত ছিলেন এমন কথা অবশ্য কবি তার কবিতায় কোথাও উল্লেখ করেননি। তাহলে আমরা ধরে নিতে পারি তিনিও শিক্ষিত জনের প্রতিই ইংগিত করেছেন।

জ্ঞানীগুণীদের মতে শিক্ষা নাকি মানুষকে সভ্য করে। সংস্কার মুক্ত করে। মস্তিষ্কে জমা করে ভাল মন্দকে বিচার করার দুর্লভ জ্ঞান। করে পরিশীলিত এবং পরিমার্জিত। পুলিশ কমিশনার বলেছেন ঠিক তার উলটো কথা। জঘন্য অপরাধীদের অর্থাৎ ডাকাতি, ছিনতাই এমনকি খুনের সাথে জড়িত অধিকাংশই নাকি শিক্ষিত। ধরে নিলাম পুলিশ কমিশনার অসত্য বলেছেন। আমরা চাইও সেটা মিথ্যা হোক।

কিন্তু যখন দেখি শহীদ মিনার থেকে যারা ছাত্রী অপহরণ এবং তাদের শ্লীলতাহানি করেছিলেন তারা সবাই শিক্ষিত। যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে দশজন ছাত্রকে নৃশংসভাবে খুন করেছিলেন তারাও ছিলেন শিক্ষিত। ব্যাংক ডাকাতিতে বিভিন্ন সময় যারা ধরা পড়েছিলেন তারাও শিক্ষিত। যারা ছিনতাই করতে গিয়ে গণপিটুনিতে প্রাণ হারিয়েছিল এবং এখনো পাকড়াও হচ্ছে তাদের অধিকাংশই শিক্ষিত। খবরের কাগজগুলোতে যেসব খুনের খবর ছাপা হয় এর একটা উল্লেখযোগ্য সংখ্যাই শিক্ষিত খুনি এবং খুনকৃত ব্যক্তি উভয়ই। নীহার বানুকে যারা খুন করেছিল তারা কি অশিক্ষিত ছিল? সালেহাকে যিনি খুন করেছিলেন তিনি কি শিক্ষিত নন? যারা প্রায়শই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে, হলগুলোতে অস্ত্রের খেলা দেখান, প্রাণ সংহার করেন তারাও তো শিক্ষিত। যে সব ব্যক্তি ফাইল আটকিয়ে ঘুষ গ্রহণ করেন, কোন স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের কর্তাব্যক্তি তহবিল তসরুফের দায়ে অভিযুক্ত হন তারা তো সবাই শিক্ষিত-জনদের সারিতেই।

www.pathagar.com

এই যদি অবস্থা হয় আমাদের শিক্ষিত জনদের তাহলে পুলিশ কমিশনারের কথা মিথ্যা প্রমাণের পথ কোথায়। যে থানার অফিসার ঘুষ খেয়ে দাগী ডাকাতকে খালাস করে দেন আর একজন নিরপরাধ ব্যক্তিকে বেহুদা জেলে পুরেন তিনি কি লেখাপড়া করেননি? তিনিও তো স্কুলে পড়েছেন, কলেজে পড়েছেন, অনেকে আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষায়ও শিক্ষিত। কিন্তু কেন এমন হচ্ছে? শিক্ষিত-জনরা অপরাধ করছেন, খুন করছেন, ডাকাতি করছেন, নারী অপহরণের সাথেও তারা জড়িত হয়ে পড়ছেন।

শিক্ষিত তরুণদের এ চারিত্রিক অবমূল্যায়নে, তাদের নৈতিক অবক্ষয়ে অনেকে শংকিত এবং আতংকিত। কারণ এ শিক্ষিত তরুণ সমাজই জাতির ভবিষ্যৎ। আর ভবিষ্যতের বীজ যদি এভাবে অঙ্কুরেই বিনষ্ট হতে থাকে তবে সেখানে কি করে ফলফুলে শোভিত বৃক্ষের আশা রকা যায়। শিক্ষিত তরুণদের এ উচ্ছৃংখলতা এবং অপরাধপ্রবণতার দিকে ঝুঁকে যাবার কারণ হিসাবে নানা মুনির নানা মত। কেউ এজন্য ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থাকেই দায়ী করেন। তাদের মতে এ শিক্ষা তরুণদের নৈতিক চরিত্র উন্নত করার পরিবর্তে ধ্বংস করেছে, মনুষ্যত্বের পরিবর্তে পশুত্বকে জাগ্রত করছে। আবার কারো মতে অশ্লীল সাহিত্য কুরুচিপূর্ণ এবং ধুম ধারাক্কা মার্কা চলচ্চিত্র আমাদের শিক্ষিত তরুণ সমাজের মন-মানসিকতার বিকৃতি ঘটাচ্ছে। আবার কেউ কেউ মনে করেন রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং স্বার্থান্বেষী রাজনৈতিক নেতাদের ভ্রান্ত নীতির কারণে আমাদের শিক্ষিত তরুণ সমাজ বিপথগামী হচ্ছে, তারা তাদের অজান্তেই জড়িয়ে পড়ছে বিভিন্ন অপরাধমূলক ক্রিয়াকাণ্ডে। হয়তো এর পেছনে সব কয়টা কারণই ক্রিয়াশীল। কিন্তু এ মারাত্মক ব্যাধি নিরাময়ের উপায় কি? পুলিশের সংখ্যা বৃদ্ধি বা উন্নত অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবস্থা করলেই কি কার্যসিদ্ধি হবে? শিক্ষিত তরুণরা কি সাধু হয়ে যাবে? শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন, অশ্লীল সাহিত্য, কুরুচিপূর্ণ চলচ্চিত্র বন্ধ করে কি শেষ রক্ষা করা যাবে? যে ঘরের সবগুলো খুঁটিতে ঘুনে ধরে ভিতর থেকে ঝাঁঝরা করে ফেলে সে ঘরকে ঠেস দিয়ে কি এর পতন বেশী দিন ঠেকিয়ে রাখা যায়? কেবল শিক্ষিত তরুন সমাজ কেন গোটা সমাজের অবস্থাটাই তো এরকম নড়বড়ে। একটা ঘুনেধরা ঘরকে কেবল ঠেক দিয়ে রক্ষা করা যায় না। তাকে নতুন করে তৈরি করতে হয়। তেমনি আমাদের শিক্ষিত তরুণ সমাজের নৈতিক এবং চারিত্রিক দিকগুলোকে উন্নত করতে হলে তাদেরকে সুনাগরিক হিসাবে গড়তে হলে প্রয়োজন সামাজিক কাঠামোর আমূল পরিবর্তন। কেবলমাত্র শিক্ষা ব্যবস্থার বা অন্য কিছু পরিবর্তন করে কোন সুফল আশা করলে একে দুরাশাই বলবো। শিক্ষিত অশিক্ষিত সবার মাঝেই বর্তমানে যে নৈতিক অবস্থা এবং মানসিক অস্থিরতা বিরাজমান প্রচলিত সমাজ কাঠামোতে এ ব্যাধির নিরাময় সম্ভব না।

তাই প্রয়োজন একটা নতুন সমাজ ব্যবস্থার যে সমাজ স্বাভাবিক এবং মঙ্গল প্রবণতার সাথে সামঞ্জস্যশীল এবং যা সংকীর্ণ-দৃষ্টি মানুষের সৃষ্টি নয়। তা না হলে রবি ঠাকুরের ভাষায় আবার বলতে হয, "রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙ্গালের ধন চুরি।"

১৪. ৭. ৮০

www.pathagar.com

'নারঙ্গী বনে কাঁপছে সবুজ পাতা'

সম্ভবতঃ মৃত্যুর মাস তিনেক আগে তার সাথে আমার শেষ সাক্ষাৎ। অনেকগুলো মূল্যবান সময় তিনি আমার জন্য ব্যয় করেছিলেন। বলাবাহুল্য, এ সাক্ষাৎ ইসকাটন গার্ডেনের বাসায় নয়, বায়তুল মোকাররমের উন্মুক্ত উঠানে। খোলা আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই তিনি আমার সাথে কথা বলেছিলেন একান্ত আপনজনের মতো। একজন বন্ধুর মতো। বয়স বা খ্যাতির দূরত্ব কোন বাধার দেয়াল রচনা করতে পারেনি। সেদিন অনেক কথা হয়েছিল। সাহিত্য থেকে শুরু করে এর বিস্তৃতি ব্যক্তিগত খোঁজ-খবর পর্যন্ত গিয়ে ঠেকেছিল। তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম কবিতার কথা। অর্থাৎ নতুন কোন কিছু লেখার চিন্তা-ভাবনা করছেন কিনা। একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বলেছিলেন, 'আমিতো অনেক লিখলাম, এখন তোমাদের সময়। তোমরা নতুন কিছু লিখ। আমার তখন মনে হয়েছিল দীর্ঘ সমুদ্র যাত্রার পর ক্লান্ত-শ্রান্ত একজন মাঝি আমার সাথে কথা বলছেন। তার বড় বড় দু'টি চোখের ঔজ্জ্বল্য তখনো সূর্যের মতো। কিন্তু তখন ভাবিনি তিনি চলে যাবেন এত সকালে। এ ভাবনাটি একবারও নাড়া দেয়নি আমার অনুভূতিকে। সম্ভবতঃ আরো অনেককে। সময় ফুরিয়ে এল—কবি চলে গেলেন। তাঁর চলে যাওয়া পথে বহুক্ষণ তাকিয়েছিলাম সে দিন। তিনি ধীরে ধীরে হাঁটছেন; বাতাস তাঁর লম্বা চুলকে আন্দোলিত করছে। সাতষট্টিতে কবির সাথে আমার প্রথম পরিচয়। প্রথম পরিচয়েই তিনি আমাকে আপন করে নিয়েছিলেন। তারপর বহুবার কবির বাসায় গিয়েছি। তাঁর দরাজ গলায় আবৃতি শুনেছি। চা বিস্কুট খেয়েছি। সাহিত্য আলোচনা করেছি। তাঁর উদার হৃদয় বারবার আকর্ষণ করেছে আমাকে। কেবল আমার সাথেই নয় সবার সাথেই ছিল তাঁর এ ব্যবহার। তাঁর ছিল একটা শিল্পীত হৃদয়। যে হৃদয় মুহূর্তে আপন করে নিত সবাইকে বয়স বা খ্যাতির বাধা ডিঙ্গিয়ে। ফররুখ ভাইয়ের কথা মনে হলে এমনি আরো অনেক ঘটনা মনকে আলোড়িত করে। খ্যাতির তুঙ্গে যার ছিল অবস্থান যার হৃদয়ের বিস্তার ছিল আকাশের মতো সে মহান ব্যক্তিটিকে আমরা মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছিলাম। কবি বেনজীরের ভাষায় বলা যায়, 'ফররুখ মরেনি আমরা তাঁকে মেরেছি।' তাঁর প্রাপ্য সম্মান আমরা তাঁকে দিতে পারিনি। সমগ্র বাংলা সাহিত্যে যার উপস্থিতি একটি উজ্জ্বল তারকার মত সে কবি রেডিওর সামান্য একজন স্ক্রিপট রাইটার হিসেবে কাজ করতেন। আমৃত্যু এ সামান্য চাকুরীটিই ছিল আয়ের একমাত্র পথ। তারপরও এসেছে নানা বাধা-বিপত্তি। সাহিত্য মহলে তাকে একঘরে করে রাখার চলেছে ষড়যন্ত্র। স্বাধীনতার পর নয় মাস চাকুরীতে

www.pathagar.com

যোগ দিতে দেয়া হয়নি তাঁকে। এসব মানসিক পীড়ন তাকে দুর্বল করে দিয়েছিল জীবনের শেষ সময়গুলোতে। একপ্রকার অনাহার আর অচিকিৎসায় কবি তার জীবনকে সঁপে দিয়েছিলেন মৃত্যুর করতলে।

বাহাত্তুর সালের কথা। ফেব্রুয়ারীতে একটি সংকলন প্রকাশ করেছিলাম। সংকলনটি আমার এক লিখিয়ে বন্ধুকে প্রেজেন্ট করে ছিলাম। সে বন্ধুটি সংকলনটির লেখার মানগত উৎকর্ষ এবং গেটাপ মেকাপের উচ্ছসিত প্রশংসা করেছিল। কিন্তু হঠাৎ করে সে লিখিয়ে বন্ধুটি চেচিয়ে উঠে বলেছিল "ফররুখ আহমদের উদ্ধৃতি দিয়েছ–সংকলনের মানটাই নষ্ট করে দিলে।" আমি অবশ্য তাঁর কথার বিশেষ কোন প্রতিবাদ করিনি। শুধু বলেছিলাম ফররুখ আহমদ একজনমহান কবি। কারণ সে সময়টা ছিল দুঃসময়। তর্ক করার সময় ছিল না। বলা বাহুল্য ফররুখ আহমদের "রাষ্ট্র ভাষা বাংলা ভাষা খোদার সেরা দান। বিশ্ব সভার সভায় তোমার রূপ যে অনির্বান।" এ লাইন কয়টির উদ্ধৃতি ছিল সংকলনটির পেছন দিকে। ষড়যন্ত্রকারীদের মন-মানসিকতা ফররুখ আহমদ সম্পর্কে বরাবরই ছিল এরকম। যারা সব সময় ফররুখ আহমদের খ্যাতিকে তাঁর প্রতিভাকে ঈর্ষার চোখে দেখত। এর কিছু কারণও ছিল। ফররুখ আহমদের প্রতিভার দিপ্তী তাদের চোখকে ঝলসে দিত। তাঁর সাহিত্য কর্মের পাশাপাশি অবস্থান করা ছিল ষড়যন্ত্রকারীদের পক্ষে এক প্রকার অসম্ভব। তাছাড়া ফররুখ আহমদের ছিল এক অবিনাশী আদর্শ। যে আদর্শে তিনি ছিলেন অবিচল। এজন্যই তারা কবি ফররুখ আহমদের সাহিত্য কর্মকে সাম্প্রদায়িক সাহিত্য হিসেবে চিহ্নিত করার অপপ্রয়াস চালিয়েছিল। অদ্যাবধি তারা এ বিষয়ে সক্রিয়।

ফররুখ আহমদের মৃত্যুর পর ছয় বছর অতিক্রান্ত হল। তাছাড়া আগামীকাল কবির তেষট্টিতম জন্মবার্ষিকী পালিত হতে যাচ্ছে। ফররুখ ভক্তরা তাঁর জন্মবার্ষিকী পালন করবেন জানি। একথাও জানি, এ সভার চেহারাও হবে কবির মতোই দীনহীন। অনেকেই অনেক বড় বড় কথা বলবেন, তাঁর সাহিত্য কর্মের তাঁর আদর্শের প্রশংসায় গদগদ হবেন। এ পর্যন্ত শেষ। তারপর 'যথা পূর্বং তথা পরং'। সকল শ্রেণীর পাঠ্য বইগুলো থেকে ফররুখ আহমদের কবিতাকে তুলে দেয়ার ষড়যন্ত্রও থাকবে অব্যাহত। এভাবে দেখা যাবে সকল পাঠ্য পুস্তক থেকেই নির্বাসিত হয়েছেন ফররুখ আহমদ। ফররুখ ভক্তরা কি সোচ্চার হয়েছেন কোন দিন? প্রতিবাদ মুখর হয়েছেন এসব ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে। যে রেডিওতে তিনি আমৃত্যু কর্মরত ছিলেন সে রেডিওতেই তাঁর গান প্রচার এক প্রকার নিষিদ্ধ। তাঁর একটা গান, তোরা চাসনে কিছু কারো কাছে খোদার মদদ ছাড়া। 'তোরা পরের উপর ভরসা ছেড়ে নিজের পায়ে দাড়া।' এ গানটি উদ্বোধনী সঙ্গীত হিসেবে ছোটদের আসরে বাজানো হতো। কিন্তু স্বাধীনতার পর পর রেডিও কর্তৃপক্ষ এ গানটির প্রচার বন্ধ করে দিলেন। জানিনা এ গানটিতে কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশ বিরোধী এমন কি শব্দ আবিষ্কার করলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অন্যান্য নিরপেক্ষ গানগুলোও কর্তৃপক্ষের শ্যেন দৃষ্টিতে পড়ল। ফররুখ ভক্তরা কি এ বিষয়গুলো লক্ষ্য করেছেন? এক সভায় বাংলা একাডেমীর কাছে দাবী জানানো হয়েছিল কবির অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপিগুলো প্রকাশ করার। কিন্তু অদ্যাবধি কোন সাড়াশব্দ নেই। কবির

www.pathagar.com

মহাকাব্য 'হাতেমতায়ী' বইটি বাংলা একাডেমী প্রকাশ করেছিল। বেশ কয়েক বছর পূর্বেই এই বইটির কপি নিঃশেষিত হয়েছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত এ মূল্যবান বইটির পুনঃমুদ্রণের কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি। তবে কি এ বইটিও ষড়যন্ত্রকারিদের ষড়যন্ত্রের শিকার। ষড়যন্ত্রের জাল কি এতটাই বিস্তৃত? এ ষড়যন্ত্র কার বিরুদ্ধে? ফররুখ আহমদের বিরুদ্ধে না ফররুখ আহমদের অবিনাশী আদর্শের বিরুদ্ধে? আমার মনে হয়, ষড়যন্ত্রকারীদের সকল আক্রোশ তাঁর আদর্শের বিরুদ্ধে। কবির আদর্শই তাদের একমাত্র গাত্রদাহের কারণ। ফররুখ ভক্তদের জন্য আরো একটি দুঃসংবাদ। শোনা যাচ্ছে শহরের বিভিন্ন পাঠাগারগুলো থেকে কবির বইগুলো নাকি উধাও হয়ে যাচ্ছে। পাঠাগারের ক্যাটালগে বইয়ের নাম থাকলেও পাঠাগারে সে বইগুলোর অধিকাংশই নাকি পাওয়া যায না। জানিনা এর কারণ কি? এখানেও কি ষড়যন্ত্রকারিদের কালো হাত সক্রিয়। যে মহান ব্যক্তিটি তাঁর মেধাকে তাঁর প্রতিভাকে ক্ষয় করে কাব্যের আকাশকে উজ্বল করেছিলেন, বাংলা সাহিত্যের অনুর্বর জমিনকে উর্বর করেছিলেন, আদর্শকে করেছিলেন উচ্চকিত, তাঁকে আমরা কি দিয়েছি?

৯. ৬. ৮০

www.pathagar.com

চিরায়ত যে সাহিত্য

যারাজীবন বিমুখ সাহিত্যের রূপকার তাদের চিন্তার সীমা কেবল স্বপ্নের অলীক ফানুসকেই স্পর্শ করে, জীবনকে নয়। জীবন বলতে তার বিশ্বাসকেই বুঝায় কারণ বিশ্বাসের উপর ভর করেই তো জীবনের গতি। আরো কিছুটা স্পষ্ট করে বললে বলতে হয় বিশ্বাসই জীবনের গতিপথের নিয়ন্তা। সে বিশ্বাস অবশ্যই তার ধর্মীয় অনুভূতি থেকে উৎসারিত। তা যে কোন ধর্মই হোক না কেন। তা হলে দেখা যাচ্ছে জীবন ধর্ম এবং সাহিত্য এ শব্দগুলোর অবস্থান একই সরলরেখায়। যে গল্পে, উপন্যাসে বা কবিতায় এ তিনটির মেলামেশা অবাধ এবং শিল্পের সুষমায় সুশোভিত সে লেখাই কালকে জয় করেছে। জয় করেছে মানুষের হৃদয়। কিন্তু যে সাহিত্যকর্মে এর একটি অনুপস্থিত তাকেই জীবন বিমুখ বলা। কারণ এসব সাহিত্য এবং সাহিত্য কর্মীর বিচরণ ক্ষেত্র স্বপ্নের অলীক জগতে—যে স্বপ্নের স্থিতিকাল মাত্র পনর থেকে বিশ সেকেণ্ডের সীমানায়। তাই দেখা যায়, এ জাতীয় লেখালেখি সাময়িকভাবে ঝড় তুললেও এর আবেদন সময়ের একটা নির্দিষ্ট সীমাকে অতিক্রম করতে প্রতিবারই ব্যর্থ হয়েছে। যারা এসব সাহিত্যের সমঝদার তাদের সংখ্যাও সীমাবদ্ধতার দেয়ালেই আটকা। বলাবাহুল্য, যাদের ধারণা 'ধর্মটা সংকীর্ণ অথচ সাহিত্য ব্যাপক' তারাই এই স্বপ্নিল জগতের বাসিন্দা। যদিও তারা জানেনা এই সংকীর্ণ রূপটা আদতে তাদের মনেরই।

এ প্রসঙ্গে কবি রবীন্দ্রনাথের সুন্দর কিছু কথা আছে। কথাগুলো হলো এরকম—"বড় সাহিত্যের একটা গুণহচ্ছে অপূর্বতা, ওরিজিন্যালিটি। সাহিত্য যখন অক্লান্ত শক্তিমান থাকে তখন সে চিরন্তনকেই নতুন করে প্রকাশ করতে পারে। এইতার কাজ। একেই বলে ওরিজিন্রালিটি। যখনি সে আজগুবিকে নিয়ে গলা ভেঙ্গে, মুখ লাল করে, কপালের শিরাগুলোকে ফুলিয়ে তুলে ওরিজিন্যাল হতে চেষ্ট করে তখনই বোঝা যায় শেষ দশায় এসেছে। জল যাদের ফুরিয়েছে তাদের পক্ষে আছে পাঁক। ... আলাপের সহজ শক্তি যখন চলে যায় সেই বিকারের দশায় প্রলাপের শক্তি বেড়ে ওঠে। বাইরের দিক থেকে বিচার করতে গেলে প্রলাপের জোর আলাপের চেয়ে অনেক বেশি একথা মানতেই হয়। কিন্তু তা নিয়ে শঙ্কা না করে লোকে যখন গর্ব করতে থাকে তখনই বুঝি সর্বনাশ হল বলে।" প্রলাপের জোর যাদের বেশী তাদের উদ্দেশ্যই ছিল রবি ঠাকুরের এই ভাষ্য। যখন দেখি 'সাহিত্য ও ধর্ম' এর লেখক সরবে ঘোষণা করেন 'পুরানো সেই ধর্ম ছাড়াই মানুষের জ্ঞান অনেক সম্পূর্ণ'। অথবা 'তাই কবিতাও আজ বাইবেল বা

www.pathagar.com

কোরানের স্থান নিচ্ছে বলে সদম্ভ আস্ফালন করেন তখন এসব বিকারগ্রস্ত শব্দাবলীকে প্রলাপ ছাড়া আর কি নামে বিশেষিত করা যায় জানা নাই।

কবিতার কথায়ই আসা যাক। শোনা যায়, সব সাহিত্যের প্রথম প্রকাশ নাকি কবিতায়। তবে যতদূর জানি বাংলা সাহিত্যের প্রথম প্রকাশ ছিল ছন্দে। 'চর্যগীতি' বলে যার নামকরণ করেছেন পণ্ডিতরা। তারপরও দীর্ঘদিন যাবতই ছিল কবিতা তথা কবিদেরই রাজত্ব। যে কারণে সমগ্র মধ্যযুগটাই বাঘা বাঘা সব কবিদের আয়ত্তাধীন ছিল। তাদের পাঠক সংখ্যার পরিধিও ছিল ব্যাপক এবং বিশাল। সে কবিদের অনেকেই তো সময়ে দেয়ালকে অতিক্রম করেছেন। তারা আজো বিপুল পাঠকের মনকে আলোড়িত করে চলেছেন। আর এখন। কবিদের অবস্থান কোথায়? সঠিকভাবে জরিপ করলে হয়তো দেখা যাবে সাহিত্যের এ শাখাটার প্রতিই পাঠককুলের অনীহা দিন দিনই বাড়ছে। এ কবিতার পাঠক নাকি লেখক নিজেই। তবে তাদের পাঠক সংখ্যা যে কমে যাচ্ছে এ তথ্যটাকে হয়তো অস্বীকার করার কোন জো নেই। এর ব্যতিক্রম যে নেই তা কিন্তু নয়। তবে ব্যতিক্রম তো ব্যতিক্রমই। কিন্তু কবিতার পাঠকের সংখ্যা শূন্যের কোঠায় যাচ্ছে কেন? এর উত্তরে রবি ঠাকুরের হাওলা দিয়ে বলা যায় 'আলাপের পরিবর্তে প্রলাপের অংশটাই অধিক ইদানীং'। মোট কথা জীবন বিমুখতাই এর নেপথ্য নায়ক। তবে সুখের কথা এ সরল সহজ সত্যটা কেউ কেউ উপলব্ধির আওতায় আনা শুরু করেছেন আজকাল। যার বহিঃপ্রকাশ ঘটছে এখানে সেখানে। দূরে যাবার প্রয়োজন কি? যে সাময়িকীটির কথা উল্লেখিত হয়েছিল এর সম্পাদকদ্বয়ের একজন তো এখন আর তৎকালীন বিশ্বাসের ঠিক বিপরীতেই অবস্থান করছেন। আর 'সাহিত্য ও ধর্মের' লেখক জনাব আব্দুস সেলিমের ধারণা সত্তুর থেকে বিরাশির পাঁকে পড়ে কোন এদিক সেদিক হয়েছে কিনা তা জানা নেই। তবে আশা করি, তার বিশ্বাসের জমিনে উপলব্ধির ফুল ফুটে না থাকলেও হয়তো সহসাই ফুটবে। এইতো সেদিন কবি আল মাহমুদের কাছে 'উত্তরসুরী' নামক পশ্চিম বাংলার একটি সাহিত্য পত্র দেখেছিলাম। বলা বাহুল্য উত্তরসূরী সেখানকার একটি প্রতিনিধিত্বশীল সাহিত্য সাময়িকী। উত্তরসূরীর প্রচ্ছদের একটি ঘোষণাই এর প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। দেখলাম এ সংখ্যা উত্তরসুরীর প্রচ্ছদ অরুণ ভট্টাচার্যের একটি আবেদন নিয়ে সাজানো হয়েছে। আবেদনটি ছিল এ রকম—

'তরুণ তরুণতর কবিদের প্রতি অরুণ ভট্টাচার্য আবেদন জানাচ্ছেন ঃ ১৯৩০-৮০ পঞ্চাশ বছরের অস্থির দিনগুলি পার হয়েছে। বন্ধুগণ, এবার আপনারা রাঁব্যো বেদল্যেয় অথবা এলুয়ির মায়াকভস্কি থেকে ফিরে আসুন মহাজন পদাবলী আর রামপ্রসাদের কবিতায়, শ্রীধর কথক আর নিধু বাবুর গানে ঃ ধর্মকে আবার স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করুন। ধর্ম মানে কুসংস্কার নয়, ধর্ম অর্থ চিত্তের সুস্থির প্রতিবিম্ব। আসুন একবার মা বলে সবাই আমরা তরী ভাসাই।' (উত্তরসুরী ২৯শ বর্ষ ১ম সংখ্যা কার্তি-অগ্রহায়ন ১৩৮৮)

জানিনা এ তরীর যাত্রী সংখ্যা কেমন হবে। তবে যাত্রী সংখ্যা যাই হোক না কেন উপলব্ধিটা যখন মনের অন্ধকার পর্দাটাকে ধাক্কা দিয়েছে তখন একে সুমতিই বলব।

www.pathagar.com

বললে হয়তো আরো অনেক কিছুই বলা যায়। যেমন পুঁথি সাহিত্যের বিপুল জনপ্রিয়তার কথায় আসা যায়। কি শিক্ষিত কি অশিক্ষিত মানুষ এর স্বাদ সমান ভাবেই আত্মস্থ করে থাকে। যদিও আবদুস সেলিমরা একে বটতলার সাহিত্য বলে নাক সিটকান। কেউ আবার এক ধাপ আগে এসে বলেন, এসব সাম্প্রদায়িক সাহিত্য। আসলে কিন্তু এসব সাম্প্রদায়িক সাহিত্যই পাঠকের হৃদয় জয় করছে এবঙ করবে। পক্ষান্তরে 'অসাম্প্রদায়িক' সাহিত্যিককুলের জনপ্রিয়তার অবস্থান ঠিক এর বিপরীত মেরুতে। এর কারণ খুঁজতে গেলে দেখা যাবে জীবন তথা ধর্মই এখানে মুখ্য বিষয়। কালের শক্ত দেয়ালকে ভেদ করেও।

এখন শেষ কথায় আসা যাক। যারা কামু কাফকা সার্ত্রের হাওলা দেন কথায় কথায় তারা কি বলতে পারেন এদের পাঠকের পরিসংখ্যানটা এদেশে কত? অথবা এসব মণীষীদের নামই বা ক জনে জানে শুটি কতক আবদুস সেলিম ছাড়া। পক্ষান্তরে রুমী-জামী-সাদী তারাও তো বিদেশী কিন্তু তাদের জনপ্রিয়তার পরিসংখ্যানটা একবার জরিপ করুন তো? অরুণ ভট্টাচার্য এ বিষয়টা মরমে মরমেই উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে, মূল শিকড় ছাড়া বৃক্ষের পতন অবশ্যম্ভাবী। আবদুল সেলিমদের চৈতন্যে এ উপলব্ধিটা কখন টংকার তুলবে তা জানি না। তবে আবদুস সেলিমদের পথ প্রদর্শক অরুণ বাবুরা যখন মা বলে তরী ভাসিয়েছেন তখন তাদের আর খুব বেশী দেরী নাই। ডান-বামের অপথ-বিপথে যতই উঁকি মারুন না কেন জীবন শিরের চিরায়ত যে পথ সে পথে আসতেই হবে। মাধ্যাকর্ষণের মায়া কাটানো মানুষের পক্ষে সম্ভবই নয়।

www.pathagar.com

'যে সব বঙ্গেতে জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী সে সব কাহার...'

হরফ এক হলেই যে ভাষা এক হয় না এর প্রমাণ আমেরিকা। তাদের ভাষা, হরফ এবং সাহিত্য ইংরেজী হলেও বৃটিশের সাথে এর প্রভেদ অনেক।

এ দেশের অধিকাংশ মানুষ একত্বে বিশ্বাসী। স্বাভাবিক কারণেই যে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠির মুখের জবানই এ দেশের সাহিত্যের বাহন হবে তা বলার অপেক্ষা রাখে কি? কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের সাহিত্যে তা অনুপস্থিত। এর কারণ আবুল মনসুরের ভাষায় বলা যায়, "পূর্ব বাংলার লেখক সাহিত্যিকরা উর্দু, আরবী, ফারসীর সাথে বাংলা ভাষার কোনও মিল নাই দেখাইবার উদ্দেশ্যে বহু যুগ প্রচলিত বাঙ্গালী মুসলিমদের মুখের ভাষা হইতে আরবী ফারসী সব শব্দ তাড়াইবার অভিযান শুরু করিলেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য অবিভাজ্য, এই যুক্তিতে স্বভাবতঃই তঁরা হিন্দু মনীষীদের অনুকরণ করিলেন। ঐ মনীষীরা ইতিমধ্যে গণমুখী সাহিত্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে যে পশ্চিম বাংলার আঞ্চলিক কথ্য ভাষাকে সাহিত্যে স্থান দিয়াছিলেন, আমাদের লেখক সাহিত্যিকরাও না বুঝিয়া তাই করিতে থাকিলেন। ক্রমে পশ্চিম বাংলার কথ্য ভাষা পূর্ব বাংলা সাহিত্যের ভাষা হইয়া গেল। পূর্ব বাংলার ভাষিক-সাহিত্যিক, সুতরাং কৃষ্টিক স্বকীয়তার পথ দ্রুতগতিতে অবরুদ্ধ হইতে লাগিল।" গল্পকার শাহেদ আলীর ভাষায়, "পশ্চিম বঙ্গের মুখের ভাষায় লিখতে গিয়া আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত পরিচিত শব্দগুলিকে অপরিচিত করিয়া তুলিতেছি। এই বদঅভ্যাস ত্যাগ করিলে আমাদের ভাষার একটি নিজস্ব চেহারা বজায় থাকিবে।" (পূর্ব পাকিস্তান বাঙলা ভাষা সম্মেলন ১৯৬৭)।

কিন্তু প্রশ্ন হলো আমরা কি এ বদঅভ্যাস ত্যাগ করতে পেরেছি? কয়েকদিন আগে একটি স্থানীয় রম্য সাপ্তাহিকী পড়ছিলাম। পড়তে পড়তে চোখ যুগল আচমকা হোঁচট খেল। কারণ, দেখলাম এক জায়গায় লেখা হয়েছে 'স্বর্গত মুনির চৌধুরী' কয় দিন পর আরও একটি সাপ্তাহিকীতে দেখলাম 'প্রয়াত মোহাম্মদ রফি' জানি না এসব কিসের আলামত। করণ যেখানে 'মরহুম' শব্দটার সাথে এদেশের মানুষের নাড়ির যোগ রয়েছে সেখানে এসকল বিদেশী শব্দের (বিজাতীয়) আমদানি কেন? হয়ত উত্তর আসতে পারে 'মরহুম' বিদেশী শব্দ একে বাংগালীকরণ করা হয়েছে। প্রশ্ন হলো 'স্বর্গত বা প্রয়াত' এগলো কি বাংলা শব্দ? তবে কি রাম রাম বসুর ভুতরা এখনো আমাদের ঘাড় থেকে নামেনি, তাদের প্রেতাত্মারা কি এখনো সক্রিয়?

www.pathagar.com

'ভাইস চ্যান্সেলর' শব্দটি নিয়ে তো ক'একদিন আগে জাতীয় ... বেশ হৈ চৈ হয়ে গেল। কারণ আমাদের বাঙালী দরদীরা ভাইস চ্যান্সেলর ... নারাজ। কারণ এটা নাকি বাংলা শব্দ নয়। তারা বলবেন 'উপাচার্য'। কিন্তু হাসির ব্যাপর হলো এ 'উপাচার্য' শব্দটাও যে বাঙলা নয় সে কথাটাও এসব বাংলাদরদীরা জানেন না। এসব অতি বাঙালীদের সম্পর্কে ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ আজ থেকে তের বছর আগেই হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেছিলেন—'আমি যদি মাতৃভাষার সমর্থক হই তবে অন্য ভাষা হইতে অপ্রচলিত কঠিন শব্দ ধার করিয়া তাকে মহাবিদ্যালয় করিতে যাইব কেন? এই জন্য বহু প্রচলিত প্রিন্সিপাল ও ভাইস চ্রান্সেলর শব্দটিও আমরা বাদ দিতে রাজী নই। চলিত ভাইস চ্যান্সেলরকে 'উপাচার্য' ও ফাতেহাকে স্মৃতিতর্পণ বানাইলে বাংলাকরণ হয় না সংস্কৃত শব্দের মাধ্যমে ধর্মীয় পুরোহিতী ও পুজার ভাব জাগাইয়া তোলা হয় মাত্র। ইহাতে স্বকীয়তা লোপ পায়—আর হীনমন্যতা ও অন্ধ পরানুকরণে জাতির মন পঙ্গু পরানুক ও সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়ে।... ...

মুদ্রাক্ষরিক সহকারি মূল্যোদ্ধৃতি, স্নাতকোত্তর প্রভৃতি উদ্ভট সংস্কৃত শব্দ জঙ্গলে আমরা যেন পথ হারাইতে বসিয়াছি।'

ডঃ শহীদুল্লাহর আশংকা যেন আরো ভয়াবহরূপে ধেয়ে আসছে। এ জঙ্গলকে ছাফ করার একমাত্র উপায় আমাদের সাহিত্যে আঞ্চলিক ভাষার ব্যাপক ব্যবহার। আঞ্চলিক ভাষা বলতে এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মুখের জবানকেই বুঝাতে চাচ্ছি। এ পথেই জঙ্গলকে উচ্ছেদ করে নতুন সাহিত্যধারা এবং স্বকীয় ভাষা সৃষ্টি করা সম্ভব। মার্কিন সাহিত্য এর একটি উজ্জ্বল নজীর।

যারা এ দেশের মাটিতে লালিত হয়েও ভিন্ন দেশের ভাষায় কথা বলতে আগ্রহী অর্থাৎ মরহুমের পরিবর্তে 'স্বর্গত' বা 'প্রয়াত' ফাতেহার বদলে স্মৃতিতর্পণের প্রতি হৃদয়ের টান বেশী অনুভব করেন তাদের সম্পর্কে কিছু বলতে চাই না। কথায় আছে বানর বুড়া হলেও নাকি গাছে চড়ে। মধ্যযুগের কবি আবদুল হাকিমের ভাষায় শুধু বলা যয় 'যে সব বঙ্গেতে জন্মি হিংসে বংগ বাণী/সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি।' এর বেশী আর কি বলা যায়?

২. ৯. ৮০

www.pathagar.com

www.pathagar.com

একজন কবি যখন গদ্য লেখেন তখন তার আলাদা একটা বৈশিষ্ট্য থাকে। কবির সঙ্গে যখন যুক্ত হয় সাংবাদিকের পেশাগত দীর্ঘ অভিজ্ঞতা তখন এর গুরুত্ব আর বহু বিশেষণে বর্ণনার দরকার পড়ে না। এ ধরনের সৃষ্টিশীল গদ্যের তুলনা শুধু এ গদ্য নিজেই। পাঠক সাজজাদ হোসাইন খানের গদ্যের মধ্যে পাবেন কবির শব্দচয়নের শিল্পবোধ ও একাগ্রতা এবং সমাজ দেখার চোখ ও বিশ্লেষণী শক্তি। তাই 'কালের কলধ্বনি' পাঠের অর্থই হলো পাঠক লাভ করবেন এমন এক দৃষ্টিভঙ্গি যা বহু শ্রম-সাধনা ও সময়ক্ষেপণের পর অর্জন করা সম্ভব।

এ বইয়ের প্রতিটি বাক্য সুচিন্তিত; প্রতিটি বাক্য তার শরীরের মধ্যে ধারণ করে আছে চিন্তার গভীরতা ও ব্যঞ্জনার আভিজাত্য। কবিতার মতোই গদ্যগুলোর দেহ লাবণ্যময় কিন্তু নির্মেদ; এখানে চিন্তা আছে ঠিকই, কিন্তু আবেগহীনতা ভাষাকে আড়ষ্ট করেনি।

এ বইয়ের গদ্যে আছে পরিমিতি, আছে সাবলীলতা; মননশীল পাঠককে দেবে গদ্যপাঠের বৃদ্ধিবৃত্তিক আনন্দ।

প্রচ্ছদ: আফসার নিজাম
০১৮১৯-৫১৫১৪১

www.pathagar.com

সিদ্দিকীয়া পাবলিকেশন্স